সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

১৩ সমগ্র

ভূতের ছায়া পড়ে না। দিনের বেলা রোদের আলোয় ভূত দেখা যায় না। যদি কেউ বলে দেখেছি, সে মিথ্যে কথা বলছে। ভূত যে কোনও বাড়ির অন্ধকার-অন্ধকার বারান্দা পছন্দ করে। যেখানে বেতের চেয়ার বা সোফা থাকলে বসবে। উত্তরের বারান্দা হলে কথাই নেই। এইরকম পড়ে থাকা চেয়ারে না বসাই ভাল। ভূত সময় সময় শরীরে আটকে যেতে পারে। আমরা অনেক সময় বলি; ভূতে ধরেছে। ভূত ধরে না। আমরাই অসাবধানে ধরে ফেলি। তখন আমাদের আচার-আচরণ পালটে যায়। এই সময় গরম জলে চান করলে ভূত শরীরে আরও সেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা। খুব ঠান্ডা জলে চান করলে ভূতটা খসে পড়ে। নির্জন রাস্তায় রাত্তির বেলা গা থেকে চাদর খুলে আবার গায়ে জড়ালে ভূত জড়িয়ে যেতে পারে। অনেক ব্যাপার আছে যা আমরা জানি না; ফলে বিপদে পড়ি। যেমন, ভূত একটু চিটচিটে, আঠা আঠা, সেই কারণে ঝুলের সঙ্গে সহজেই জড়িয়ে যেতে পারে, তখন ভূত আর ঝুল এক হয়ে যায়। পোড়ো বাড়ির ঘরে ঘরে ঝুল ঝুলছে। সাবধান! ঝুল না ভূত? এই প্রশ্নটা মাথায় রেখে এগোনো উচিত। এড়িয়ে গেলেই হয়। পোড়ো বাড়িতে ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে বিপদে পড়া! ভূত যদি একবার কাউকে ভালবাসে ফেলে, কেলেঙ্কারি কাণ্ড। তবে সে থাকলে আছে, না থাকলে নেই। আমরা কোনও তর্কে নেই। আমরা ভূতকে ভালবাসি।

ISBN : 978-81-295-2903-9

সূচীপত্রে যান

ভূত সমাচার

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্রে যান

ভূত সমগ্র

সূচীপত্রে যান

ভূত সমগ্র

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্রে যান

BHUT SAMAGRA
A Collection of Bengali Ghost Stories
by SANJIB CHATTOPADHYAY
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 200.00

ISBN 978-81-295-2903-9

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : রঞ্জন দত্ত

২০০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্রে যান

স্নেহের টোটা রায়চৌধুরীকে

সূচীপত্রে যান

লেখকের অন্যান্য বই

নির্বাণে অনির্বাণ বুদ্ধ ভগবান
স্বামী বিবেকানন্দ এক অনন্ত জীবনের
জীবনী ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ
ভগবানের কানে দিলেন
ভগবানের নাম
কা তব কান্তা
ধর্মযুদ্ধ
পায়ে পায়ে পথ চলা
দেবভূমি কামারপুকুর
মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র
আবর্তে বিদ্যাসাগর
প্রভু জগন্নাথ
অনলপ্রভ বিদ্যাসাগর
গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশচন্দ্র
মুখোমুখি শ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীচরণকমলে
পলাতকা ছায়া ফেলে ফেলে
প্রতীক্ষা
মরার পর নামের আগে
অটোমেটিক হরি
কাঁধে কম্বল পায়ে চপ্পল
নীল আকাশে লাল ঘুড়ি
গুদোমে গুমখুন

সুখ দাও ভগবান
কেমন আছ ভাই!
সুখ (অখণ্ড)
ঝড়
দিদি
খেয়াল
আরোহী
নিয়তি
বেশ আছি রসে বশে
যা হয়, তা হয়
মামা এক মামা দুই
মামা তিন চার
কালের কাণ্ডারী
তেরোটি উপন্যাস
(একত্র সংকলন)
ইয়েস স্যার
নির্বাচিত রম্যরচনা সমগ্র
(১ম) (২য়) (৩য়) (৪র্থ)
হাসির আড়ালে
গাঙচিল
কিচির মিচির
সাপে আর নেউলে
রাত বারোটা
কাটলেট

হেড-স্যারের কাণ্ড
বড়মামার কীর্তি
বাঘমারি
থ্রি এক্স
সপ্তকাণ্ড
সাত টাকা বারো আনা
হাসি কান্না চুনি পান্না
পুরনো সেই দিনের কথা
গাধা
গৃহসুখ
আন্দামান : ভারতের
শেষ ভূখণ্ড
কিশোর রচনাসম্ভার
(১ম) (২য়) (৩য়)
দাদুর কীর্তি
বাঙালীবাবু
উৎপাতের ধন চিৎপাতে

সূচীপত্রে যান

থাকলে আছে, না থাকলে নেই

হিসেব-নিকেশের যুগ। পরিসংখ্যান। তাহলে, এই মুহূর্তে ভারতে ভূতের সংখ্যা কত হতে পারে? শুনেছি, অপঘাতে মারা গেলে ভূত হতে হবে। স্বর্গেও গেলুম না, নরকেও গেলুম না, শূন্যের কোনও এক স্তরে আটকে রইলুম। যেমন গলায় খাবার আটকে যায়। প্রশ্ন হল, কার গলা? যমরাজের গলা? যমরাজের শরীর আছে কি? এ তো সিনেমা নয় যে, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ!' যমরাজ আসছেন মানুষের শরীরে। কাষ্ঠপাদুকার খট্ খট্ শব্দ তুলে। স্বর্গ উঠে গেছে ওপরদিকে। পিতৃলোক, দেবলোক, ঋষিলোক। নরক নেমেছে নীচের দিকে, তল-অতল, বিতল। ওপর কোন দিকটা? যেদিকে আমার মাথা। এই দেহটা দিয়েই আমাদের সব বিচার। চিত হয়ে শুলে মুখ-চোখ যেদিকে সেইদিকেই আকাশ ব্রহ্মলোক। পিঠের দিকেই আলোকশূন্য অধোলোক! মর্তে, গর্তে সাপ-খোপ, মৃত্যুর লুকোচুরি। ভূমিতেই মানবে-দানবে চিরকালের দাপাদাপি। অন্তরীক্ষে ভূত-প্রেত, দেব-দেবী। ভূমি হল উদর। ভূমিতেই জন্মাবে আহার্য। ভূমির ক্ষুধা ভূমিই মেটাবে। ভূমির আকর্ষণেই স্বর্গ ধরা আছে। পাপ-পুণ্যের বল। এ কথাটাও খুব ঠিক। আমরা দেখছি বলেই এই দৃশ্যজগতের অস্তিত্ব। না দেখলে নেই। আমি চোখ বুজলেই আমার এই আকাশ-বাতাস-পাখ-পাখালি, লতা-পাতা কিছুই থাকবে না। কী যে থাকবে কেউ জানে না। নানা রকমের কল্পনা। মৃত্যুর পরে কেউ আর ফিরে আসে না। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে ফিরে এলে নিজের দেহটা পাবে। বেশি দেরি করলে কোথায় পাবে! হয় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, না হয় মাটির তলায় কবরে। এই যে বলা হল, 'ফিরে এল'—কে ফিরবে? গেলই বা কে? এই যে বলছি—'বেঁচে আছি', কে বলছে? আবার বলছে 'মরে যাব।' কে বলছে? এইভাবে কেউ ভাবে না। সময় কোথায়! জীবন একটা জোরদার নেশা। এক চুমুক প্রাণের নেশা পৃথিবীর সব নেশাকে টপকে যায়। জবরদস্ত একটা ঘোর। গড়ছে, ভাঙছে, স্বপ্ন দেখছে। আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা। এর পেছনে, তার পেছনে ছুটছে। ইটের খাঁচা আমার বাড়ি। গড়গড় করে গড়ায় আমার গাড়ি, বারান্দায় সুন্দরী আমার বউ।

সূচীপত্রে যান

কে আমি? কোথায় আমি? যে ভাবছে ভাবুক। উত্তর পাবে না। ওই জগতের কথা হল—উত্তর পাবে না, উপলব্ধি হবে। ভাবতে ভাবতে তুমি কেমন একটা হয়ে যাবে—সেই অবস্থাটার নাম সমাধি। কিছুক্ষণের জন্যে মৃতবৎ। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে কিছুই মনে থাকবে না। দেহের সঙ্গে আর একটা অশান্তি জড়িয়ে গেল। সেটি হল—মন। মনের সঙ্গে তৈরি হবে একটি মালা—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, অভিমান, স্মৃতি, বিস্মৃতি। বিচার। দ্বেষ, বিদ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা। অবশেষে ধ্যাততেরিকা/ বাঁচতে হবে/ মরে যাওয়াটা ভীষণ দুঃখের। বেশ তো বায়োস্কোপ দেখছি। যতদিন দেখা যায়! তাহলে মৃত্যুটা কী? দর্শকের আসন থেকে একজন উঠে গেল। ভূতের থিয়োরিটা কী। কে ভূত হল? কেন হল? ভূত হওয়া তো ভাল নয়। অত্যন্ত প্রিয়জনও মরে ভূত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে, কাঁপতে কাঁপতে, ভূ-ভূ করে মাটিতে পড়ব অজ্ঞান হয়ে। ভূত বলবে, 'যাঃ বাবা! যখন বেঁচে ছিলুম, কত প্রেম হল! এক এক মিটিং-এ পাঁচশো টাকার ফুচকা উড়ল। পায়ে পায়ে ঘুরত। বলেছিল, শাজাহান হলে তাজমহল বানাত। আর আজ আমাকে দেখে দাঁত ছিরকুটে পড়ে গেল!' ভূতের সঙ্গে ভালবাসা করা যায় না। না সলিড, না লিকুইড। কুয়াশার মতো ঝাপসা ঝাপসা একটা আকৃতি। কথা বলার ক্ষমতা নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। সরে সরে যাবে। এই এখানে তো ওই ওখানে। একটা মস্ত বড় দিক। ভূতদের মরে থাকবার ভয় নেই। একবার মরে গেলে আর একবার মরা যায় না। সেই সাহসে ভূত যে কোনও জায়গায় দাঁড়াতে পারে। ছাদের কার্নিশে, জানলার বাইরের প্যারাপেটে। তালগাছের মাথায়। যে কোনও জায়গায় এসে দাঁড়ালেই হল। ভূতের সঙ্গে একটা শীতল বাতাস থাকে। এই বাতাসটাই ভয়ের। জানলা খুলে গেল। কপাটে দড়াম দড়াম শব্দ হল। কাচের গেলাস উলটে পড়ে ভেঙে গেল। বইয়ের পাতা ফড়্ফড়্ করল। মাঝরাতে ছাতে শব্দ করে ফুলগাছের টব উলটে গেল। গড়গড় করে ভারী কিছু গড়াতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভূতের বদনাম করি। বলি, ভূতুড়ে উপদ্রব। ভূতরা মানুষের মতো অসভ্য, বদমাইশ নয়। চুরি-ডাকাতি করতে আসে না। কেন করবে? তারা ফ্ল্যাট কিনবে, না মার্কেটিং-এ যাবে। প্রথমে একটা ব্যাপার আমাদের খেয়ালে রাখতে হবে, যে গলায় দড়ি, কি রেললাইনে মাথা, কি মেট্রো রেলে ঝাঁপ দিয়ে মরেছে, সে নিশ্চয় সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে, বাঁচার ইচ্ছে হারিয়েছে, সে কী কারণে ভূত হয়ে আবার মায়ার সংসারে জড়াতে চাইবে!

সূচীপত্রে যান

ভূতদের সমস্যা একটাই, তাদের সলিড কোনও শরীর নেই। নড়াচড়া করলেই একটা ঝাপটা লাগে। তাছাড়া তাদের কোনও দূরত্বের জ্ঞান নেই। একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় কতটা স্পিডে যেতে হবে সেই গণিতেই গোলমাল, ফলে অবধারিতভাবে ঘাড়ে গিয়ে পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে সব লন্ডভন্ড। কী যেন কী একটা চলে গেল। ওরা তো গ্যাস বেলুনের মতো হালকা। অতি কষ্টে একটা জায়গায় কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়াতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা ফুঁ দিয়ে দেখেছি, দূরে চলে গেল। বাতাস যেদিকে বয় ভূত সেইদিকেই কাগজের প্যাকেটের মতো উড়ে যায়। এইটা খেয়াল রাখলে ভূত কখনও ঘাড়ে এসে পড়বে না। ভূত কিন্তু মানুষের ভালবাসা চায়, আমরা কিছু না জেনেই ভয়ে মরি।

আমার এক বন্ধু ইলেকট্রিকের কাজ করতে করতে অসাবধানে শক খেয়ে মারা গেল। শরীরটা হয়ে গেল চেলা কাঠের মতো। কালো। সে ভূত হয়ে প্রায়ই আমার কাছে আসত। একেবারে মার্বেল পাথরের মতো সাদা। ভূত কখনও কালো হয় না। আমি একবার টর্চলাইটের চড়া আলো ফেলেছিলুম—দেখলুম কিচ্ছু নেই। আলোটা ভূতের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। কোনও বাধা পেল না। ভূতের ছায়া পড়ে না। দিনের বেলা রোদের আলোয় ভূত দেখা যায় না। যদি কেউ বলে দেখেছি, সে মিথ্যে কথা বলছে। ভূত যে কোনও বাড়ির অন্ধকার-অন্ধকার বারান্দা পছন্দ করে। যেখানে বেতের চেয়ার বা সোফা থাকলে বসবে। উত্তরের বারান্দা হলে কথাই নেই। এইরকম পড়ে থাকা চেয়ারে না বসাই ভাল। ভূত সময় সময় শরীরে আটকে যেতে পারে। আমরা অনেক সময় বলি; ভূত ধরেছে। ভূত ধরে না। আমরাই অসাবধানে ধরে ফেলি। তখন আমাদের আচার-আচরণ পালটে যায়। এই সময় গরম জলে চান করলে ভূত শরীরে আরও সেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা। খুব ঠান্ডা জলে চান করলে ভূতটা খসে পড়ে। নির্জন রাস্তায় রাত্তির বেলা গা থেকে চাদর খুলে আবার গায়ে জড়ালে ভূত জড়িয়ে যেতে পারে। অনেক ব্যাপার আছে যা আমরা জানি না; ফলে বিপদে পড়ি। যেমন, ভূত একটু চিটচিটে, আঠা আঠা, সেই কারণে ঝুলের সঙ্গে সহজেই জড়িয়ে যেতে পারে, তখন ভূত আর ঝুল এক হয়ে যায়। পোড়ো বাড়ির ঘরে ঘরে ঝুল ঝুলছে। সাবধান! ঝুল না ভূত? এই প্রশ্নটা মাথায় রেখে এগোনো উচিত। এড়িয়ে গেলেই হয়। পোড়ো বাড়িতে ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে বিপদে পড়া! ভূত যদি একবার কাউকে ভালবাসে ফেলে, কেলেঙ্কারি

সূচীপত্রে যান

কাণ্ড। সর্বস্ব শেষ। সঙ্গদোষে নিজেরই ভূত হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। সে খুব কষ্টকর। ওঝা আসবে। ঝ্যাঁটাপেটা করবে। লোহা গরম করে ছ্যাঁকা দেবে। তিল থেকে তাল।

সব সময় মনে রাখতে হবে—আগে মানুষ পরে ভূত। মানুষ বেকায়দায় মরে ভূত হয়। আমাদের কোনও প্রিয়জন ভূত হয়েছে। উদাহরণ দিচ্ছি, শম্পা প্রবালকে ভালবাসত। প্রবালের মোটরবাইকের পিছনে প্রবালের ভুঁড়ি জাপটে ধরে দুজনে একশো মাইল বেগে হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। শম্পা ছিটকে পড়ে গেল। ভগবান না করুন; কিন্তু সে মরে গেল। বাঁদিকে ঝোপেঝাড়ে পড়লে বেঁচে যেত, দুর্ভাগ্য! পড়ল ডানদিকে, একটা লরি ফিনিশ করে দিল। শাস্ত্র মানলে শম্পা ভূত হবেই। কিচ্ছু করার নেই। এইবার বাইকের পেছনের আসনটা আরতির দখলে চলে গেল। প্রবাল খেলোয়াড় ছেলে। সে প্রেমিক। প্রেম করার জন্যেই জন্মেছে। নানা কারণে বাপের এন্তার পয়সা হয়েছে। কিছু টাকা আছে যা ওড়াতে হয়। পরিষ্কার কথা—অসৎ টাকায় যত আবোল তাবোল কাজ। টাকার দু'ধরনের গতি-সদগতি আর অসদগতি। শম্পা ভূত হয়েছে, সে আরতিকে কেন সহ্য করবে? প্রবালই বা কেমন ছেলে? ভণ্ড প্রেমিক। সে না বলেছিল ছোটমতো তাজমহল বানাবে পুকুর বোজানো জমিতে, মাল সাপ্লাই করবে বাবা! কোথায় কী? শম্পা ভূত হয়ে এদের দুজনকে যদি শাস্তি দেয়, বিচারে কে দোষী হবে?

শাস্ত্রে ভূতের জন্যে তেমন কোনও বিধান নেই, খাতির নেই। প্রেত-পিণ্ডদান। গয়ায় গিয়ে কিছু একটা করা। ঘটার শ্রাদ্ধ-তিল-কাঞ্চন, বৃষোৎসর্গ, কুশপুত্তলিকা—এসব হবেই না। অসম্মান। অমুক মরে ভূত হয়েছে। ভীষণ জ্বালাচ্ছে। ওই বাড়িটা ভূতের বাড়ি, বদনাম আছে। কেউ থাকতে পারে না। দুটো গলায় দড়ির কেস আছে। ভূতদের সমাজ নেই, অ্যাসোসিয়েশন নেই। ভূত তাড়ানোর মন্ত্র আছে, আবাহনের কিস্যু নেই। বেঁচে থেকে অবিচার-নিত্য শুনতে হয়েছে 'মরে না কেন, মরিস না কেন?' ও মা! মরার পর আরও অবিচার! তুমি বিয়ে করলে, তিন মাস না যেতেই বেড়াল বেরলো তোমার ঝুলি থেকে। গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজেকেই নিজে সৎকার করলুম, এখন তোমার বিছানায় আমারই গয়নাগাটি পরে ওটা কে? এইবার মাঝরাতে খাটে যদি ভূমিকম্প তুলি—সেটা কি খুব গর্হিত কাজ হবে? জবাব চাই, জবাব দাও/ ভূতের বাপ কে?

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্রে যান

সূচিপত্র

রাত বারোটা	১৩
হাত না ডাল	২১
ভূত অদ্ভুত	৩১
নিশির ডাক	৪১
ভূতের খেলা	৪৯
মর্গান সাহেবের বাগান	৫৭
সেই রাত	৬৫
গগনের মাছ	৭৩
ভূতেরা ভূতদের কিছু করতে পারে না	৮১
সিঁড়ি	৮৯
কাচ	৯৭
সেই অদ্ভুত মানুষটি	১০৩
ভূত সম্পর্কে দু'চার কথা	১১৩
বক্ষাদৈত্যকে একঘণ্টা গান শুনিয়ে ঠাকুরদা বাড়ি ফিরলেন	১৫৭
তিল মাটিতে পড়া মাত্রই দপ করে জ্বলে উঠল	১৬১
মা বলে ডাকলেন, গগনভেদী চিৎকার	১৬৫

সূচীপত্রে যান

ছোটোদাদু ক্যানসার রোগটা নিজের শরীরে তুলে নিয়েছিলেন ১৬৯
একটি ছবি, একটি ছবি। খসখস শব্দ ১৭৩
সাঁইবাবা অলৌকিক শরীরে গোপীনাথ কবিরাজকে কাশীতে দেখে গেলেন ১৭৯
হঠাৎ দেখি চেয়ারে গৌরিদা, তারপরই নেই, টেবিলে শুধু শ্বেত শঙ্খ ১৮৫
'একি তুমি এখানে!' প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে বেড়াচ্ছি ১৯১
আয়নায় দেখতে গিয়ে দেখি যন্ত্রণাক্লিষ্ট বৃদ্ধার মুখ ১৯৫
সিদ্ধ তান্ত্রিকের শেষ পুজো ছিন্নমস্তা, অমাবস্যায় রক্ত দিয়ে মায়ের পুজো করব ... ২০১
আমার কোনো নাম নেই। আমি মায়ের সন্তান, বলেই অদৃশ্য হলেন ২০৭
একটা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গেল, গাছের ডাল ভাঙার শব্দ হল ২১৩
বিনা মেঘে বজ্রপাত ২১৯
কিছু লৌকিক কিছু অলৌকিক ২২৩
চারটে দেশলাই কাঠি ২৫৩
গভীর রাতে ২৬১
ভূতের বর সাজা ২৬৭
আষাঢ়ে নয় ২৭৩

সূচীপত্রে যান

রাত বারোটা

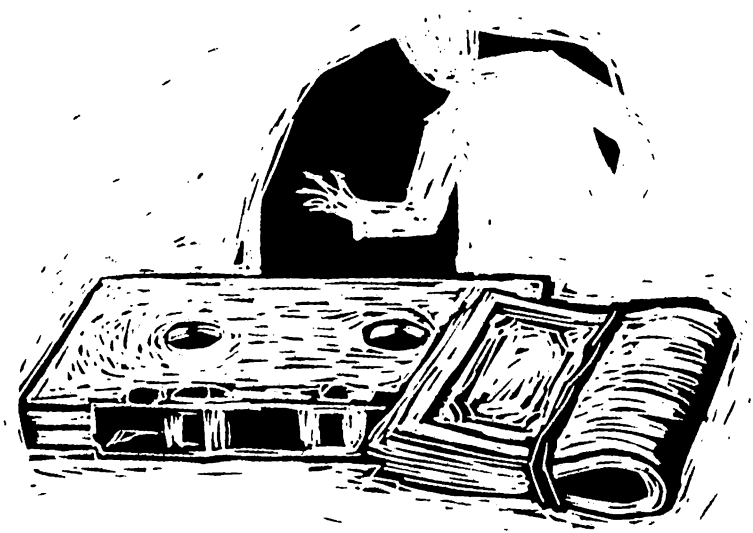

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

রাত বারোটা। ঝনঝন করে টেলিফোন বাজল। টেলিফোন আছে নীচের বৈঠকখানায়। আর আমি শুয়ে আছি দোতলায়, আমার শোবার ঘরে। পাশের ঘরে আমার মা। বাড়িতে আর তৃতীয় কোনও প্রাণী নেই। কেন নেই? সে অনেক কথা। ওসব শুনে কাজ নেই।

ফোনটা ছন্দে-ছন্দে বাজছে।

পেঁচানো সিঁড়ি নীচে নেমে আছে। চোরের মতো অন্ধকার ঘাপটি মেরে বসেছিল। আলো জ্বালতেই ছিটকে পালাল। দোতলা থেকে একতলায় নামতে বেশ ভয় করছিল। আমি তেমন সাহসী নই। রাত এগারোটা পর্যন্ত আমার ভয় করে না। তার পরেই কেমন গা-ছমছম। হঠাৎ কোনও দিকে তাকালেই মনে হয়, কেউ ছিল, সরে গেল। যত রাত বাড়ে তত ভয় বাড়ে। একদিন শুতে যাওয়ার আগে দাড়ি কামানোর জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। পরের দিন খুব ভোরে বেরোতে হবে, তাই কাজটা এগিয়ে রাখতে চেয়েছিলুম। আয়নায় সাবানের ফেনামাখা আমার মুখ, আর দেখি কী, আমার কাঁধের পাশ থেকে উঁকি মারছে আর একটা মুখ। ঝাপসা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে, স্পষ্ট থেকে ঝাপসা। এইরকম হতেই লাগল, হতেই লাগল। শুধু একটা মুখ। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম। চিৎকার করে মাকে ডাকতে চাইলুম। গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরলো না। সেদিন আমি মরেই যেতুম যদি না আমার মা নিজে থেকেই আসতেন। সঙ্গে-সঙ্গে মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তখন কুলকুল করে ঘামছি। ভয়ে মুখটা সাদা। সাবান মেখে আছি বলে বোঝা গেল না। টিকটিকির মতো থ্যাস করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান। চোখ মেলে যখন তাকালুম, দেখি কী ডক্টর বসাক আমার ইসিজি করছেন। রাত্তিরবেলা, সেই থেকে আমি আয়নার সামনে দাঁড়াই না। কী দরকার বাবা ঝামেলা করে। মাকে যখন বললুম, ব্যাপারটা কী হয়েছিল, হার্টে কিছু হয়নি, আমার পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছিল, আয়নায় আমি তার মুখ দেখেছিলুম। মা খুব সাহসী। এককথায় উড়িয়ে দিলেন, বললেন জানবি

সূচীপত্রে যান

পেটটাই সব—মুড়ি আর ভুঁড়ি। পেট থেকেই সব আসে। অত ঘুগনি, ফুচকা, আলুর চপ খেলে ভূত-প্রেত, দৈন্য, দানো, সবই দর্শন হবে। দিনকতক শুধু লাউ খাওয়াব, কাঁচা দুধ দিয়ে শুক্তো।

আলো-আঁধারি সিঁড়ি দিয়ে নামছি নীচে। দোতলার আলোর আভায় যতটুকু দেখা যায়। আগে নীচে একটা পনেরো পাওয়ারের আলো সারারাত জ্বলত। পরপর দু'মাস হাজার টাকার বিল আসায় আলো এখন অন্ধকার।

নিস্তব্ধ মাঝরাতে ফোনের শব্দ বিরক্তিকর। নিশ্চয় রং নাম্বার। তুলতেই হবে, তা না হলে বাজনা থাকবে না। বৈঠকখানার আলোটা জ্বালতেই অন্ধকার সব হুটোপাটি করে ফারনিচারের তলায়-তলায় ঢুকে গেল। টেলিফোন যন্ত্রটাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। যখন বাজছে, মনে হচ্ছে কাঁপছে।

রিসিভার তুলে বললুম, 'হ্যালো।'

ওপাশে কিঁচ করে একটা শব্দ হল। বরফের মতো ঠান্ডা একটা বাতাস যেন ভেসে এল এপাশে। এমন অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার কেন ঘটবে বুঝতে পারছি না। টেলিফোনে শব্দতরঙ্গ আসবে, বাতাস কেন আসবে! টেলিফোন কি ব্লোয়ার!

যাই হোক, এইবার বেশ বিরক্তির গলায় বললুম, 'হ্যালো।'

ওপাশে কাঠের চোয়াল নড়ার মতো একটা শব্দ হল।

আবার বললুম, 'হ্যালো।'

ভেসে এল অস্বাভাবিক একটা গলা, উচ্চারণ পরিষ্কার, কিন্তু শব্দটা অস্বাভাবিক। 'কে অমল?'

—অমল বলছি। আপনি কে?

—আমি প্রকাশ।

—কে প্রকাশ?

—প্রকাশ গাঙ্গুলি।

আর একটু হলেই আমার হাত থেকে রিসিভার পড়ে যেত।

—প্রকাশ গাঙ্গুলি মানে? ইয়ারকি হচ্ছে মাঝরাতে! প্রকাশ গাঙ্গুলি ফিরোজাবাদ রেল অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে ক'দিন আগে।

সূচীপত্রে যান

ধীর শান্ত উত্তর—জানি। সবাই জানে। ডেড বডি আমিও দেখেছি। অনেকক্ষণ পাহারা দিয়েছি, একা বসে-বসে। তারপর সবাই এল। শনাক্ত করল। পোস্ট মর্টেম হল। ডেথ সার্টিফিকেট নিল, নিমতলায় দাহ হল। সবাই জানে, এ আর নতুন কথা কী! আমার মৃত্যুসংবাদ আমি জানব না!

মরা মানুষ ফোনে কথা বলে এমন কথা আমি শুনিনি। এসব বদমাইশি। মানুষকে ভয় দেখানো। মারা গেলে মানুষের আর কিছু থাকে না। সে আবার টেলিফোন করবে কী করে!

ওপার থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে এল। একঝলক ঠান্ডা বাতাস। হাসির পরেই কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছে, কেউ যেন ইস্পাতের নলের ভেতর দিয়ে কথা বলছে—তোর কোনও ধারণা নেই অমল। মৃত্যুর পরে মানুষের আর কোনও বাধা থাকে না। যা খুশি তাই করা যায়। এখুনি আমি তোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি; কিন্তু তুই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবি। আমি তোর প্রাণের বন্ধু ছিলুম, তবু তুই ভয় পাবি। আমার নাম শুনেই তুই কাঁপছিস। সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কী হবে তোর ভালোই জানা আছে।

—তুই কার ফোন থেকে কথা বলছিস?

—পৃথিবীর সব ফোন এখন আমার। সব রেডিয়ো, টিভি স্টেশন এখন আমার। তোর রেডিয়োতে কলকাতা ক ধর, আমার গলা শুনতে পাবি।

—তোর ওখানে এখন দিন না রাত?

—তোরা আলো আর কালো ছাড়া কিছু জানিস না। এ ছাড়াও একটা কিছু আছে এখানে না এলে বোঝা যাবে না। থাক, কাজের কথাটা বলে নিই। ডানকুনিতে আমার বড়দি থাকে।

—জানি, তুই আর আমি অনেকবার তাঁর বাড়িতে গেছি।

—বেশ, এইবার শোন, তোকে একটা কাজ করতে হবে। দিদি আমাকে একটা হার দিয়েছিল। বলেছিল, বউবাজারে বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে, সেই টাকাটা তাকে দিয়ে আসতে। তারা একটু অর্থকষ্টে আছে। হারটা আমি বিক্রি করে পাঁচহাজার টাকা পেয়েছিলুম। টাকাটা আমি দিয়ে আসতে পারিনি, তোকে সেই কাজটা করতে হবে।

—অত টাকা আমি পাব কোথায়!

—বলছি, বলছি, সব বলছি। একটু ধৈর্য ধর। টাকাটা তোকে চুরি করতে হবে।

সূচীপত্রে যান

—কোথা থেকে চুরি করব! আমি চোর না কি?

—ব্যস্ত হোস না। মন দিয়ে শোন। আমাদের বাড়িতে যাবি। দেখবি সবাই শোকে কেমন হয়ে আছে। তুই একটু সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিবি। দিতে-দিতে বলবি, মাসিমা, প্রকাশের কাছে আমার একটা ক্যাসেট ছিল। শোনার জন্য নিয়েছিল। সেটা আমি আবার আর একজনের কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলুম। সে চাইছে। ক্যাসেটের র‍্যাকটা একবার দেখব! যে-র‍্যাকে ক্যাসেট থাকে সেখানে যাবি। ডানদিক থেকে ষোলো নম্বর ক্যাসেটটা টেনে বের করবি। দেখবি, খাপ আছে, ক্যাসেটটা নেই। পকেটে ভরে ফেলবি, ওদের সামনে খুলবি না। সোজা চলে আসবি বাড়িতে। এইবার খুলবি। দেখবি, দশটা পাঁচশো টাকার নোট ভাঁজ করা। এইবার দ্বিতীয় কাজ, ডানকুনিতে গিয়ে দিদির হাতে দেওয়া। বন্ধু হিসেবে এই কাজটা তোকে করতেই হবে। একটাই কথা, আমার বাড়ির কেউ যেন না জানতে পারে।

—যদি ক্যাসেটে কিছু না থাকে।

—থাকবেই। কেবল গুনতে ভুল কোরো না। ডানদিক থেকে ষোলো। ক্যাসেটের ইন-লে কার্ডটা আছে। মেহেদি হাসান। ঝট করে একবার দেখে নিয়ে পকেটে ভরবি।

—তোকে জানাব কী করে?

—আমি জানতে পারব। তবে দু-দিন মাত্র সময়, কারণ আমি ক্রমশই পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এখন আমি যে-বৃত্তে আছি সেখানে তোদের হাবল্ টেলিস্কোপটা ঘুরছে। কট্ করে একটা শব্দ হল, টেলিফোন নীরব। আমার মাথা ঘুরছে। মুখে কোনও সাড় নেই, এত ঠান্ডা। ক্রায়ো সার্জারির টেম্পারেচার। এক কাপ চা, এক কাপ গরম দুধ—যা হয় একটা কিছু পেলে বেশ হত। প্রকাশের কথা ভেবে চোখে জল আসছে, কিন্তু ঝরছে না, কারণ আমার চোখ-মুখ মাইনাস সাতশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে গেছে। কোনরকমে টলতে-টলতে নিজের ঘরে ফিরে এলুম। শরীর কাঁপছে। শীতে না ভয়ে বুঝতে পারছি না। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে, বাল্বটা মুখের কাছে ধরে রইলুম বেশ কিছুক্ষণ। অদ্ভুত একটা কাণ্ড হল, হঠাৎ দু-ভলক জল বেরিয়ে এল দুটো চোখ থেকে। বাল্বটা চিড়িক করে কেটে গেল।

দুই

সকাল দশটা। প্রকাশদের তালতলার বাড়িতে ঢুকছি। কেন জানি না কেবলই মনে হচ্ছে—আমি একটা চোর। উলটো দিকের ফুটপাথ থেকে একটা কিশোর কণ্ঠ ভেসে এল—অমলকাকু! চমকে তাকালুম। অচেনা একটি বালক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে। হঠাৎ দেখি, সে নেই। কী হল! সাত সকালেই এমন চোখের ভুল। নেশা-ভাঙ করেছি না কি!

দোতলায় সকলের গলা পাচ্ছি। প্রকাশের মায়ের সঙ্গেই প্রথমে দেখা হল। মাসিমা আর আগের মতো নেই। থাকা সম্ভব। নয়। আমার হাত ধরে খানিক কাঁদলেন। আমার চোখেও জল এল। ঘরে গিয়ে বসলুম। একথা সেকথার পর আসল কথাটা বললুম, 'মাসিমা, প্রকাশকে একটা ক্যাসেট দিয়েছিলুম শুনতে, সেটা আমি আবার এনেছিলুম অন্য একজনের কাছ থেকে ওর ক্যাসেটের র‍্যাকটা দেখব!'

'হাঁ দেখো না। তুমি তো এবাড়ির সবই জানো।'

যে তাকে ক্যাসেট সাজানো থাকে সেখানে গেলুম। প্রকাশ গান শুনতে খুব ভালোবাসত। পরপর সব সাজানো। ডানদিক থেকে ষোলো নম্বর। একটু আড়াল করে দাঁড়িয়েছি। ভয় করছে, যদি কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়। সময়টা আমি ভালোই নির্বাচন করেছি। প্রকাশের দাদা অফিসে বেরিয়ে গেছেন। বোন স্কুলে। টিচার। ফিরতে ফিরতে এগারোটা।

গুনছি, এক,দুই...। হঠাৎ একটা ক্যাসেট আপনিই বেরিয়ে এল। গুনে দেখলুম, সেইটাই ষোলো। শরীরটা সিরসির করে উঠল। তার মানে, প্রকাশ আমার পাশেই রয়েছে। মনে হল, মাসিমাকে একবার বলি, এই ঘরেই রয়েছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। বেরিয়ে আসা খাপটা ধরতে ভয় করছে। অশরীরীর আঙুল যদি আঙুলে ঠেকে যায়।

খাপটা হালকা, ঝট করে দেখে নিলুম, মেহেদি হাসান। সোজা পকেটে।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'পেলে বাবা?'

'পেয়েছি।'

'গান খুব ভালোবাসত, খুব ভালোবাসত গান।' বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

আমারও গলার কাছটা দলা পাকাচ্ছে। কোনও রকমে বলতে পারলুম, 'আসছি মাসিমা।' সিঁড়ি দিয়ে নামছি, কোথায় বেশ জোর গলায় একটা টিকটিকি শব্দ করল টিক-টিক। অর্থটা বুঝতে পারলুম, বলতে চাইছে, ঠিক-ঠিক।

সূচীপত্রে যান

কোথাও কোনও সময় নষ্ট না করে সোজা বাড়িতে। ভয়ঙ্কর একটা উদ্বেগ। ভেতরে টাকাটা আছে তো! সিঁড়িতে উঠতে-উঠতে খাপটা খুললাম। রয়েছে, ভাঁজ করা পাঁচশো টাকার নোট। দশটাই আছে। দম বন্ধ করে দিলুম। শ্বাস নিতে পারলুম।

এইবার দ্বিতীয় নির্দেশ। ডানকুনি যেতে হবে। আমার খাটের ওপর আজকের কাগজটা পড়ে আছে। এখানে তো থাকার কথা নয়! কাগজটা সকালে পড়ে নীচের ঘরেই রেখেছিলুম। স্পষ্ট মনে আছে। পড়ার পর কাগজ আমি এলোমেলো করে রাখি না। দেখছি, পাঁচের পাতাটা ঘুরিয়ে ওপর দিকে এনে ভাঁজ করা? আর যে সংবাদটা সবার আগে চোখে পড়ছে সেটা হল, গণধোলাইতে পকেটমারের মৃত্যু।

বুঝে গেলুম, এর পেছনেও প্রকাশের হাত। পকেটমার সম্পর্কে সচেতন করতে চাইছে। আমি একটু অন্যমনস্ক ধরনের ছেলে। গাছ, পাতা, পাখি, হাট, বাজার, মেলা দেখে বিভোর হয়ে যাই। তাই ডানকুনি যাওয়ার আগে সাবধান করে দিল।

বড়দির বাড়িতে যখন পৌঁছলুম, বেলা তিনটে। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো অবাক।

'তুমি হঠাৎ!'

'এই টাকাটা, প্রকাশ আমার কাছে রেখেছিল, আপনাকে দেওয়ার জন্যে।'

'প্রকাশ! তোমার কাছে!' এর বেশি আর কিছু বলতে পারলেন না, কাঁদতে লাগলেন।

'টাকাটা আজই আমার খুব দরকার। তোমার জামাইবাবু হাসপাতালে। কাল অপারেশন!' গয়নাটা কবে দিয়েছিলেন, টাকাটা কবে পেলেন, আমার কাছে ক'দিন ছিল, এসব প্রশ্ন এলে খুব বিপদ হত। কোনও উত্তর আমার জানা ছিল না।

'দিদি আমার খুব কাজ আছে। আবার আসব।'

আমি প্রায় পালিয়েই এলুম। ট্রেনে উঠছি। অচেনা এক ভদ্রলোক পেছন থেকে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ধন্যবাদ।'

চমকে ফিরে তাকালুম। কেউ নেই।

আজ ঠিক রাত বারোটা।

জেগে বসে আছি, টেলিফোন বাজবে কি!

সূচীপত্রে যান

হাত না চাল

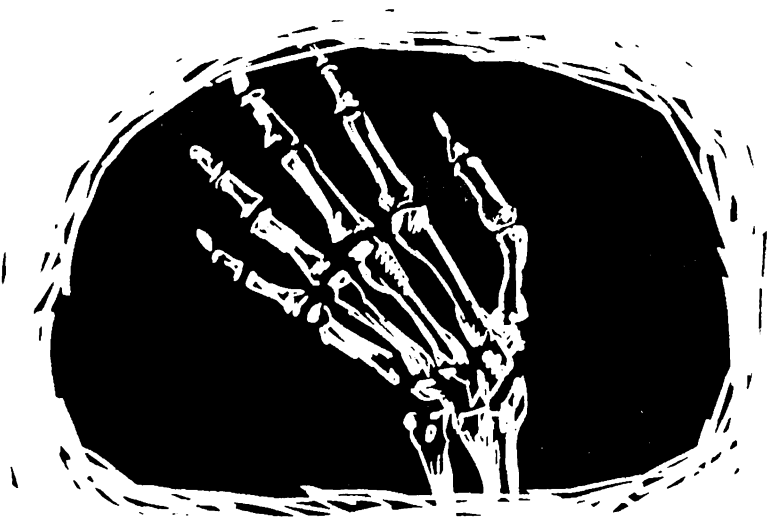

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আমাদের স্কুলের ছাতটা খুব সুন্দর। একেবারে গঙ্গার ধারে। ইংরেজ আমলের বাড়ি। আলসে চারটে কী সুন্দর! নানারকম ডিজাইন করা। আমরা রোজই নীচের মাঠে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ওপর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। আর মনে মনে ভাবি, একদিন যদি ছাতে উঠতে পারতুম, কী মজাই না হত। কত দূর-দূর দেখতে পাওয়া যেত। হাওড়ার ব্রিজ, বালির ব্রিজ, বেলুড়মঠ। কিন্তু ছাতে ওঠার উপায় নেই। সবসময় তালা দেওয়া। চাবি হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে। না, ছাতে তোমাদের ওঠা চলবে না। ওটা তোমাদের খেলার জায়গা নয়।

ভীষণ গম্ভীর মানুষ। একটার বেশি দুটো কথা বলতে চান না। চোখে ইয়া মোটা চশমা। ইয়া পুরু গোঁফ। খদ্দরের পাঞ্জাবি। পায়ে আবার শু-জুতো। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। বেশ মোটাসোটা একজন মানুষ। জ্ঞানের পাহাড়। বগলে সবসময় একটা মোটা বই থাকে, ওয়েবস্টারের ডিকশনারি।

সেদিন সুজন এসে খবর দিল, 'শোন, ছাতের দরজাটা আজ খুলেছে। ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছে তো। রামাধর খুলে দিয়ে তার কোয়ার্টারে খেতে চলে গেছে। এই সুযোগ।'

আমাদের তখন আর মাত্র একটা পিরিয়ড বাকি। শনিবার হাফ ক্লাস। পিরিয়ডটা করতেই হবে। অঙ্কের ক্লাস। বিমানবাবু রোল করল করে না পেলে, পুলিশ দিয়ে ধরে আনাবেন। সাঙ্ঘাতিক মানুষ। ক্লাসে ঢুকে টেবিলের ওপর একবার মাত্র বেতের শব্দ করেন, তাতেই আমাদের পিঠে দাগ পড়ে যায়। সত্যেন একদিন ক্লাসে মজা করেছিল। গঙ্গার ধারে কেশোরাম ইটে বসে চুলদাড়ি কামায়, 'ইটালিয়ান সেলুন।' রামাধরকে বললেন, 'ডেকে আন।'

কেশোরামকে দিয়ে সত্যেনের মাথা কামিয়ে দিলেন।

কেশোরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সার, একটা টিকি রাখব?'

সূচীপত্রে যান

বিমানবাবু বললেন, 'ও কি সন্ন্যাসী হচ্ছে? প্রায়শ্চিত্তের চুল কীভাবে কাটে জানিস না?'

সত্যেনের বাবা খুব বুদ্ধিমান। তিনদিনের দিন ছেলের পৈতে দিয়ে দিলেন। বিমানবাবুরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। সত্যেনকে একটা বই দিয়েছিলেন, 'চরিত্রগঠন'। সেই বইটাতে অনেক কথার মধ্যে যে কথা লেখা আছে, লজেন্স, চকোলেট, চানাচুর একদম খাবে না।

অঙ্কের ক্লাস শেষ হল। সবাই বাড়ি চলে যাচ্ছে। মাস্টারমশাইরাও বেরিয়ে পড়েছেন একে-একে। আমি আর সুজন গুটি-গুটি সোজা ছাতে। ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের লোকেরা কেউই আমাদের দিকে তাকাল না। নিজেদের কাজেই ব্যস্ত। আমরা মনের আনন্দে ছাতে ঘুরছি। গড়ের মাঠের মতো ছাত। ইচ্ছে করলে ফুটবল খেলা যায়।

সিঁড়ির ঘরের ছাতে ওঠার জন্য লোহার সিঁড়ি আছে।

সুজন বলল, 'চল, ওই ছাতটায় উঠলে আরও দূরে দেখা যাবে। বলা যায় না, সমুদ্রও দেখা যেতে পারে। বঙ্গোপসাগর।'

সেই ছাতে উঠলুম দু-জনে। কেউ তো কোথাও বলার নেই। স্বাধীন আমরা। সত্যিই, কত, কত দূর দেখা যাচ্ছে। মনে হয় মনুমেন্টের চূড়াটাও দেখতে পাচ্ছি। আমরা বইখাতা রেখে বেশ গুছিয়ে বসলুম। সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। সুজন তার মামারবাড়ির গল্প বলছে। ওর মামাদের নাকি ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়াকে বলা হত ওয়েলার ঘোড়া। বাড়িটা নাকি এত বড় ছিল যে, একবার ঘুরে এলেই পা-ব্যথা করবে। হতে পারে, কাশিমবাজারে কত কী হয়। আমরা তার কী জানি!

কথা বলতে বলতে আমরা বই মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছি। পেটে যেন আকাশ ঠেকে। আমার মামার বাড়ির তেমন কোনও গল্প নেই, তাই সুজন একের পর এক গল্প বলে যাচ্ছে। ওর মামার বাড়ির ঘরগুলো এতবড়, এ মাথায় দাঁড়িয়ে কথা বললে ও-মাথায় শোনা যায় না।

গল্প করতে করতে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ছাঁত করে ঘুম ভাঙল তখন সন্ধে হতে আর একটু দেরি। তাড়াতাড়ি চিলের ছাত থেকে নেমে এলুম। কাজের লোকেরা ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে চলে গেছে। ছাতের দরজা ওপাশ থেকে বন্ধ। রামাধর তালা দিয়ে চলে গেছে।

আমি দেখেছি, কোনও বিপদ এলেই সুজন যা করবে, প্রথমেই যা করবে, তা হল ফোঁস-ফোঁস কান্না। এখানেও তাই হল, আমাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁস ফোঁস করে খানিক কান্না

সূচীপত্রে যান

হল, আমরা ছাত থেকে নামব কী করে, না খেয়ে মরে যাব। বাবা মারবে। বিমানবাবু কেশোরামকে ডেকে ন্যাড়া করিয়ে দেবেন। হেডমাস্টারমশাই জলবিছুটি মারবেন।

এক দাবড়ানি দিলুম 'চুপ কর। বিপদে মাথা ঠান্ডা না রাখলে কিছু হয় না।'

যেদিকটায় রামাধরদার কোয়ার্টার সেইদিকে গিয়ে চিৎকার করছি, 'রামাদা, রামাদা।' কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ খেয়াল হল, আজ শনিবার, রামাধরদা দেশে চলে গেছে। মরেছে! সে তো তা হলে সোমবারের আগে আসবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল, মরেছে, সোমবার তো মে দিবস, স্কুল বন্ধ।

সুজনকে সাহস দিতে গিয়ে নিজেই থপাস করে বসে পড়লুম। শনি, রবি, সোম, তিনদিন এই ছাতে থাকতে হবে। নো খাবার, নো জল। সবচেয়ে কাছের বাড়িটাই এত দূরে যে, চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ শুনতে পাবে না। স্কুলের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, তার একদিকে গঙ্গা আর একদিকে বাসরাস্তা। ছাত থেকে রাস্তার কিছুটা দেখা গেলেও রাস্তা থেকে এই ছাতটা দেখা যাবে না, গাছপালার আড়ালে পড়ে গেছে।

সুজন বলল, 'তোর জন্যই এই অবস্থা হল।'

'কথা শোনো, খবরটা কে এনেছিল। ছাত খোলা আছে, খবরটা কে আনল।'

'অনেকদিন ধরে তুই ছাতে ওঠার প্ল্যান করছিলি বলেই তো আমি খবরটা এনেছিলুম। তুই আমার সর্বনাশ করে দিলি। একে আমি অঙ্কে কম নম্বর পেয়েছি।'

'অঙ্কে কম নম্বর পেয়েছিস। প্রত্যেকবারেই তো তাই পাস। বেশি পেলেই ছাত থেকে নেমে যেতে পারতিস?'

'সে কথা নয়। ছাত থেকে নামার পর আমার ধোলাইটা কেমন হবে, কোন স্কেলে হবে বুঝতে পারছিস। রিলে সিস্টেমে? প্রথমে দাদা, দাদার হাত থেকে বাবা, তারপর মা ফিনিশ করবে। সবশেষে দিদি জলপটি লাগাবে।'

'তুই নিজেরটাই ভাবছিস। আমারটাও কি কিছু কম হবে। আমার বাবার এক চড়, তোর বাবার একশোটা চড়ের সমান।'

'একদিন একটা খেয়ে দেখিস না। তিনদিন আর হাঁ করতে হবে না।'

'তুই কি ভাবছিস, আমরা ছাত থেকে নামার পর গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করবে।

দু-জন নভোচর মহাকাশ থেকে নামলেন। জেনে রাখ, জ্যান্ত আর নামতে হচ্ছে না। আমাদের ডেডবডি নামবে। সোমবারও ছুটি।'

'সোমবার ছুটি কেন?'

'মে ডে।'

সুজন শুয়ে পড়ল। ধরেই নিয়েছে, মরে যাবে। তা মরতেই যখন হবে, বসে বসে কেন? শুয়ে শুয়েই মরি।

একেবারে সন্ধে হয়ে গেল। গঙ্গার দিকে পশ্চিম-আকাশে সামান্য একচিলতে লাল। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক বাদুড় সাঁই-সাঁই করে উড়ে গেল। বাদুড়কে আমি ভীষণ ভয় পাই। অদ্ভুত জীব। ওড়ে, কিন্তু গায়ে পালক নেই। আবার কী, ডিম পাড়ে না।

এতক্ষণ বাড়িতে হইচই পড়ে গেছে। বাবা এসে বলছেন, 'বানরটা গেল কোথায়। তোমাকে কিছু বলে গেছে?' মা তো আমার তেমনই, সঙ্গে-সঙ্গে বলবেন, 'সে এখনও স্কুল থেকেই ফেরেনি। তোমাকে তো আগেই বলেছি, আজকাল খুব লায়েক হয়েছে।'

বাবা বললেন, 'আসুক আজ, খোল-নলচে আলাদা করে দেব।'

কে লিখেছিলেন, ওই গানটা, 'কুপুত্র যদি-বা হয়, কুমাতা কখনও নয়।'

আমার দাদু আরও কড়া। আমার বাবাকেও মাঝে মধ্যে বানর বলেন। 'এই যে গুটিগুটি চললে কোথায়। আজ ফিরতে এত দেরি হল কেন। ফিরতে যে দেরি হবে, কাকে বলে গিয়েছিলে।'

'আজ্ঞে হঠাৎ একটা মিটিং।'

'রোজই তোমার মিটিং, ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করতে হচ্ছে। এতখানি বয়েস হল, বানর ছেলে, তুমি বোঝো না, আমরা কতটা দুশ্চিন্তায় থাকি।'

রাত আরও একটু বাড়লে, দু-জনে দু-দিকে খুঁজতে বেরোবেন। থানা, পুলিশ, হাসপাতাল। কারও মাথাতেই আসবে না, আমরা স্কুলের ছাতে আটকে আছি। এখন যদি ভগবানকে খুব জোরে-জোরে ডাকি, তা হলে ভগবান কি তালা খুলে দেবেন। ভগবান কোনওদিন কোনও ভালো কাজ করেনি। ইংরেজিতে দশটা নম্বর বাড়াতে বলেছিলাম, তাই পারলেন না। আমার বন্ধু শিখার বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে বলেছিলুম। রেখেছেন? ভগবান ওই দাদুর গীতার মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক হয়ে আছেন। শ্লোকের আর কতটুকু ক্ষমতা।

সূচীপত্রে যান

হতাশ হয়ে আলসের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছি। সুজন দু-হাত দিয়ে মাথাটা ধরে আছে। ঘুমকাতুরে। এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমোলেই শান্তি।

ঘটাং করে একটা শব্দ হল। লোহার শব্দ। এইবার ভয় লাগছে। খুব ভয়। ছড়ছড় করে বাতাস বইছে। গাছে-গাছে পাতার সপসপ শব্দ। পশ্চিম-আকাশে কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ। এখনই অবশ্য ডুবে যাবে। এ-চাঁদের কোনও মানে হয় না।

শব্দটা হল কোথায়।

একবার জানতে পারলে ভয়টা কেটে যাবে।

এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে চোখ আটকাল জলের ট্যাঙ্কের মাথায়।

ঢাকনাটা একপাশ খুলে কাত হয়ে আছে। আর ফিকে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখছি, একটা হাত বাখারির খোঁচার মতো সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পাঁচটা আঙুল উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে।

ঠিক দেখছি তো।

চোখ রগড়ে আর একবার তাকালুম, 'হ্যাঁ, ঠিক। কোনও ভুল নেই।'

ভাগ্য ভালো, সুজন ঘুমিয়ে পড়েছে মিষ্টি হাওয়ায়।

সুজনকে ডেকে দেখালে ভূতের ভয়ে নির্ঘাত লাফ মারবে নীচে। আমার ভীষণ ভয় করছে। অজ্ঞান হয়ে গেলে ভালো হত। সে আর হচ্ছি কই। আমার ধাত খুব কড়া।

কিঁচ করে আর-একবার শব্দ হল। হাতটা যেন আরও একটু ওপর দিকে উঠল। মানুষের হাত। ভূতের হাত নয়। ভূতের হলে হাড়ের হত। কঙ্কালের হাতের মতো। তার মানে ট্যাঙ্কে একটা মরা মানুষ আছে। কোথা থেকে এল!

এইবার আমার ভয়টা অন্যদিকে যাচ্ছে। বিশাল নির্জন একটা ছাত। অন্ধকারে থমথম করছে। চারপাশে কেউ কোথাও নেই। জলের ট্যাঙ্কে একটা মরা মানুষ। ক্রমশ ফুলছে। একটা হাতের খানিকটা ঢাকনায় চাপ মেরে বেরিয়ে এসেছে। এই ছাদে আর কিছুতেই বসে থাকা যায় না। ওই জলের ট্যাঙ্ক যারা সাফাই করছিল তাদেরই একজন। এ খুন। খুনের কেস।

শরীরে কোথা থেকে ভীষণ একটা বল এল। ছাতের দরজাটা আমি ভাঙব। এইবার মনে হল ভগবান আছেন। দেখি ছাতের একপাশে একটা লোহার রড পড়ে আছে। অনেককাল

আগে পনেরোই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারিতে ছাতেই পতাকা তোলা হত। এই রডটা মনে হয় সেই রডটাই। গাঁথনি থেকে খুলে পড়ে আছে।

রডটা দু-হাতে ধরে প্রাণপণে দরজায় চার্জ করলুম। বিকট শব্দ করে বাড়ি কেঁপে গেল।

আচমকা ঘুম ভেঙে, দূর থেকে সুজন বলছে, 'করছিস কী?'

'দরজা ভাঙছি। বাঁচতে যদি চাস আমাকে সাহায্য কর।'

শক্ত কাঠ। সহজে কি ভাঙে। মারতে মারতে গলদঘর্ম।

শেষে মচ করে শব্দ হল। একটা প্যানেল চিড় খেয়েছে। আরও বারকতক মারতেই গোটা প্যানেলটাই নেমে গেল। মাথাটা গলবে।

কোনওরকমে মাথাটা গলিয়ে অনেক অনেক কসরত করে শরীরটাকে ওপাশে বের করে নিয়ে যেতে পারলুম। ঘুরঘুট্টে অন্ধকার।

সুজনকে বললুম, 'বইখাতাগুলো সব আমার হাতে দে। কিচ্ছু যেন পড়ে না থাকে। তারপর তুই বেরিয়ে আয়।'

সুজন বললে, 'কাজটা ভালো করলি না। আমাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

'জলের ট্যাঙ্কটার দিকে তাকা!'

'কী রে ওটা!'

'মরা মানুষের হাত।'

আর কিছু বলতে হল না। সুজন আমার চেয়ে মোটা। কোনওরকমে ছেঁচড়ে মেচড়ে বেরিয়ে এল। হাতড়ে-হাতড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার পালা। দেওয়ালঘড়ির পেন্ডুলামটা টিস-টিস শব্দ করছে। একটা বেড়াল ইঁদুরের ধান্দায় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে ছিল। মিঁআও করে ডেকে মারল লাফ।

শেষ বাধা গেট। সেটাও বাইরে থেকে বন্ধ।

'টপকাতে হবে সুজন।'

'আমি পারব না।'

'তা হলে পুলিশে ধরুক তোকে, আমি চললুম।'

সুজন আমার হাত চেপে ধরল। ভয়ে কাঁপছে।

কোনওরকমে ঠেলেঠুলে সুজনকে পার করলুম। একটু কেটেকুটে গেল। এই গেটটা আমি

অনেকবার টপকেছি। আমার কাছে কোনও সমস্যাই নয়। ধপাস করে রাস্তায়। রাত বেশ হয়েছে। জনপ্রাণী নেই।

সুজন বলল, 'তুই উলটো দিকে যাচ্ছিস কোথায়। বাড়ি তো এইদিকে!'

'আমি থানায় যাচ্ছি।'

'থানায় কেন?'

'একটা কথা বলবি না। আমার সঙ্গে আয়।'

থানা বেশিদূর নয়। গঙ্গার ধারেই। ভারী একটা জিপ অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন কিছু করব ভাবি, তখন আমার ভয়ডর আর থাকে না। থানায় ঢুকে দেখি, আমার বাবা, দাদু আর সুজনের বাবা আর দাদা বসে আছেন। অফিসার ফোনে চিৎকার করছেন, 'হ্যালো মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ।'

আমার দাদু বললেন, 'হয়ে গেছে, ছেড়ে দিন। মানিকজোড় হাজির। এখন ঠিক করুন, ধোলাইটা পারিবারিক হবে, না পুলিশি হবে!'

পুলিশ অফিসার ঝপাং করে রিসিভারটা ফেলে দিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন, 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল? আড্ডা মারতে?'

কোনওরকমে বললুম, 'আগে এক গেলাস জল।'

দাদু সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলেন, 'থানার জল খাবে না, জন্ডিস হবে।'

অফিসার বললেন, 'বেশি বড়লোকি চাল দেখাবেন না। তা হলে আমাদের সকলেরই তো ন্যাবা হত। আমাদের ট্যাঙ্ক রেগুলার পরিষ্কার করানো হয়।'

আমি গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বললুম, 'স্যার! ভীষণ একটা কাণ্ড হয়েছে।'

বাবা বললেন, 'নাও এইবার একটা গল্প শোনো।'

আমি তখন বলার জন্য ব্যস্ত। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে কান নেই।

'স্যার! আমাদের স্কুলের ছাতের ট্যাঙ্কে ডেডবডি। খুন!'

অফিসার বললেন, 'খুলে বলো। আগেরটা পরে, পরেরটা আগে নয়। স্ট্রেটলাইনে চলো। রহস্যকাহিনি তৈরি কোরো না।'

পুরো ঘটনাটা ছবির মতো করে বলে গেলুম। কিচ্ছু বাদ দিলুম না। সকলের চোখ গোল্লা-গোল্লা।

সূচীপত্রে যান

অফিসার সেকেন্ড অফিসারকে বললেন, 'ফোর্স রেডি করুন।'

আমার আর সুজনের কী গর্ব। জিপে আমাদের আর কাউকে উঠতে দেওয়া হয়নি। শুধু আমি আর সুজন। প্রথমে হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। তাঁকে ঘুম থেকে তোলা হল। পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গেছেন।

অফিসার বললেন, 'আপনার ছাতে খুন!'

'আমার ছাতে?'

'আপনার স্কুলের ছাতে। আমাদের সঙ্গে চলুন।'

যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই জিপে উঠলেন। আমি সুজনের কানে কানে বললুম, 'এবারের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার আমাদের দুজনের বরাতেই নাচছে।'

স্কুলের গেট খোলা হল। পাঁচ সেলের টর্চ জ্বলে উঠল। গেট ছাড়াও স্কুলে ঢোকার বিশাল দরজাটাও বন্ধ। আমরা ক্লাসঘরের জানলা গলে বেরিয়েছিলুম। আমার বাবা, দাদু, সুজনের বাবা, দাদা, সবাই হাঁটাপথে স্কুলের সামনে এসে গেছেন। অফিসার তাঁদের ঢুকতে দেননি। ইংরেজিতে বলেছেন, 'প্লিজ, ওয়েট হিয়ার।'

আমরা উঠছি সিঁড়ি ভেঙে। সুজন আর আমি পুলিশ অফিসারদের পেছনে। আমাদের পেছনে হেডমাস্টারমশাই। তারপরে কনস্টেবলরা। উঠতে-উঠতে ভাবছি, ওটা যদি হাত না গাছের ডাল হয়। তা হলে। রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনাটা কেমন হবে।

হেডমাস্টারমশাই চাবি দিলেন। অফিসার ভাঙা দরজাটা খুললেন। ফাঁকা ছাত। আমার মনে হচ্ছে, এইবার অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে। পাস না ফেল। হাত না ডাল।

অফিসার পাঁচ সেলের টর্চের তির ছুড়লেন ট্যাঙ্কের মাথায়। আমাদের দমবন্ধ।

দু-কদম এগিয়ে গেলেন সামনে। আমরা সবাই দেখলুম, একটা হাত। পাঁচটা আঙুল ছেতরে আকাশে কী যেন খুঁজছে।

অফিসার বললেন, 'ইয়েস, হ্যান্ড।'

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'হাঁ, তাই তো হাত।'

আর আমার মন চিৎকার করে উঠল, 'পাস পাস।'

তারপর কী হল। সে তো অন্য এক বিরাট গল্প।

সূচীপত্রে যান

ভূত অদ্ভুত

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আমার ঠাকুরদা যখন বাড়িটা কিনেছিলেন, তখন তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই বলেছিলেন, কাজটা ভালো হচ্ছে না। বাড়িটা ঐতিহাসিক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ওলন্দাজ গভর্নরের কুঠিবাড়ি। কিন্তু, যেখানেই ইতিহাস, সেইখানেই তো ভূত। ইতিহাসের আর এক নাম ভূত বললেই বা ক্ষতি কী! বাড়িটায় যেমন অনেক রহস্য আছে, সেইরকম অনেক ভূতও আছে। তা না হলে এতদিন খালি পড়ে আছে!

ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'মশা তাড়াবার যেমন ধূপ আছে, আমার কাছে সেইরকম ভূত তাড়াবার ধুনো আছে। ভূতকে আমি তেমন ভয় পাই না, ভয় পাই মানুষকে।'

আমার ঠাকুরদা ছিলেন নামকরা শিক্ষক। আমাদের পরিবারের লোকসংখ্যাও কিছু কম ছিল না। সকলেই বিজ্ঞানচর্চা করতেন। ভূত, প্রেত, ভগবান, কোনওটাই মানতেন না। বাড়িটা কেনা হল প্রায় জলের দামে। বিশাল এক দোতলা বাড়ি। দু-মহলা। সামনের দিকটা পুব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। পেছনের মহল দক্ষিণ থেকে উত্তরে।' 'এল' শেপ। পেছনে একটা বারান্দা। পুবে শুরু হয়ে দক্ষিণ বরাবর পশ্চিম হয়ে উত্তরে ঘুরে গেছে। এই উত্তরটাই ছিল ভয়ঙ্কর। নিরালা, নির্জন। গাছপালা-ঘেরা। মনে হত ভূতের আড়ত।

নানা জাতের কথায় ওই বাড়িতে ভূতের যে-তালিকা পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল এইরকম—

এক, গভীর রাতে বাড়ির ন্যাড়া ছাদ থেকে কেউ একজন বিশাল একটা ঘুড়ি ছাড়ত। কালো রঙের ঢাউস ঘুড়ি। অন্ধকার আকাশ। জ্বলজ্বলে তারা। কালো একটা ঘুড়ি প্রেতাত্মার মতো লাট খাচ্ছে, টাল খাচ্ছে। গোত্তা খেয়ে নিচে নামছে, পড়পড় শব্দে উঠে যাচ্ছে আকাশের টঙে। যাদের ঘুম ভেঙে যেত, তারা শব্দটা শুনতে পেত। সাহসী যারা, তারা বারান্দায় বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালে ঘন কালো ছায়ার মতো একটা কিছু দেখতে পেত।

সূচীপত্রে যান

দুই, কুয়োর সঙ্গে একটা হ্যান্ড-পাম্প লাগানো ছিল। গভীর রাতে কেউ সেটাকে পাম্প করত। হ্যাচাং-হ্যাচাং শব্দ শুনতে পেত প্রতিবেশীরা। তালাবন্ধ খালি বাড়ি অথচ জল পাম্প করার শব্দ। সাহসীরা তিনতলার ছাত থেকে এই বাড়ির পাতকো তলায় টর্চলাইট ফেলত। লোক নেই, জন নেই। পাম্পের হাতল ওঠানামা করছে।

তিন, মাঝরাতের ন্যাড়া ছাতে জলের মূর্তি। একটা মূর্তি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু জল টলটলে। যেমন এক বালতি জল। বালতিটা নেই, জলটা বালতির আকার ধরে আছে। সেইরকম মানুষের আকারে জল। ছাতে টলে টলে বেড়াচ্ছে। মাঝে-মাঝে আকাশে হাত তুলছে।

চার, সার্চলাইট। হঠাৎ একটা তীব্র আলোর রেখা অন্ধকার চিরে আকাশের দিকে ছুটে যেত। গোল হয়ে ঘুরত। সেই আলোর উৎস এই বাড়ির ছাত।

পাঁচ, একবার এক যাত্রার দল এই পাড়ায় তিনদিন ধরে যাত্রা করতে এসেছিল। সেই দলকে এই বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম রাতের অভিনয়ের পর দলের নায়িকা সকাল দশটার সময় ছাদ থেকে ভেতরের উঠোনে পড়ে গিয়ে, হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে ছিলেন এক মাস। তিনি বলেছিলেন, অদৃশ্য কেউ ছাত থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।

ছয়, একবার এক ভবঘুরে মানুষ এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভীষণ সাহসী। সারা পৃথিবী ঘুরেছিলেন তিনি। যাওয়ার আগে পাড়ার লোককে বলেছিলেন, এই বাড়িটায় অদ্ভুত একটা কিছু আছে। প্রবল বাতাস যখন কোনও ফাঁক-ফোকর দিয়ে বইতে থাকে তখন শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ হয়। সারা রাত এই বাড়িতে সেইরকম শব্দ হয়। বাইরে বাতাস নেই, ভেতরে বাতাস, কেঁদে কেঁদে ফেরে।

সাত, বাগানের মাটি খুঁড়ে একটা কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। কোনও মহিলার। হাতে বালা ছিল।

আট, রান্নাঘরের বাইরের দেওয়াল বেয়ে একটা পোড়ামাটির নল সোজা উঠে গেছে তিনতলার ছাতে। খালি বাড়ি। তালাবন্ধ। কেউ কোথাও নেই। প্রতিবেশীরা দেখছে, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

সূচীপত্রে যান

আমার ঠাকুরদা এর সব ক'টাই লিখে রেখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ভূতের লিস্ট'। বাড়ির দখল নিয়ে বললেন, 'দেখা যাক, কোন ভূত কখন দর্শন দেয়। ভূতের দর্শন পেলে ভগবানেরও দর্শন পাব।' আমরা তখন খুবই ছোট।

আমি আর আমার দিদি সন্ধে হলেই দুজনে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতুম। এ-মহল থেকে ও-মহলে যেতে ভয়ে বুক কাঁপত। বারান্দায় ঘুরপাক। বাঁ-দিক দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। আর-একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ছাতে। ডান দিকে বাগান থেকে উঠে এসেছে, ঝোপঝাড়, গাছপালা। রেলিংয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালে পাতকো-তলা। হ্যান্ড-পাম্পের হাতলটা অন্ধকারে নিরেট এক অন্ধকার। ঝিঁঝির ডাক। পাতার ফাঁকে-ফাঁকে চিকচিকে জোনাকি। কে আবার শিখিয়ে দিয়েছিল, জোনাকিরা সব প্রেতাত্মা। তাই সন্ধেবেলা দিদি আর আমি যেন অবিচ্ছেদ্য দুই প্রাণী। দিনেরবেলা যত ঝগড়া, রাত্তির হলেই গায়ে গা-লাগানো গলায়-গলায় ভাব। মা কি জ্যাঠাইমা হয়তো উত্তর মহলের রান্নাঘর থেকে ডাকলেন, 'উমা শুনে যা।' আমরা অমনি দুজনে জড়াজড়ি করে হাজির হলুম।

মা আমাকে বললেন, 'তোকে কে ডেকেছে! পড়া ছেড়ে উঠে এলি কেন?'

জ্যাঠাইমা মাকে বললে, 'বুঝলি না, সব ভূতের ভয়ে জুজু হয়ে আছে।'

আমি আর দিদি দুজনে যে ঘরে বসে পড়তুম, সেই ঘরের দুটো জানলা। হা-হা করছে। জানলা মানেই ভূত। লম্বা-লম্বা হাত বাড়ালেই হল। জানলার দিকে পেছন ফিরে বসা চলবে না। ভূত পিঠে সুড়সুড়ি দিতে পারে। দু'জনে মাথা খাটিয়ে বের করলুম, দুজনে পিঠে পিঠ দিয়ে বসব। একজনের মুখ এ'জানলার দিকে আর-একজনের মুখ ও'জানলার দিকে। ভূত যদি হাত বাড়ায়, দেখতে পাব আর চিৎকার করে উঠব। একটু করে পড়ি আর ভয়ে-ভয়ে তাকাই।

আমি যে'জানালাটার দিকে তাকাতুম, তার ওপাশেই ছিল বাইরে যাওয়ার সিঁড়ি, বাড়িটার দুটো সিঁড়ি ছিল। একটা খিড়কির, আর একটা সদরের। ওটা ছিল সদরের সিঁড়ি। একদিন আমরা দুজনে পড়তে বসেছি। পড়া বেশ কিছুটা এগিয়েছে, এমন সময় জানলায় একটা

মুখ। সাদা লম্বা দাড়ি, চুল। ধকধকে দুটো চোখ। সঙ্গে সঙ্গে আমার চিৎকার, 'দিদি রে! ভূত।' বলা মাত্রই দিদির এক লাফ। দুজনে বইপত্তর উলটে, জড়াজড়ি করে দৌড় মারলুম উত্তর মহলের রান্নাঘরের দিকে। জ্যাঠাইমা ময়দা মাখছিলেন। সোজা তাঁর ঘাড়ে। তিনজনেই চিতপাত। জলের ঘটি উলটে গেল। উলটে গেল দুধের ডেকচি। মা আলুর দমের আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন, ভূমিকম্প হচ্ছে। মা ভয় পেলে ইংরেজি বলেন। চিৎকার করতে লাগলেন, 'আর্থকোয়েক, আর্থকোয়েক। শাঁখ বাজাও, শাঁখ বাজাও।' জল, ময়দা, ডাল, দুধ সব মেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আমরা ভূত দেখেছি।'

'সন্ধে সাতটার সময় ভূত!'

না, ভূত নয়। এক ভদ্রলোক। আশুবাবু, আমার ঠাকুরদার বন্ধু। কবি। ভদ্রলোকের পেছন পেছন ঠাকুরদাও উঠছিলেন সিঁড়ি দিয়ে। তিনি হুটোপাটির শব্দ শুনেছিলেন। রান্নাঘরে এসে বললেন, 'ছি-ছি! কী লজ্জার কথা। আশুবাবু বলছেন, আমার চেহারাটা কি এতই ভয়ঙ্কর যে, ছেলেমেয়ে দুটো ওইভাবে ছুটে পালাল। এ দাড়ি তো আমার অনেক দিনের। কবিতায় তেমন ফোর্স আসছিল না বলেই দাড়ি রাখতে বাধ্য হয়েছি, কবিগুরুর অনুপ্রেরণায়।'

মা বললেন, 'বাবা, এ-দুটো হল রামভিতু। দিনরাত, চলতে-ফিরতে ভূত দেখছে।'

পরে দিদিতে আমাতে একটা গবেষণা হল। যতই হোক আমরা তো অপমানিত হয়েছি। ভয়ঙ্কর অপমান। ঠাকুরদার কবি বন্ধুকে ভূত ভেবেছি।

দিদি বললে, 'বিলু, ভূত সম্পর্কে তোর কোনও আইডিয়া আছে? কেমন দেখতে না দেখতে?'

আমরা দু-জনেই তো দেখিনি কখনও। কেবল শুনেছি। ভূত দেখা যায় না। ভূত কেবল কর্ম। কর্ম বললে ভুল হবে। ভূত হল অপকর্ম। নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করে। দিদি বললে, 'একটা লিস্ট কর, এক নম্বর, ভূত অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ করে। দুই ঘাড়ের কাছে ঠান্ডা নিশ্বাস ফেলে। তিন, যে কোনও জিনিসকে শূন্যে উঠিয়ে দেয়। চার, শুয়ে থাকলে ঠ্যাং ধরে ঘুরিয়ে দেয়। পাঁচ, বন্ধ জানালা-দরজা খুলে দেয়। ছয়, হা হা করে হাসে। সাত, পিঠে

সুড়সুড়ি দেয়। আট, ঝড় হয়ে বয়ে যায়। নয়, মেজাজ ভালো থাকলে জিনিসপত্তর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। দশ, জিনিসপত্তর অদৃশ্য করে দেয় আবার জিনিস রেখেও যায়। এগারো, ঘুমন্ত মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে। বারো, কখনও অস্পষ্ট সাদা মূর্তির মতো কাউকে কাউকে দর্শন দেয়। নাকিসুরে কথা বলে।'

লিস্ট শেষ হওয়ার পর দিদি বললে, 'শোন বিলু, এরপর থেকে কোনও লোক দেখলে ভূত-ভূত করে চেঁচাবি না গাধার মতো। আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে। ছোট হলেও খুব ছোট নই। ভূতের কোনও চেহারা থাকে না! ভূত হল বাতাস, ভূত হল ধোঁয়া, ভূত হল শব্দ।'

বেশ চলছিল হেসে-খেলে আমাদের সংসার। মা আর জ্যাঠাইমা যেন দুই বোন। ঠাকুরদা যেন মহাদেব। বাবা আর জ্যাঠামশাই যেন হলায়-গলায় দুই বন্ধু। আর আমরা, ভাই-বোন, কেউ কাউকে ছেড়ে একমুহূর্তে থাকতে পারি না। দুজনে সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় রোজ কী মন খারাপ! অনেকক্ষণ দেখা হবে না দুজনের। স্কুল থেকে ফেরার সময় দিদির স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম। দুজনে একসঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরতুম। দিদি ভীষণ বেড়াল ভালোবাসত। পথে কোনও বেড়াল দেখলেই থমকে দাঁড়াত। বলত, বিলু, দ্যাখ, কী সুন্দর মা লক্ষ্মীর মতো বেড়াল। চুক-চুক করে ডাকত। বেড়াল অমনি লেজ তুলে নির্ভয়ে দিদির কাছে এসে গায়ে গা-ঘষত। আমার একটু দুষ্টুমি করার ইচ্ছে হত। লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে টানছি। বুটজুতো দিয়ে পাথরের টুকরোয় শট মারছি। আর দিদি আমাকে সাবধান করছে। যখন শুনছি না, কান ধরে বলছে, বানর ছেলে। আমি হি হি করে হাসছি। দিদি ভয় দেখাচ্ছে, 'বাড়ি চলো না, তোমার হবে।' বাড়ির কাছাকাছি এসে আমাদের দুজনের দৌড় শুরু হল। রেস। দিদিকে খুব ফরসা আর সুন্দর দেখতে ছিল। যখন ছুটত, ফিতে-বাঁধা বিনুনি পিঠে দুলত। সপাত সপাত শব্দ করত। ফরসা গাল দুটো গোলাপের মতো লাল হয়ে যেত। আর আমি তখন দিদিকে আরও ভালোবেসে ফেলতুম।

এইসময় মা একদিন ভীষণ ভয় পেলেন। রাত এগারোটা নাগাদ কাজকর্ম শেষ করে

রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে দক্ষিণের মহলে আসছেন, ডান দিকে ছাতে ওঠার সিঁড়ি। জায়গাটা অন্ধকার অন্ধকার। হঠাৎ দেখলেন, লালপাড় শাড়ি পরে কে একজন ছাদে উঠে যাচ্ছে। মা ভেবেছিলেন, জ্যাঠাইমা। জিগ্যেস্ করলেন, 'এত রাতে ছাতে যাচ্ছ কেন।' কিন্তু ঘরে এসে জ্যাঠাইমাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। মায়ের কথা কেউ বিশ্বাস করতেই চাইলেন না। শেষে বাবা আর জ্যাঠামশাই টর্চ নিয়ে ছাতে গেলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না।

ঠাকুরদা বললেন, 'কিছুই না, চোখের ভুল, অমন হয়। ভূত তো বাইরে নেই, আছে মানুষের মনে।'

সবাই সায় দিলেন, 'ঠিকই তো, ঠিকই তো।'

মা কিন্তু পর-পর তিনদিন একই সময় সেই মূর্তিকে ছাদে উঠে যেতে দেখলেন। জ্যাঠাইমা ছাড়া কেউই তেমন পাত্তা দিলেন না, মায়ের এই দেখাটাকে। ঠিক সাতদিনের মাথায় ছাতে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে মায়ের পায়ের তলায় একটা মাছের কাঁটা ফুটে গেল। হয় কাকে এনেছিল, না হয় বেড়ালে। কাঁটাটা টেনে খুলে ফেলে দিয়েছিলেন। নিচে নেমে এসে জ্যাঠাইমাকে একবার বলেছিলেন। জ্যাঠাইমা আয়োডিন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। জিনিসটাকে কেউই তেমন ভয়ের চোখে দেখেননি, কিন্তু সেইদিনই সন্ধেবেলা মায়ের কেঁপে জ্বর এল। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে বললেন, 'আর কিছু করার নেই, ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেছে।' চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মা চলে গেলেন।

দিদি আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে। মনে মনে ভাবি, মা হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছেন। হঠাৎ ফিরে আসবেন একদিন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরবেন আমাদের দু-জনকে। আমি দিদির দিকে তাকাই। দিদি আমার দিকে। দু'জনেই কেঁদে ফেলি।

দিদি বলে, 'মায়ের মতো মা কি আর পাওয়া যাবে রে বিলু! আর বেঁচে থেকে কী হবে। জ্যাঠাইমাও আমাদের মা। তাহলেও, মা একটা আলাদা জিনিস।'

পাড়া-প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, তখনই বলেছিলুম, বাড়িটা হানাবাড়ি। শুনলে না

সূচীপত্রে যান

তোমরা! এখনও সময় আছে। সংসারটা চুরমার হয়ে যাওয়ার আগে পালাও। কেউই সে-কথা শুনলেন না। বাবা বললেন, 'এদের মা যেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আমার কাছে সেই জায়গাটা তীর্থ।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'ঠিকই তো, ঠিকই তো!'

ছ'টা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল। শীতের মুখে দিদি একদিন সেই মূর্তি দেখতে পেল সিঁড়িতে। লালপাড় শাড়ি পরে ছাতের সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে ওপরে। দিদি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'বিলু এইবার আমার মরার পালা।'

সকলে দিদিকে জেরা শুরু করলেন, 'তুই কী দেখেছিস, ঠিক করে বল।' দিদি বললে, 'বলে আর কী হবে! আমি যা দেখার দেখেছি। এইবার আমাকে নিয়ে যাবে। আমাকেও চলে যেতে হবে মায়ের কাছে।'

আমি আর দিদি এক বিছানায় পাশাপাশি শুতুম। চাঁদের আলো এসে পড়েছে দিদির মুখে। দিদি অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে ছিল কপালে হাত রেখে। হঠাৎ আমার দিকে পাশ ফিরে বললে, 'শোন, বিলু আমি তো চলে যাচ্ছি, আমার যা আছে সব একটা বাক্সে ভরে তোর কাছে রেখে দিবি। কাউকে দিবি না। বাক্সটার ওপর বড় বড় করে লিখে রাখবি, 'আমার দিদি'। যখন তুই অনেক, অনেক বড় হয়ে যাবি, তখনও বাক্সটা তোর কাছে রেখে দিবি। মাঝে-মাঝে খুলে দেখবি। যখনই খুলবি আমার গলা শুনতে পাবি, বিলু।'

সে-রাতে দুজনেই জেগে রইলুম। কারও চোখে ঘুম নেই। সকালে সারা বাড়িতে ভীষণ উত্তেজনা। আমাদের ছাদে আমাদেরই সাদা ধবধবে বেড়ালটা মরে পড়ে আছে। সুস্থ সুন্দর বেড়াল। আগের রাতে জ্যাঠাইমার হাতে মাছ-ভাত খেয়ে গেছে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। ফুলের মতো সাদা একটা বেড়াল দলা পাকিয়ে পড়ে আছে ছাতের এক কোণে। কাল রাতে কাগজের একটা দলা নিয়ে কত খেলেছে! দিদির কোলে শুয়ে ঘড়ঘড় করেছে। জ্যাঠাইমা যখন রান্নাঘরে রাঁধছিলেন, পিঠে গা-ঘষেছে।

দিদি ঘরে গিয়ে চুপ করে বসল। আমাকে বলল, 'বড় ভয় করছে রে বিলু! আমার মৃত্যুটা কীভাবে হবে! ছাতে, না ঘরে!'

সূচীপত্রে যান

আমার ঠাকুরদা সেদিন আর স্কুলে গেলেন না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বাবা আর জ্যাঠামশাইকে বলে গেলেন, 'তোমরা উমাকে ঘিরে বসে থাকো, যেন নিয়ে না যেতে পারে!' কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কিছুই বললেন না।

অনেকক্ষণ পরে ফিরলেন একটা লরি চেপে, সঙ্গে তিনজন লোক। সেইদিনই বাড়িটা ছেড়ে দিলাম। সব জিনিসপত্তর নিয়ে আমরা আর একটা বাড়িতে এসে উঠলুম। ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু ভূত যেন একালের টেররিস্ট। দিদির বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে সেদিন বলেছিল, 'বাড়িটা ছাড়, নয়তো একেও মারব!'

শুধু একটাই দুঃখ, বাড়িটায় না এলে, মা হয়তো আজও বেঁচে থাকতেন!

সূচীপত্রে যান

নিশির ডাক

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আমরা তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। জায়গাটা কলকাতার কাছে হলেও বেশ গ্রাম-গ্রাম। পশ্চিমে গঙ্গা। সেদিকে সব মন্দির, বাগানবাড়ি, বাঁশ-বিচালির গোলা। পশ্চিম থেকে একটি মাত্র পিচ-বাঁধানো রাস্তা পুবে বাসরাস্তার দিকে চলে গেছে। বাকি সব অলি-গলি, গলির গলি, তস্য গলি। পাকা বাড়ি, সাবেক কালের বাড়ি অনেক ছিল, আবার সেইসঙ্গে ছিল, টিন, টালি, খড়ের চালা। বড় বড় গাছ। নিম, তেঁতুল, বট, অর্জুন। জংলা অবসতি, বাগান। একটা বাগান ছিল সেখানে শুধু কুলগাছ। আমরা সেখানে শীতকালে কুল চুরি করতে যেতুম। হরি-মালি তাড়া করলে, মার দৌড়। ধরবে কী করে, আমরা যে ছোট ছিলুম। হরিণের মতো দৌড়তে পারতুম। ধরতে না পেরে হরিদা চিৎকা করে বলত, 'সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাওয়া, দাঁড়া, মা কালীকে বলে দেব।'

সেই সময়ে একদিন আমাদের বন্ধুমহলে খবর রটে গেল, আজ রাতে নিশির ডাক বেরোবে। আজ অমাবস্যা। সেটা কী জিনিস! বিমানই এই গোপন খবরটা এনেছিল। সেই সব জানে। বিমান বললে, 'জমিদার অনাদি মল্লিকের এখন তখন অবস্থা। অত বড় বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, ঘোড়ার গাড়ি। তাঁকে তো সহজে মরতে দেওয়া যায় না। ডাক্তার-বদ্যি সব জবাব দিয়ে গেছেন। তাই এই শেষ চেষ্টা। অন্যের পরমায়ু কেড়ে নিয়ে তাঁকে বাঁচানো হবে। এক তান্ত্রিক এসেছেন পশুপতিনাথ পাহাড় থেকে। সারা গায়ে তেল-সিঁদুর মেখে তিনি রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে পথে বেরোবেন। হাতে থাকবে জলসমেত মুখ খোলা একটা ডাব। তিনি পল্লিবাসী সকলের নাম ধরে ডাকতে থাকবেন একে-একে। প্রত্যেকের নাম তিনবার করে ডাকবেন। যেই কেউ সাড়া দেবে, অমনই ডাবের খোলার মুখটা টপ

সূচীপত্রে যান

করে চাপা দিয়ে দেবেন। অমনই তার প্রাণ ওই ডাবের জলে আবদ্ধ হয়ে যাবে। ওই জল মল্লিকমশাইকে খাওয়ালে তিনি বেঁচে উঠবেন আর এ মারা যাবে।'

বিমান বললে, 'খুব সাবধান! আজ আমরা সারা রাত জেগে থাকব। ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে সাড়া দিয়েছিস, কী মরেছিস।'

'পশুপতিনাথের তান্ত্রিক আমাদের নাম জানবে কী করে!'

'এ-পাড়ার লোকই জানিয়ে দেবে। লিস্ট ধরিয়ে দেবে।'

বাড়িতে এসে মাকে খুব চুপি চুপি কথাটা বললুম। বাবা খুব কড়া মানুষ। ভূত, প্রেত, তন্ত্র, মন্ত্র মানেন না। শুধু বলবেন, 'অঙ্ক কষো, অঙ্ক। অঙ্কই জীবন, অঙ্কই ভগবান।' আর ওই অঙ্কটাই আমি পারি না। তাই বাবাকে না বলে মাকে বললুম। তা ছাড়া মায়ের চেয়ে বড়বন্ধু মানুষের আর কে আছে!

মা খুব ভয় পেলেন। মায়ের ছেলেবেলায় এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। মা এইসব অলৌকিক ব্যাপার খুব বিশ্বাস করেন। সিঙ্গুরে একবার ভুলভুলাইয়া ভূত মাকে সারারাত জঙ্গলে ঘুরিয়েছিল। আধমাইল দূরে মায়ের বাড়ি, মা কিন্তু কিছুতেই পৌঁছতে পারলেন না। ভুল রাস্তায় সারারাত চক্কর মারলেন।

সব শুনে মা বললেন, 'আমরা তো জেগে থাকবই, তবে একজনকে নিয়েই আমার ভয়। সে তোর বাবা। যদি জানতে পারে সারারাত লাঠি হাতে রাস্তার রকে বসে থাকবে। এলেই পিটিয়ে শেষ করে দেবে, তারপর যা হয় হবে। না জানানোই ভালো। সেখানেও ভয়, ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে উত্তর দিয়ে দিলেই হয়ে গেল।'

আমি বললুম, 'বাবার পাশে আমিই তো শুই। জেগেই থাকব। যদি দেখি উত্তর দিতে যাচ্ছেন, সঙ্গে-সঙ্গে মুখ চেপে ধরব।'

আমাদের রাতজাগার সব পরিকল্পনা প্রস্তুত। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গার ধারের বটতলায় বসে ওই একই আলোচনা হল। সন্ধে হব হব, বাড়ি ফিরে এলুম। চারপাশ এরই মধ্যে কেমন যেন থমথম করছে। কালীবাড়িতে অমাবস্যার রাতের পুজোর আয়োজন হচ্ছে দেখে

এসেছি। অন্য অমাবস্যায় আমরা বন্ধুরা গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচিভোগ খাওয়ার লোভে ঠিক হাজির হয়ে যেতুম। সে রাত বারোটাই হোক, একটাই হোক। আজ আর কোনও বেরোনো-টেরোনো নয়। টাইট হয়ে বসে থাকো বাড়িতে।

অমাবস্যার রাত অন্ধকার হয় ঠিকই, তবে আজ যেন আলকাতরা রাত। ঘরের জানলায় আকাশটা আটকে আছে, মনে হচ্ছে ওইখানেই শেষ। ওর পরে আর কিছু নেই, মাথা ঠুকে যাচ্ছে। তারাগুলো যেন আগুনের মতো জ্বলছে ধকধক করে। রাস্তাতেও আজ যেন তেমন লোক চলাচল নেই। রাত ন'টার আগেই সব যেন নিঝুম মেরে গেল। দোকানপাট বন্ধ। মিষ্টির দোকানের পেছন দিকের ছেঁচা বেড়ার দরজাটা খোলা। মাঠে আলো পড়েছে। মজা পুকুর। কচুগাছের ঝোপ। কালো কুকুরটা কড়ার চাঁছি খাওয়ার লোভে সামনের থাবায় মুখ রেখে বসে আছে। এই সবই আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরের জানলায় বসে।

রাত দশটার সময় মা বললেন, 'দেখছিস পলাশ, আজ এরই মধ্যে ঘুমে শরীর যেন ভারী হয়ে আসছে। তোর কিছু মনে হচ্ছে না!'

'মনে হচ্ছে না আবার! ইতিহাস পড়ছিলুম, এমন ঢুল ধরল, মাথাটা টাঁই করে দেওয়ালে ঠুকে গেল। তাই তো এই জানলায় এসে বসে আছি।'

'বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা! সারা পাড়াটাকে মন্ত্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে আস্তে-আস্তে।'

'কীভাবে করে মা?'

'আমি জানি। খুব একটা উঁচু জায়গায় উঠে বিশাল একটা ধুনুচিতে আগুন জ্বালিয়ে ধুনো দিতে থাকে। মানুষের শরীর ভারী হয়। ঘুম পায়। বেশ একটা সুখ-সুখ লাগে। এই সুখের মধ্যে থেকেই একজন চলে যায়।'

'এর হাত থেকে বাঁচার উপায়?'

'আমার জানা আছে। লঙ্কা পোড়া। দাঁড়া চাটুতে কয়েকটা লঙ্কা পোড়াই। সব প্রভাব কেটে যাবে।' কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িসুদ্ধু সবাই হাঁচি আর কাশিতে অস্থির। আমাদের পুসিটা

একপাশে থুপ্‌সি মেরে ঘুমোচ্ছিল। ফিঁচ ফিঁচ করে হাঁচতে-হাঁচতে উঠে বসল। অবাক হয়ে গেছে। রাত দশটার সময় এ আবার কী! বাবা বাইরের ঘর থেকে ছুটে এলেন, 'কী করছ কী তুমি! এরপর লোকে যে থানায় ডায়েরি করবে আমাদের নামে।'

মা শুধু গম্ভীর মুখে একটা কথাই বললেন,'যা করছি সবই জীবের মঙ্গলের জন্যে।'

'এর চেয়ে অমঙ্গল আর কী হতে পারে!' বলে, বাবা উদ্দাম কাশতে-কাশতে পালিয়ে গেলেন। মন্দিরে অমাবস্যায় রাতের পুজো শুরু হয়ে গেছে। কাঁসর, ঘণ্টা, জগঝম্পের শব্দ ভেসে আসছে।

রাত এগারোটার সময় রোজ যেমন আমরা শুয়ে পড়ি, সেইরকমই শোয়া হল। আলো-টালো সব নিভে গেছে। এক বিছানায় বাবা আর আমি পাশাপাশি। আর এক বিছানায় মা। দোতলার ঘর। ঠিক নীচেই রাস্তা। গরম কাল। জানলা-টানলা সব খোলা। বাবার শ্বাস-প্রশ্বাস যেই বড় হল, মশারির ভেতর থেকে ফিসফিস করে ডাকলেন, 'পলাশ!'

'সব ঠিক আছে মা।'

বাবা পাশ ফিরলেন। আমরা দুজনেই চুপ করে গেলুম। মন্দিরের আরতি শেষ। রাত নিঝুম। কোথাও একটা কুকুরও আজ ডাকছে না। শুধু দেওয়াল ঘড়ির ঠকাস-ঠকাস শব্দ। ঠাং করে একটা বাজল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আর বোধহয় জেগে থাকতে পারলুম না। আমাকে সাবধান করে মা নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। জোরে জোরে নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। ভীষণ ভয় করছে আমার।

রাত দেড়টা। আজ আর বোধহয় নিশি বেরোল না। সবটাই গুজব। এমনও হয় না কি! এইসব ভেবে সবে পাশ ফিরে শুয়েছি, এমন সময় দূরে কোথাও চিং করে একটা শব্দ হল। আমার কান খাড়া। বিছানায় আধশোয়া। গম্ভীর গলায় কে টেনে-টেনে সুর করে ডাকছে, 'অনাথ, অনাথ।' তিনবার। পরের নাম, 'দীনবন্ধু, দীনবন্ধু।' গলাটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে, ডাকতে ডাকতে। আমাদের বাড়ির সামনে। বাবার নাম ধরে ডাকছে,'হরিশঙ্কর, হরিশঙ্কর।' আমার হাত বাবার ঠোঁটের কাছে। তেমন হলেই চেপে ধরব।

খুব ইচ্ছে করছে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি। ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছে। বাবাকে ছেড়ে উঠতে পারছি না তাই। ডাকটা ক্রমশই গঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছে, 'কানাই, কানাই, বনমালী, বনমালী, হারাধন, হারাধন।' শেষে আর শোনা গেল না। বাতাসের শাঁ শাঁ শব্দ। গঙ্গায় শেষ রাতে স্টিমারের ভোঁ। ডাকটা কি আবার এদিকে ঘুরে আসবে! এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি!

পরের দিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। বাইরের রাস্তায় লোকজন, হইচই। রাতের অতবড় একটা ঘটনার কোনও চিহ্নই পড়ে নেই। আরও একটু বেলা বাড়তেই পবিত্রদের বাড়ি ছুটে গেলুম। ওইখানেই আমাদের আড্ডা বসে। তারপর ওইখান থেকেই কোমরে গামছা বেঁধে আমরা গঙ্গায় গিয়ে পড়ি।

সেদিন আর কোনও আলোচনা নয়। একটাই বিষয়, নিশির ডাকে কেউ কি সাড়া দিয়েছিল! না, নিশি ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল! আমরা অনুসন্ধানে বেরোলুম। ডেকে ডেকে জিগ্যেস তো করা যায় না, কে মারা গেছে। যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে ঘুরে-ঘুরে দেখতে হবে।

এ পাড়া, সে পাড়া, এ গলি, সে গলি ঘুরছি আমরা। জীবন স্বাভাবিক। কোথাও কিছু নেই। তার মানে সব বাজে। কোনও এক পাগলের কীর্তি। বিমান আবার সাহস করে দোতলার বারান্দা থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে নিশি দেখেছে। বেঁটেখাটে, চারচৌকো, জটাজূটধারী একটা জীব। দগদগে লাল। বেলুনের মতো রাস্তার এক হাত ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। শেয়ালের মতো কণ্ঠস্বর, 'নিতাই, নিতাই।'

পাড়ার শেষ মাথায় রাস্তার কলে দাঁড়িয়ে দুজন কাজের মেয়ে বলাবলি করছে, কুলবাগানের হারু কাল শেষ রাতে হঠাৎ মারা গেছে। রাতে খাটিয়া পেতে দাওয়ায় শুয়েছিল। সুস্থ সবল একটা মানুষ। অসুখ নেই, বিসুখ নেই। সকালে দেখা গেল, বিছানায় মরে পড়ে আছে।

ছোট, ছোট। হারুদার কুলবাগান। গাছের পর গাছ। গোল গোল পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে

আসছে প্রখর সূর্যের আলো। ছায়া আছে, তবে কেমন যেন শুকনো ছায়া। মাঝখানে একটা কুঁড়েঘর। খবর পেয়ে কিছু লোকজন এসেছে। খাটিয়ায় চিত হয়ে পড়ে আছে আমাদের হারুদা। চেহারাটা কাগজের মতো ফ্যাকফ্যাকে সাদা। সবাই বলাবলি করছে, হার্ট অ্যাটাক।

একমাত্র আমরাই জানি ব্যাপারটা কী! রাত দুটোর সময় মৃত্যুর কণ্ঠস্বর—'হারুউ হারুউ।' আধো ঘুম, আধো জাগরণে একটি উত্তর—'যাই।' খপ করে ডাবের খোলার মুখ বন্ধ।

এখন ভাবি, এমনও হয়! কিন্তু তার পরে অনাদি মল্লিক আরও অনেকদিন বেঁচে থেকে শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন।

সূচীপত্রে যান

ভূতের খেলা

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আমার একটা ভূত আছে। আমারই ভূত। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় ছায়ার মতো। কেউ দেখতে পায় না ঠিকই; কিন্তু আমি বুঝতে পারি। কীভাবে পারি এইবার সেইসব কথাই বলি। আমি প্রমাণ দেব।

দুপুরবেলা। গরমের ছুটি। আমাদের দোতলার ঘরের জানালার পাশে বসে বেশ আপন মনে অঙ্ক কষছি। অঙ্ক হয়ে গেছে, ইংরেজি পড়ব। তারপর বাঙলা। ইতিহাস। ভূগোল। মনে মনে রুটিন তৈরি। গরমের ছুটিটাই তো ভালো করে পড়ার সময়। যতটা পেছিয়ে আছি ঠিক ততটাই তো এগোতে হবে। বড়রা বলবেন কী, আমি নিজেই তো জানি। ভালো করে পড়ব, ভালো রেজাল্ট করব। ভালো চাকরি পাব। ইয়া বড় একটা গোঁফ রাখব। লাল মতো একটা মোটর গাড়ি কিনব। কথাতেই তো আছে—লেখা-পড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চাপে সে।

যেই না আমি শেষ কথাটা মনে-মনে বলেছি অমনি কে একজন বেশ ভারী গলায় বলে উঠল না রে, লেখাপড়া করে যে গাড়ি চাপা পড়ে সে। ভূতের সঙ্গে অনেকক্ষণ তর্কযুদ্ধ হল। ভূত তো জিতবেই। ভূতের টেরিফিক পাওয়ার সবাই জানে।

জিগ্যেস করলুম—তাহলে, এখন আমার কী করা উচিত?

—এমন একটা কিছু করো যাতে বেশ মজা আছে। এই যে বসে বসে একের পিঠে দুই করছ, এতে কোনও মজা আছে? এ তুমি করছ প্রাণের দায়ে, ধোলাইয়ের ভয়ে। এতে কোনও চার্ম নেই। চার্ম! নীচে ভাঁড়ার ঘরের কুলঙ্গিতে তোমার মা কাচের বয়ামে বয়ামে আমের আচার করে রেখেছেন, একেবারে ম্যাডাগাসকার। এই সুযোগ। মা ঘুমোচ্ছেন।

—শোনো, সেটা তো তাহলে চুরি হল।

—গবেট! মায়ের জিনিস সবসময় এই ভাবে চুরি করেই খেতে হয়। কী তাহলে ইতিহাস

সূচীপত্রে যান

পড়লে এতদিন। ওই যে শ্রীকৃষ্ণ। অতবড় অবতার! যাঁর গীতা তোমার বাবা রোজ সকালে পড়েন, তিনি কী করতেন ছেলেবেলায়? ওই দেখ দেয়ালে ঝুলছে ছবি। ছেলের পিঠে ছেলে, তার পিঠে ছেলে, গোপাল তার ওপর খাড়া, হাতের নাগালে সিকে। ভাঁড়ে কী আছে? ননী। গোপাল চোর! অবশ্যই। তবে ননীচোর। তোর মা রোজ যে অষ্টোত্তর শতনাম পড়েন, তাতে আছে, ননীচোরা রাখালরাজা, শ্রীমধুসূদন! একে বলে বাল্যলীলা। ধর্মও জানো না, ইতিহাসও জানো না, তোমার ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার!

—তাহলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে আসি।

খাতা, বই, কলম, পেনসিল সব পড়ে রইল জানলার ধারে। মা শোবার ঘরের খাটে নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম করছে। একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিল, বোঝাই যাচ্ছে। আধখোলা বইটা পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মা পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি খাবারঘর থেকে একটা চেয়ার এনে ভাঁড়ার ঘরের উঁচু তাকের সামনে রাখলুম। আঃ সারসার বয়ামে আচার, মোরব্বা। কী তার রূপ! সুড়ুক করে জিভের জল টেনে নিলুম। জয় গোপাল বলে উঠে দাঁড়ালুম চেয়ারে। আমার সামনে পরপর চারটে বয়াম। আচারে টইটম্বুর। তেল-ঝাল-টক-নুন-মিষ্টি। আমার চাই টক-মিষ্টি। তাড়াহুড়ো করার তো কিছু নেই। ধীরে। প্ল্যানটা গুলিয়ে গেল। বয়ামটা নামাব, না একটা কিছু এনে, হাত ঢুকিয়ে তাইতে বের করে নেব!

আবার সেই গলা—একটা ডিশ আনো। এক খামচা তাইতে তুলে নাও। টুক করে নেমে পড়ো চেয়ার থেকে। পাঁচটা আঙুল তারিয়ে-তারিয়ে চোষো। ওটা ফাউ। আসল তোমার ডিশে। সোজা চলে যাও ছাতে। জলের ট্যাঙ্কের ছায়া পড়েছে। সেখানে বেলফুলের টবের পাশে বসে একটু একটু করে সাবাড় করো। আকাশ দেখো, চিল ওড়া দেখো, শালিকের গান শোনো। গরম বাতাস গায়ে মাখো। সব শেষে এতখানি একটা জিভ বের করে চেটে চেটে ডিশটাকে একেবারে সাফা করে ফেলো। কোথায় লাগে তোমার শুকনো অঙ্ক, খড়খড়ে ইংরেজি।

ভূত যা বললে, আমি একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করলুম। আমি তো

অবাধ্যি নই। ভূত বললে—শোনোনি, জিভে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

—না, কথাটা তা নয় তো। তুমি ব-এ, ভ-এ গোলমাল করে ফেলেছ। ওটা হবে জীবে দয়া করে যেই জন।

—গাধা! জিভ ছাড়া কোনও জীব হয়! সমস্ত কথার একটা ব্যাখ্যা থাকে। গীতার সাতটা ব্যাখ্যা আছে। ভাগবতের তিনটে।

যাক ব্যাপারটা বেশ ভালোয়-ভালোয় মিটে গেল। আচার-টাচার খাওয়া হয়ে যাবার পরে যখন অঙ্ক-টঙ্ক শেষ করে মাঠে খেলতে যাবার জন্যে রেডি হচ্ছি, তখন মা উঠে বসে তিনবার শ্রীমধুসূদন বললে। তার মানে আমাকেই বলা হল। আমি তো গোপাল। চুরি করে আচার খেয়েছি। গোপাল বড় হলেই মধুসূদন।

রাতের বেলা বাবা খাবার টেবিলে চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে বললে, চেয়ার রঙ করিয়েছ বুঝি! এখনও রঙ শুকোয়নি। চ্যাট-চ্যাট করছে।'

মা বললে, 'রঙ করাব কেন? এ তো পালিশ করা।'

'এসব তাহলে কী চট-চট করছে?'

আমি কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললুম, 'এবার তো আমেরিকা মঙ্গলগ্রহে চলল।'

বাবা আর একটা চেয়ারে বসতে-বসতে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও আগে যাক। কাজটা খুব সহজ নয়।'

মা কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে চেয়ারটা পরীক্ষা করে চলেছে। আর নিজের মনেই বলছে—রসগোল্লার রস তো হবে না। বহুকাল রসগোল্লা আসেনি। চাটনি সাতদিনের মধ্যে হয়নি। তা হলে, তা হলে? মা যেন গোয়েন্দাগিরি শুরু করলে। মায়ের এই এক দোষ। মাথায় একটা কিছু ঢুকলেই হল। হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়বে।'

আমি বললুম, 'মঙ্গলগ্রহে মানুষ থাকলে বেশ হত।'

বাধা বললে, 'বেশ তো হত; কিন্তু পৃথিবী ছাড়া কোথাও মানুষ নেই।'

হঠাৎ মায়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'ফোঁস-ফোঁস করে চেয়ারটায় কী শুঁকছো বলো তো, পুলিশ কুকুরের মতো?'

'দেখছি কেন চটচট করবে! কী লেগেছে! এ তো ঠিক নয়! চেয়ার কেন চটচট করবে! তোমার হাতে লেগেছে, বাইরের কারোর হাতে লাগলে, তিনি কী ভাবতেন? ভাবতেন জানোয়ারের বাড়ি!

'থাক গে, ও শোঁকাশুঁকি ছেড়ে দাও। রাত হয়ে গেছে, খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক।'

মা হঠাৎ তিরবেগে ছুটে গেল ভাঁড়ার ঘরের দিকে। সর্বনাশ করেছে। না, সর্বনাশের কী আছে! ধরতে পারবে না কী! তবু চোরের মন তো! আমি টেবিলে তবলা বাজাতে লাগলুম।

বাবা বললেন, 'না, না, ওটা তুমি ঠিক করছ না। তবলা আর টেবিল এক জিনিস নয়।' মা ভাঁড়ারঘর থেকে চিৎকার করে উঠল, 'কে আচারের বয়ামের ঢাকনা খুলে রেখেছে, খোকা!' আমি বাবাকে বললুম, 'দেখেছ বাবা, যত দোষ নন্দ ঘোষ।'

মা ঢাকনা খোলা বয়ামটা টেবিলে এনে আমাদের দুজনের সামনে ঠকাস-ঠকাস করে বসিয়ে দিলে। বাবা বললে 'কী হল?'

'কী আবার হবে। এ তোমার ছেলের কাজ। এই চেয়ারে উঠে আচার পেড়ে খেয়েছে। সেই হাতে চেয়ারটা মাখামাখি করেছে। চাপাটা খুলে রেখেছে। এই দেখো দুটো আরশোলা ঢুকে বসে আছে। এক বয়াম আচার নষ্ট।'

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার কাজ!'

বলতে যাচ্ছিলুম, না। ভূত আমার গলা চেপে ধরল—মিথ্যে বোলো না। সত্য বলো। অন্যায় স্বীকার করো।

আমি মাথা নিচু করে বললুম, 'অন্যায় হয়ে গেছে।'

বাবা বললে, 'ভেরি গুড। তুমি যে অস্বীকার করলে না, এর জন্যই তোমার সাতখুন মাপ। শোনো, ছোটরা এইরকম কাজ একেবারেই করবে না, এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। তবে না করলেই ভালো। জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল তো!'

ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেল। মা বললে, 'চাইলেই যখন পাস, তখন তোর কষ্ট করে চুরি করার দরকার কী?'

সূচীপত্রে যান

বাবা বললে, 'আঃ সে তুমি বুঝবে না। আচার জিনিসটাই এমন যে চুরি ছাড়া জমে না।' তা, সাত-আট দিন বেশ কেটে গেল। ভূতের উপদ্রব হল না। হঠাৎ ঘটে গেল এক ঘটনা। আমাদের বাড়ি কাজ করে মনুর মা। তার খুব জ্বর হয়েছিল। সবে ছেড়েছে। ভীষণ কিন্তু দুর্বল। আমি পড়ছি; আর সে ঘরের এক ধারে ধুলোটুলো ঝাড়ছে ঝাড়ন দিয়ে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, মেঝেতে চুরমার হয়ে পড়ে আছে বাবার সবচেয়ে প্রিয় পাথরের মূর্তিটা। নটরাজ। বাইরে থেকে কিনে এনেছিলেন। মূর্তিটা বসানো ছিল বইয়ের র‍্যাকের মাথায়। মনুর মা মেঝেতে বসে পড়েছে। তার অসুস্থ, রুগ্‌ণ মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ভাঙা একটা খণ্ড হাতে নিয়ে বসে আছে অসহায়ের মতো। দু-গাল বেয়ে চোখের জল নামব-নামব করছে। আমি ভাঙা টুকরোটা হাতে থেকে কেড়ে নিয়ে বললুম, এ-কী করলে?

বলতে বলতেই মা ছুটে এসেছে—কী ভাঙল?

আমার ভূতটা বেরিয়ে এল। এসেই বললে, অ্যাকশান, অ্যাকশান, কুইক, কুইক। আমি মনুর মাকে আড়াল করে উঠে দাঁড়ালুম। দাঁড়িয়ে বললুম, 'আমার হাতে লেগে মূর্তিটা পড়ে গেছে মা।'

মা দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে বললে, 'সর্বনাশ! এ কী করলি! তোর বাবা অফিস থেকে এসে একেবারে মেরে ফেলবে। ওর সবচেয়ে প্রাণের জিনিস। আমি জানি না বাবা!'

একটা বড় কাগজ এনে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরোগুলো কুড়োলুম সব। মনুর মাকে ফিসফিস করে বললুম, 'চোখ মোছো। তোমার কোনও ভয় নেই। যা হবার আমার হবে।'

মনুর মায়ের সেই যে তাকাবার ভঙ্গি, আমি জীবনে ভুলব না। ভূত বললে—এই তোমার পুরস্কার।

আমি একটা পাথর জোড়ার আঠা কিনে আনলুম। জ্যামিতির বাক্স থেকে বের করে আনলুম ছোট্ট সরু চিমটেটা। সেই দুপুর। সেই জানলার ধার। বাইরে রোদ ঝলসানো জ্বলজ্বলে আকাশ। আমার সামনে কাগজের ওপর অসংখ্য টুকরোয় ছাত্রকার নটরাজ। বাবার প্রাণ।

সূচীপত্রে যান

আমার ভূত আমার পাশে বসে আছে আমার কাঁধে হাত রেখে। সে আমার কানে কানে বললে, ভাঙা জিনিস জোড়া লাগানোই তো সাধনা! শুরু করো। সন্ধের আগেই জিনিসটাকে এমন করে জুড়ে ফেলো, যেন তোমার বাবা দেখে আর বুঝতেই না পারেন।

দুপুর ক্রমশ গড়াতে লাগল বিকেলের দিকে। একের পর এক টুকরো ভাঙায় ভাঙা মিলিয়ে জুড়ে চলেছি। সে এক অদ্ভুত নেশা। মাঝে অতি সূক্ষ্ম টুকরোগুলো জুড়তে পারব কি না বলে সন্দেহ আসছে মনে, তখন আমার ভূত আমাকে শক্তি ধার দিচ্ছে—পারবে, তুমি পারবে। একাগ্রতাই সে-শক্তি। সন্ধের ঠিক মুখে, মূর্তি ফিরে গেল যথাস্থানে। বোঝার উপায় নেই।

কোথা থেকে কী হয়! আমি আজ পৃথিবীর একজন বিখ্যাত 'রেস্টোরার', ভাঙা জিনিস জোড়া লাগাই। বাস করি লন্ডনে। কাজ করি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। গভীর রাতে চড়া আলোর তলায় টেবিলে বসে যখন কাজ করি—আমার ভূত বলে, কেমন মজা। তখন কিন্তু মনে পড়ে যায় মাকে—সেই আচার। মনে পড়ে যায় মনুর মাকে। মূর্তি ভেঙে বসে আছে, মঝেতে। অসহায় হাতে একটা টুকরো।

সূচীপত্রে যান

মর্গান সাহেবের বাগান

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

কী আশ্চর্য!

শোবার আগে বিছানায় বসে ঢক ঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে বালিশে মাথা। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম। শেষ রাতে সুন্দর একটা স্বপ্ন। ঠিক পাঁচটায় চোখ মেলে তাকানো। জানলায় লেগে আছে ভোর। প্রথম পাখির ডাক। রোজ, রোজ, এই আমার অভ্যাস।

কিন্তু, কী আশ্চর্য!

কাল আমি গেলাসটা মাথার কাছের ছোট্ট টেবিলটায় রেখেছিলুম, সেটা পুবের জানলার প্যারাপেটে চলে গেল কী করে! ঘরের দরজা বন্ধ। টেবিল থেকে জানলার দূরত্ব অবশ্যই ষোলো ফুট! কি জানি বাবা! ভোরের আলোয় পাতলা কাচের গেলাসটায় অদ্ভুত একটা গোলাপি রঙের আভা।

বিছানা থেকে নেমে দরজাটা পরীক্ষা করলুম। না, ছিটকিনি ভেতর থেকে বন্ধ। আমি না খুলে দিলে ভেতরে কারো আসার সাধ্যি নেই। এইবার গেলাসটার কাছে গেলুম। তলায় মিহি সাদা গুঁড়োর মতো কী সব পড়ে আছে। পরিষ্কার কলের জল খেয়েছিলুম। খাওয়ার আগে অভ্যাসমতো আলোর দিকে তুলে দেখে নিয়েছিলুম। পরিষ্কার জল। কিচ্ছু ছিল না। গেলাসটা যেখানে আছে থাক। হাত দিতে সাহস হচ্ছে না। বরং মনোজকে ডাকি।

মনোজ আমার শাগরেদ। বয়েস কম, কিন্তু তুখড় ছেলে। মনোজ আমার সঙ্গে থাকলে, আই ডোন্ট কেয়ার। দরজা খুলে বাইরের দালানে বেরিয়ে অবাক। অজস্র তুলো, রাশি রাশি তুলো ভোরের বাতাসে মেঝেতে ওড়াউড়ি করছে। কাল খুব গরম ছিল। মনোজ গাড়িবারান্দার ছাতে শুয়েছিল। সেই দিকে যেতে যেতে ভাবছি, নিশ্চয় বিরাট বিরাট গেছো ইঁদুর আছে, এসব তাদেরই কাজ। দুটো ইঁদুরে গেলাসটাকে জানলার কাছে বয়ে নিয়ে গেছে। ইঁদুরের অসাধ্য কিছু নেই।

সূচীপত্রে যান

মনোজ একটা মাদুরে থান ইট মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাণ্ড দেখো ছেলের! বালিশ কি ছিল না! ধাক্কাধাক্কি করে তুললুম। মনোজ অবাক। বালিশে মাথা দিয়েই শুয়েছিল। থান ইট এল কোথা থেকে! তার মানে, কেউ বালিশটা টেনে নিয়ে মাথার তলায় ইট গুঁজে দিয়েছে। বালিশটাকে ছিঁড়ে ফর্দাফাই করে সব তুলো দালানে ছড়িয়ে দিয়েছে।

কে? কে সেই শয়তান!

এই অদ্ভুত সুন্দর বাগানবাড়িটা আমার বাবা কিনেছেন। একপাশে ইছামতী নদী। দূরে রেলব্রিজ। এদিকে পাশাপাশি আরও কয়েকটা বাগানবাড়ি। প্রায় সারা বছর বন্ধই পড়ে থাকে। মালিকরা সব ইউরোপ, আমেরিকায়। ওপাশে বিরাট এক শিবমন্দির। মন্দির চূড়ায় রুপোর ধ্বজা বাতাসে ঘুরপাক খায়। অসাধারণ জায়গা।

কাল গৃহপ্রবেশ হয়ে গেল। নিয়ম অনুযায়ী তিন রাত কাটাতে হয়। আমি আর মনোজ এই তিন দিন থাকব। প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা তো এই। কোনো মাথামুণ্ডু নেই। ভয় পেলে পাওয়া যায়, কিন্তু কেন পাব! বদমাইশ লোকের কাজ হলে, আজ রাতে তার বরাতে পেটাই। ভূত হলে, আমরা দু'জনেই ভূত বিশ্বাস করি না। বিজ্ঞান আর ভূত একসঙ্গে থাকতে পারে না, যেমন, আলো আর অন্ধকার!

মনোজ বললে, 'চা খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কালই আমরা দেখেছি, শিবমন্দিরের কাছে ভালো একটা দোকান আছে।

সকালে দারুণ আকর্ষণীয় গরম জিলিপি করে, আর লোভনীয় পাঞ্জাবি চা। আমাদের সঙ্গে নতুন একটা মোটর সাইকেল আছে। মনোজ বললে, 'চাবিটা দাও।'

মনোজ চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে নিচে থেকে চিৎকার, 'এ কি গো এক ফোঁটা তেল নেই। তেল কোথায় গেল?'

গাড়িটা তালাবন্ধ গ্যারেজে ছিল। কাল বিকেলে আমরা ফুলট্যাঙ্ক তেল ভরেছি। চলেছে মাত্র সাত কিলোমিটার। এইবার মনোজই বললে, 'ভৌতিক ব্যাপার। এ ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তোমার বিজ্ঞান ফেল মেরে যাবে।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শিবমন্দিরের দিকেই চললুম। বাঙালির ছেলে, সকালে চা না খেলে দিন শুরু করা যায়! মন্দিরের পাশ দিয়ে বইছে ইছামতী। ভারী সুন্দর। এই সব বিচ্ছিরি ব্যাপার না ঘটলে, এমন সুন্দর জায়গায়, এই সুন্দর কালে আমি আর মনোজ দু'জনে গলা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতুম। গতবার দুর্গাপুজোর ফাংশানে আমরা দু'জনে গান গেয়ে দুটো ওয়াটার বট্‌ল পুরস্কার পেয়েছিলুম। সেই বট্‌ল দুটো আমরা এখানে এনেছি।

মন্দিরে প্রণাম করে, প্রচুর জিলিপি আর চা খেয়ে ঠিক করলুম একেবারে বাজার করে ফিরব। দোকান থেকে একটা ব্যাগ কিনে, যাবতীয় বাজার করে, আবার এক গেলাস করে চা খেয়ে আমরা বাগানে ফিরে এসে হতভম্ব। বিশাল গেটে বিরাট একটা মরচে ধরা তালা লাগানো। দেখলেই মনে হয় তালাটা কমসে কম শ'খানেক বছরের পুরোনো।

হাতে বাজারের ব্যাগ। ভেতরে সব জিনিসপত্র আমাদের। বিশাল পাঁচিলঘেরা এই বাগান। বাইরে থেকে বাড়িটা চোখে পড়ার উপায় নেই। মনোজ বললে, 'এই বদমাইশিটা আমাদের সঙ্গে কে করলে? নিশ্চয় তৃতীয় আর একজন কেউ আছে!'

আমি বললুম, 'ছিল। সারারাত ঘাপটি মেরে ছিল, এখন আর নেই। তালা ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেছে।'

মনোজ বললে, 'আমি পাঁচিল টপকে ভেতরে নামছি।'

'পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবি! ভেতরে পড়লে আমি তোকে বার করব কী করে? পাঁচিলটা কত উঁচু দেখেছিস?'

'তাহলে সারাদিন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকি!'

ভয়ঙ্কর কাশতে কাশতে সাইকেলে চেপে মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক আসছেন। খুব ধীর গতিতে সাইকেল চালাচ্ছেন। আমাদের বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তিনি নেমে পড়লেন। আমরা কিছু বলার আগেই বললেন, 'কি তালা?'

আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'হ্যাঁ তালা! আপনি কী করে জানলেন?'

'এই অঞ্চলের সবাই জানে ভাই। মর্গান সাহেবের তালা। ভালো করে দেখো, তালার গায়ে

লেখা আছে, চাবস, মেড ইন ইংল্যান্ড, নাইনটিন হান্ড্রেড ওয়ান।'

'ও তো মরচে ধরা ভূতুড়ে তালা!'

'অ্যায়, এই যে শব্দটি বললে ভূতুড়ে, ওইটাই ঠিক শ্যামবাবুকে...'

'শ্যামবাবু তো আমার বাবার নাম, আপনি চেনেন?'

'তাঁকে কে না চেনে, অত বড় উকিল! শ্যামবাবুকে জেলা আদালতের আমরা সবাই বারণ করেছিলুম। শুনলেন না। বড্ড কড়া ধাতের মানুষ। তোমরা শোনো। মর্গান সাহেবের বাবা ছিলেন নীল কুঠিয়াল। জানো নিশ্চয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহেবরা নীলের চাষ করত। মর্গান একটা চটকল করেছিল আরও অনেক সাহেবকে নিয়ে। মর্গান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করেছিল। বীর। মর্গানের বউটার চরিত্র ছিল ব্যাড। ভেরি ব্যাড। একদিন রাত্তিরে ফিকে গোলাপি রঙের একটা গেলাসে মদের সঙ্গে সেঁকো বিষ খাইয়েছিল। বদমাইশ মেয়ে। এদের জ্যান্ত কবর দেওয়া উচিত। মেম যদি সুন্দরী হয়, জানবে ডেন্‌জারাস! অ্যাজ ডেন্‌জারাস অ্যাজ সারপেন্ট।'

ভদ্রলোক সাইকেলে উঠতে যাচ্ছেন, আমরা বললুম, 'এ কি, আপনি চলে যাচ্ছেন!'

'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বাবা! আমার ইস্কুল বসে গেছে। কাশির জন্যে দেরি হয়ে গেল।'

'ওষুধ খাচ্ছেন?'

'ওষুধ খাব কেন?'

'এই যে বললেন কাশি!'

'আরে ধুর বাপু! কাশি আমার বড় ছেলের নাম। আমার তিন ছেলে, তিনটেই তীর্থ—কাশি, বৃন্দাবন, মথুরা।'

'তাহলে বলে যান আমরা কী করব!'

'কী আবার করবে! আর সবাই যা করেছে! এই তালা ভাঙার সাহস কারো নেই। বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে। কে এক খেম্‌কা এই বাগানটা কিনেছিল। তারও এই এক অবস্থা। পয়সার গরমে নিজে লোহা ঢুকিয়ে তালা ভেঙেছিল। সব মরে গেল। তাদের বাড়ির বেড়ালটা পর্যন্ত ডেড।'

'ভাঙা তালাটা আবার এল কী করে!'

'বোকার মতো কোশ্চেন কোরো না। ভূত আর ভগবান, দুটো জগতেই সম্ভব-অসম্ভব বলে কিছু নেই। সবই সম্ভব। যাই হোক, তোমাদের খুব পছন্দ হয়েছে আমার, তাই তালা খোলার উপায়টা বলে যাই। ইছামতীর তীরে, এখান থেকে তিন মাইল দূরে একটা ভাঙা চিমনি দেখতে পাবে। অনেক দূর থেকেই দেখা যাবে। সেটা লক্ষ্য করে নদীর কূলে গিয়ে দেখবে গাছপালার মধ্যে নির্জন এক সমাধি। পাথরের গায়ে অস্পষ্ট লেখা, জেমস মর্গান। সেই সমাধিতে মোমবাতি দিয়ে, ফুল ছড়িয়ে, প্রার্থনা করবে ভক্তি ভরে—প্লিজ ওপ্‌ন দি লক। বলবে, আপনার বাগানে থাকার আর চেষ্টা করব না। মার্জনা চাইছি, মার্জনা। ফিরে এসে দেখবে, গেট ইজ ওপ্‌ন।'

ভদ্রলোক সাইকেলে উঠে একটু এগোতেই আমরা অবাক। কোথায় সেই ভদ্রলোক। সাইকেলের আরোহী শোলার হ্যাট পরা ধবধবে সাদা এক সাহেব। আরোহী সমেত সাইকেল নিমেষে অদৃশ্য।

মনোজ আবার সেই কথাটা বললে, 'ভৌতিক'।

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

সেই রাত

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

একটা কথা আছে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। আমার ঠিক তাই হল। একে শীতকাল, তায় থাকার জায়গার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। অফিসের এক অর্ডারে চলে এসেছি অযোধ্যা পাহাড়ের ধারে পাণ্ডববর্জিত এই জায়গায়। এখানে সব আছে। সুন্দর সমান্তরাল একটি পাহাড়। সুন্দর একটি বন, যদিও পত্রশূন্য গাছপালা, কারণ সময়টা শীতের, বিশাল-বিশাল প্রান্তর, ছোট-ছোট আদিবাসী গ্রাম, অজস্র তুঁত গাছ। প্রতিটি গাছে লাক্ষা পোকা সব পাতা খেয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত আকৃতির জমাট জটলা তৈরি করেছে। পরে এর থেকে তৈরি হবে গালা। সন্ধ্যার আকাশপটে এই গাছগুলোকে দেখে গা আরও ছমছম করছে। একটি-দুটি সাঁওতাল পরিবার এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তা ছাড়া সবই নির্জন। একটু পরে বাঘ না বেরোক, দস্যু তস্করের আসতে কোনও আপত্তি নেই। যথাসর্বস্ব কেড়ে তো নেবেই, মেরে ফেলতেও পারে।

কী করব ভেবে না পেয়ে চুপ করে বসে আছি একটা পাথরখণ্ডে। পাশ দিয়ে চলে গেছে পথ। যা হয় হবে। দেখাই যাক না ভগবান কী করেন। সন্ন্যাসীরা তো এর চেয়ে অনেক দুর্গম স্থানে ভগবান ভরসা করে চলে যান। আমি সন্ন্যাসী না হলেও আত্মসমর্পণ তো করতে পারি।

দূর থেকে একটা ঝকঝকে সাদা মোটরগাড়ি আসছে। পেছনে তাড়া করে আসছে শীত, শুকনো পথের ধুলো। গাড়িটা হুস্ করে আমার পাশ দিয়ে চলে গিয়ে কিছুটা দূরে থামল। দেখি ব্যাক করে আমার দিকেই আসছে। আমি বসে আছি। এতই পরিশ্রান্ত যে, ওঠার ক্ষমতা নেই।

চালকের আসন থেকে মুখ বাড়িয়ে সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "আপনার নাম কি পলাশ!"

সূচীপত্রে যান

এইবার উঠে দাঁড়ালুম "হ্যাঁ, আমার নাম পলাশ।"

"আশ্চর্য! চিনতে পারছিস না! আমি সত্যেন!"

"সত্যেন! স্কটিশের সত্যেন!"

"স্কটিশের। মনে আছে, আমরা দু'জনে দশহরার দিন সাঁতরে গঙ্গা পার হয়েছিলুম।"

"খুব মনে আছে, তবে তুই আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছিস।"

"তুই কিন্তু যেমন ছিলি তেমনই আছিস। এখানে কী করছিস! নিশ্চিন্তে বসে আছিস! যেন, তোর বাড়ির বৈঠকখানা!"

"কিছুই না, সামান্যই সমস্যা, রাতটা কোথায় কাটাব ভাবছি! এখানে হোটেল, গেস্টহাউস, রেস্টহাউস কিছুই নেই।"

"উঠে আয় আমার গাড়িতে। ভাগ্যিস, এলুম এই পথে, নইলে হয় তোকে বাঘে খেত, নয় মানুষে টুকরো করত। এটা ডাকাতে অঞ্চল! আর একনজরে তোকে আমি ঠিক চিনতেও পেরেছি, একই রকম আছিস বলে। একটুও পালটাসনি!"

গাড়িটা একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। সত্যেন মনে হয় বড় মাপের ডাক্তার হয়েছে। ও লাইন চেঞ্জ করেছিল, এইটুকু খবর আমি রাখতুম। গাড়ি চালাতে-চালাতে আমাকে প্রশ্ন করলে, "কী কাজে এসেছিস এখানে?"

"গালার চাষ দেখতে। যারা চাষ করে তাদের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বিক্রির কাজে সাহায্য করতে। একটা প্রোজেক্ট।"

"আমি কী করছি জানিস!"

"এইটুকু বুঝেছি, এমন একটা কিছু করছিস, যাতে মানুষ মোটা হয়, আর ঝকঝকে নতুন গাড়ি হয়।"

"আজ্ঞে না, এই গাড়িটা আমাদের ফাউন্ডেশনের। এখানে বিদেশি টাকায় আমরা একটা হাসপাতাল করছি। আমি তার চার্জে আছি। এখনও অনেক কাজ বাকি। একটু একটু করে সব হচ্ছে। বিল্ডিংটা হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি অনেক এসেছে, আরও অনেক আসবে।"

কথা বলতে-বলতেই আমরা এসে গেছি। বিশাল একটা জায়গায়, শেষ বিকেলের আলোয়

ঝকঝকে একটা বাড়ি। আর কোথাও কিছু নেই। লোকজনের বসবাস, দোকানপাট সব আমরা ছেড়ে চলে এসেছি। রুক্ষ জায়গা। গাছপালা তেমন কিছুই নেই। এই একটা অঞ্চল, যেখানে খুব জলকষ্ট। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম।

সত্যেন বলল, "আগে চা খাওয়া যাক, তারপর সব দেখাব। আমার লোকজন এখনও খুবই কম। সব আসবে একে-একে। এখানে একটা টাউনশিপ হবে। স্কুল হবে, রাস্তা হবে, পোস্টাফিস হবে। সব হতে আরও বছর পাঁচেক।"

চা এল। সঙ্গে একটা করে রোল, খুবই সুস্বাদু। তারিফ করতেই সত্যেন বলল "মোটা হওয়ার কারণটা বুঝলি। এর জন্যে দায়ী আমাদের এই গজেন্দ্র!"

গজেন্দ্র নিতান্তই যুবক। ফরসা সুন্দর চেহারা। সে হাসছে। সত্যেন বলল, "হাসিস না। এত সাঙ্ঘাতিক ভাল রান্নার হাত, মোটেই ভাল নয়। হেল্‌থ সেন্টারের হেল্‌থ খারাপ করার তালে আছ! তোমার জন্যে আমার খাওয়া ডবল হয়ে গেছে। অন্য কোথাও গিয়ে খেতে পারি না। স্বাদ পাই না। শোনো, আমার অনেক দিনের দোস্ত এসেছে। কী খাওয়াবে।"

"জব্বর শীত পড়েছে। ভাবছি খিচুড়ি করব, সঙ্গে কিছু ফ্রাই।"

"তোমার সেই অসাধারণ খিচুড়ি! ও ওয়ান্ডারফুল! ওটার কোনও জবাব নেই গজেন।"

সত্যেন আমাকে বলল, "এখানকার জল মানুষের শত্রু! অ্যায়সা খিদে হয়! এই খাও, এই হজম! বিরক্তিকর ব্যাপার। পাশেই বিহার বেল্ট তো! তা গজেন, আর-একটা করে রোল হবে!"

"না, সার! হলেও দেব না। এখন আর লোভ করবেন না। রাতেরটা আজ একটু হেভি হবে।"

"দ্যাট্‌স রাইট, দ্যাট্‌স রাইট।"

সোয়েটার, শাল জড়িয়ে, হনুমান টুপি চড়িয়ে, গোটা এলাকাটা ঘুরে এলুম। একরের পর একর জমি! মেন বিল্ডিং ছাড়া সবই আন্ডার কনস্ট্রাকশন। জায়গায়-জায়গায় লোহালক্কড়, বালি, পাথর ডাঁই হয়ে আছে। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সব পরিষ্কার। দূরে বাঘমুণ্ডি পাহাড়। দু-একটা

বহু পুরনো কনস্ট্রাকশন, একটা পুরনো শেডও রয়েছে। কোনওকালে হয়তো এখানে একটা কিছু ছিল! এত নির্জন, এত ফাঁকা, আমাদের মতো শহরের লোকদের ভাল লাগে না। ভয়-ভয় করে।

রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চুটিয়ে গল্প হল। পুরনো দিনের, পুরনো বন্ধুদের কলেজ জীবনের কথা। মাঝে একবার কফি হল। তারপর খাওয়া। কিমা, কড়াইশুঁটি দিয়ে এইরকম সুস্বাদু খিচুড়ি, এই আমার প্রথম খাওয়া, এই আমার শেষ খাওয়া। সঙ্গে ফিশফ্রাই। সেটা মার-মার, কাট-কাট। গজেনটাকে মেরে ফেলা উচিত। একটু পরেই জানতে পারলুম—গজেন একজন জুনিয়র ডাক্তার। রান্নাটা তার হবি।

সত্যেন বলল, "তোর শয়নের ব্যবস্থা আমাদের নতুন সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে করেছি। নতুন খাট, বালিশ, বিছানা, মশারি। অ্যাটাচ্‌ড বাথ। সব নতুন।"

সত্যিই তাই। আমার ঘুমের অপারেশন দিয়ে কেবিনের উদ্বোধন। দেওয়াল নেই বললেই চলে। চারদিকে বড়-বড় কাচের জানলা। ঝকঝক করছে। নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো। নেটের মশারি গুঁজে আলো নিভিয়ে, দুর্গা বলে শুয়ে পড়লুম। সবই কাচ, চাঁদের আলোয় পানসির মতো ভাসছি। বাঁ পাশে খাট ঘেঁষে বিশাল জানলা। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো। গ্রিল, গরাদে, কিছুই নেই। শুয়ে-শুয়েই দেখছি, ফাঁকা মাঠ, চাঁদের আলো, আর বহু দূরে সেই প্রাচীনকালের শেডটা। যত অন্ধকার ঘাপটি মেরে আছে সেখানে।

সারাদিনের ছোটাছুটি, ঘুম এসে গেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। অদ্ভুত একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, বাঁ পাশের জানলাটা খুব কাঁপছে। ঝড় উঠল না কি! ফটফটে চাঁদের আলো, ঝড় এল কোথা থেকে শুয়ে-শুয়েই দেখছি। জানলাটা ছটফট করছে। তাকিয়ে আছি সেইদিকে। হঠাৎ দেখি, জানালার নীচের টাওয়ার বোল্টটা হঠাৎ ওপরদিকে উঠে, ডান দিকে ঘুরে গেল। জানলার একটা পাল্লা অক্লেশে খুলে গেল। মশারির ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি হাত বের করে পাল্লাটা বন্ধ করে দিলুম।

শুয়ে আছি। ঘুম চটকে গেছে। জানলার কাঁপুনি আবার। আড় হয়ে শুয়ে-শুয়েই দেখছি। নড়তে নড়তে তলার ছিটকিনিটা ওপর দিকে উঠেছে। ডানপাশে নিজের থেকে ঘুরে গেল, পাল্লাটা ধড়াস করে খুলে গেল।

সূচীপত্রে যান

ভূতের ভয় আমার নেই, তবে বদমাশ লোককে আমি সাজা দিতে চাই। উঠে পড়লুম। দুটো পাল্লাই খুলে দিলুম। কই, হাওয়া-বাতাস তো কিছুই নেই। নিস্তব্ধ রাত, চাঁদের আলো, গোটা দুই বড়-বড় তারা। দূরে-দূরে শীতকাতুরে কুকুরের ডাক।

কোনও বদমাশের কাজ! ভয় দেখাতে এসেছে। পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। উঁচু ভিতের ওপর বাড়ি। ফুট চারেক নিচে জমি। কিছু ঘাস, কিছু কাঁকর। মারলুম লাফ।

কোথায় কী! কেউ নেই। আমি আর আমার এই রাত। চারপাশ চাঁদের আলোয় ফটফট করছে। কোথাও একটা কুকুর নেই। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম—লুক বিফোর ইউ লিপ। উত্তেজনায় সেই উপদেশ ভুলেছি। যে পথে নেমেছি, সে-পথে আর ফেরা যাবে না। এখন আমাকে ঘুরে ফ্রন্ট এনট্রান্সে যেতে হবে, ডাকাডাকি করে ওদের ঘুম ভাঙাতে হবে।

এইসব ভাবতে-ভাবতেই আমার কেমন একটা ঘোর লেগে গেল, চাঁদের আলো ভরে গেল কুয়াশার মতো। জেগে আছি, ঘুমোচ্ছি না স্বপ্ন দেখছি! বোধের বাইরে। কেউ আমাকে চালাচ্ছে, হাঁটাচ্ছে। চলেছি সেই বিধ্বস্ত শেডটির দিকে। ক্রমশ অন্ধকার, আরও অন্ধকার। শেড্‌টার ভেতর চলে গেছি। ফাটাফুটো দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে। একপাশে অনেক ব্যারেল। কাঠকুটো। একটা কংক্রিট মিক্সার। ভাঙা ফার্নিচার। কোনও কিছুই মানছি না আমি। কলের পুতুলের মতো এগোচ্ছি। কেউ যেন আমাকে দম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। গেঞ্জি আর পাজামা পরে আছি, তাও আমার শীত নেই।

হঠাৎ দেখি, সামনে কেউ ঝুলছে।

ওপরের কাঠের বিম থেকে ঝুলে আছে কেউ।

তার মাথা থেকে গলা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা। শরীরটা অল্প-অল্প ঘুরছে। আলো-অন্ধকারে।

কে?

আর মনে নেই। যখন জ্ঞান এল, সকাল রোদ। সত্যেনের বিছানায় আমি। গায়ে কম্বল পায়ে হট ব্যাগ। গজেন আমাকে গরম দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করছে। টেবিলের ওপর টোস্ট ওমলেট।

ইতিহাসটা পাওয়া গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা ছিল আমেরিকান আর্মিদের বেস ক্যাম্প। তখন এখানে এক অফিসারকে জার্মান স্পাই সন্দেহে 'কোর্ট মার্শাল' করা হয়েছিল।

সূচীপত্রে যান

পরে এখানকার অ্যামুনিশন ডাম্পে আগুন লেগে অনেক সৈনিক মারা গিয়েছিল, ছাউনি পুড়ে গিয়েছিল।

সত্যেন বলল, "এখন কেমন ফিল করছিস।"

"একটু ঘোর আছে।"

"ঠিক হয়ে যাবে। খুব বাঁচা বেঁচে গেছিস। নে, টোস্ট খা, গজেনের ডবল ডেকার ওমলেটেই চাঙ্গা হয়ে যাবি। তোর কী ভাগ্য পলাশ! আমি শুধু শুনেইছি, তুই কেমন অতীতটা বর্তমানে দেখে ফেললি! গজেন্দ্র।"

"ইয়েস সার!"

"আজ আমার ফ্রেন্ডের অনারে..।"

"চেপে গেছে সার। কড়া মেনু।"

"গজেন্দ্র! তোমার তুলনা শুধু তুমিই।"

গগনের মাছ

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

গগন পরশুদিন নাটাগড়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তার অন্য কোনো নেশা নেই। বন্ধু-বান্ধব নেই। আড্ডা নেই। তাস-পাশা নেই। যা আছে তা হল মাছ ধরার ঝোঁক। পুকুর কিংবা বিল দেখলেই তার প্রাণটা নেচে ওঠে। যত তাড়াতাড়ি থাক, যত কাজই থাক, সে জলের ধারে থমকে দাঁড়ায়। জলের রং দেখলেই সে বুঝতে পারে, সেই পুকুর কিংবা বিলে কী কী মাছ আছে। কত বড় মাছ আছে। মাছগুলোর স্বভাব কী? সহজে ধরা দেবে, না বঁড়শির মুখে গাঁথা টোপটি ঠুকরে ফাতনাটি দুবার নাচিয়ে দিয়ে সরে পড়বে? জলের তলায় ঝাঁজি আছে কি না, ছোট কাঁকড়া কিংবা কাছিম আছে কি না, জলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই সে জলের মতো বুঝতে পারে। তার এই স্বভাবের জন্যে লোকে তাকে মেছো গগন বলে। অনেকের ধারণা গগন পূর্বজন্মে মাছরাঙা ছিল। আগামী জন্মে ভোঁদোড় হয়ে জন্মাবে।

এই মাছের নেশাটি আছে বলেই গগনের জীবনে কোনো দুঃখ নেই। সদাশিব মানুষ। লম্বাচওড়া চেহারা। সহজ সরল মানুষ। একটা বড় কারখানায় হাতের কাজ করে যা উপার্জন করে, মা আর ছেলের ছোট্ট সংসার সুখেই চলে যায়। শৈশবেই বাবা মারা যান। লেখাপড়া সেই কারণে খুব বেশিদূর এগোয়নি। বিধবা মা, সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কোনো রকমে ছেলেকে মানুষ করেছেন। পৈতৃক বাড়িটা ছিল তাই রক্ষে। ছোট একতলা বাড়ি। খানচারেক ঘর। দুখানা ঘর ভাড়া দিয়ে গগনের মা সংসার চালাতেন। ভাড়াটে ভালো। ভাড়া নিয়ে কোনো অসুবিধা কোনো কালে হয়নি। সেই ভাড়াটে এখনো আছেন। অনেকটা বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গেছেন তাঁরা। দুটো পরিবারকে এখন আলাদা করাই শক্ত। বাইশ বছর আগে যা ভাড়া ছিল, এখনো তাই আছে। এক পয়সা ভাড়া বাড়ানোর কথা কেউ কখনো বলেননি। এখন গগন রোজগার করছে। ভাড়ার টাকার উপর তাদের আর নির্ভর করতে হয় না। যা আসে সেইটুকুই বাড়তি।

সূচীপত্রে যান

গগনের বাহন হল সাইকেল। পৈতৃক সাইকেল। সেকালের জিনিস। গগনের যত্নে ঠিক সারভিস দিয়ে যাচ্ছে। একবার চুরি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সাইকেলটা গগনের সেবায় এতই সন্তুষ্ট যে আবার ফিরে এসেছিল দিনকতক পরে। থানার দারোগা বলেছিলেন,'গগনবাবু, এরকম বরাত লাখে একটা মেলে।' গগন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সের আড়াই ওজনের একটা কালবোশ দারোগাবাবুকে প্রেজেন্ট করে এসেছিল। গগনের মাছ-ধরা এই জন্যেই। নিজে আর কতটা খাবে!! গগন ধরে মাছ, পাড়ার লোকে খায়। প্রতিবেশীরাই ভালো পুকুরের সন্ধান এনে দেয়। গগন সাইকেল নানা মাপের ছিপ, হুইল বেঁধে চার, টোপ নিয়ে, টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে সাতসকালেই বেরিয়ে পড়ে। গ্রীষ্ম আর বর্ষার দিনে ছাতা থাকে। ইদানীং এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিডও সঙ্গে রাখে। বারকতক কেউটে সাপে তাড়া করেছিল।

নাটাগড়ের পুকুরটার খবর দিয়েছিল তারই এক সহকর্মী। সে-ই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বলেছিল, বিশাল পুকুর পাঁচিলঘেরা বাগানের মধ্যে। বারোয়ারি পুকুর নয়, মাছগুলো সেই কারণে ছ্যাঁচড়া নয়। ছিপ ফেলতেই ধরা দেবে। সব মাছই বড়। বৈষ্ণবের পুকুর, কালেভদ্রে জাল পড়ে। খুব জানাশোনা লোক ন-মাসে ছ-মাসে শখ করে ছিপ ফেলে।

গগন অবশ্য ঠিক এই রকম পুকুরে মাছ ধরতে চায় না। সে হল পাকা মাছ-ধরিয়ে। খেলোয়াড়, ত্যাঁদোড়, তেএঁটে মাছ না হলে সে মাছ ধরে আনন্দ পায় না। অনেকদিন তেমন সুযোগ পাচ্ছিল না বলে এ সুযোগটা সে হাতছাড়া করল না। দেখাই যাক না কী হয়! গগন বেরিয়ে পড়ল। বাহন সাইকেল। সঙ্গে একটা টর্চও নিল। দূরের পথ, পথে আলো থাকবে কি না কে জানে! সাবধানের মার নেই।

বিশাল পুকুর। সরোবর বলাই ভালো। যাঁদের পুকুর তাঁরা এককালে জমিদার ছিলেন। একপাশে তাঁদের বিশাল বাড়ি। সংস্কারের অভাবে একটু জীর্ণ। একপাশে পুরোনো মডেলের একটা অস্টিন গাড়ি পড়ে আছে। গাড়িটা মনে হয় চলে। সামনেই ঢালা ছাদ। ছাদের কার্নিসে একটা পরি ডানা মেলে আছে। যেন এক্ষুনি উড়ে যাবে। দেউড়িতে এখনো দারোয়ান বসে। গগনের সাইকেলের মতো পুরোনো মনিবের মায়া ছাড়তে পারছে না বলেই বোধ হয় বহাল আছে।

বাগানের গেট পেরিয়ে ইট-বাঁধানো পথে এগোতে এগোতে গগন যেন পুরোনো কালের গন্ধ পেল। বহু স্মৃতি যেন ভিড় করে এল। প্রাচীন গাছের কালো গুঁড়িতে সবুজ শ্যাওলা।

বছরের পর বছর পাতা পড়ে গাছের তলায় তলায় আর মাটি দেখা যায় না। রোদ খুব কমই পড়ে। পাতা পচার জৈবগন্ধ। জায়গায় জায়গায় সাদা সাদা ব্যাঙের ছাতা। এক একটা গাছের গায়ে পরগাছা উঠেছে লতিয়ে লতিয়ে। একসময়কার সযত্ন পরিচর্যার বাগান দীর্ঘ অবহেলায় না বাগান, না জঙ্গল এক ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি করেছে। মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের নানা রঙের মূর্তি চলে যাওয়া একটা কালকে পাথরের অবয়বে ধরে রেখেছে। গগনের মনে হল, মানুষের সমৃদ্ধি কত ক্ষণস্থায়ী। গরিব আছি বেশ আছি বাবা। উত্থানও নেই পতনও নেই। ছেলেবেলায় কথায় কথায় মা বলতেন না—'অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে; অতি নিচু হয়ো না গরুতে মুড়িয়ে খাবে।'

বাগানের পথ দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে বেঁকতে বেঁকতে গগন সেই পুকুরের পাড়ে এল। যেখানে তার সারাটা দিন কাটবে জলের ওপর বাতাসের হালকা তরঙ্গ দেখে, ফাতনা দেখে, মাছের বুড়বুড়ি আর ঘাই মারা লক্ষ্য করে। পুকুরটা এক সময় খুব যত্নের পুকুর ছিল দেখলেই বোঝা যায়। চারপাশ ইট দিয়ে বাঁধানো। চারদিক থেকে চারটে ঘাট জলের অনেক দূর পর্যন্ত নেমে গেছে। পাথর বসানো ঘাটের পৈঠের জোড় জায়গায় জায়গায় ছেড়ে গেছে। সেইসব ফাঁকে ছোট ছোট আগাছা জন্মেছে। কতকালের পুরোনো জল, যেন আলকাতরা গোলা। চারিদিক শান্ত নির্জন। কোথায় একটা পাখি ডাকছে, টুই-টুই—।

গগন জল চেনে। পুকুরটা দেখে তার ছিপ ফেলতে ইচ্ছে হল না। তার মনে হল, চারিদিকে যেন একটা অশরীরী আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। জলে, ভাঙা ঘাটে পুরোনো দিনের অনেক গোপন কথা যেন শ্যাওলার মতো ছড়িয়ে আছে। বড়লোকের পুকুর দেখলেই গগনের আত্মহত্যার কথা মনে হয়। মনে হয় জলের তলায় চেনবাঁধা কঙ্কাল আছে। মনে হয় পুকুরের মাঝখানে গভীর একটা কুয়ো আছে, যেখান থেকে মাঝরাতে চেন শিকল আর লোহার কড়া নাড়াবার ঠনঠন শব্দ ওঠে। কেউ যেন গুমরে কেঁদে ওঠে, আমায় মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। মাঝে মাঝে সোনার বালা পরা একটা হাত মাঝ-পুকুরে জলের ওপর ভেসে উঠে কিছু একটা ধরার নিষ্ফল চেষ্টা করে আবার তলিয়ে যায়। গগন এসব কখনো দেখেনি, তার মনে হয়।

ঘাটের বাঁধানো বেদিতে বসে, পাশে তার ঝোলাঝুলি সাজসরঞ্জাম নামিয়ে রেখে গগন চারপাশটা একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল। চারিদিকে বড় বড় রাই ঘাস গজিয়েছে, সাপের

আত্মগোপনের জায়গা। গগন খুব হতাশ হল। এই পুকুর নিয়ে গল্প লেখা চলে, মাছ ধরা চলে না। হঠাৎ পুকুরের মাঝখানে জল উথলে উঠল। ঘাই দেখে মনে হয়, সের তিরিশ ওজনের একটা মাছ। এতবড় মাছ ছিপে পড়লেও ছেড়ে দিতে হবে। এ মাছ কেউ খায় না।

এতদূর এসে গগনের ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছে না। চুপচাপ বসে থাকতে অবশ্য খারাপ লাগছে না। জল থেকে রোদের তাতে গরম-ঠান্ডা মেশানো একটা ভাপ উঠছে। গাছের পাতায় ছায়া কাঁপছে। ঘাসের ডগা সিরসির করে হাওয়ায় দুলছে। পুরোনো দিনের অনেক কথা গগনের মনে আসছিল। পুরোনো কথা যত মনে পড়ছিল, মনটাও তত বিষণ্ণ হচ্ছিল। একবার মনে হল, ফিরে যায়। তারপরে মনে হল, অনেকে আশা করে থাকবে—গগন কখনো ফেলিওর হয়নি।

টিনের কৌটো খুলে গগন চার, টোপ সব একবার দেখে নিল। মনে মনে বলল, এসেছি যখন, এক হাত ফেলেই দেখি, কী হয়! পুকুরের দিকে তাকিয়ে গগনের মনে হল, মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মতো অজানা সম্ভাবনা নিয়ে স্থির অচঞ্চল। ঘাটে বসে কি মাছ ধরা যায়? গগন হেসে উঠল। একটু আঘাটায় বসতে হয়। বসবে কী করে! বাঁধানো পাড় ঢালু নেমে গেছে। অগত্যা ঘাটের শেষ পৈঠেতে বসে গগন ছিপ ফেললে। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে! খুব প্রাচীন মাছও সাঁ সাঁ করে শব্দ করে, গগন শুনেছে। অবশ্য নিজের কানে কখনো শোনেনি।

ফাতনার উপর বারেবারে একটা ফড়িং এসে বসেছে। ঠিক বসছে না, কেঁপে কেঁপে উড়ছে। জলের উপর ছোট্ট একটা মাথা জ্বলজ্বলে দুটো চোখ নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে সরে যাচ্ছে। জোলো হাওয়ার গরম-ঠান্ডায় গগনের চোখে যেন ঘুমের আমেজ আসছে। প্রচুর নেশা করলে মানুষের এই অবস্থা হয়। তবু গগন জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। এক সময় তার মনে হল বঁড়শিটা কিছুতে ঠোকরাচ্ছে। গগন ফাতনাটা কায়দা করে সোজা করে নিল, হেলে গিয়েছিল।

ফাতনাটা হঠাৎ ডুবে গেল। গগন প্রস্তুত ছিল, সুতোটা একটু টান করেই আলগা দিল। বড় মাছ বলেই মনে হচ্ছে। এ পুকুরে ছোট মাছ নেই, গগন জল দেখেই বুঝেছে। এও বুঝেছে, চালাক মাছ একটাও নেই, সব কটা বোকা গাধা। খাদ্য আর টোপের পার্থক্য বোঝে

না। তা না হলে বঁড়শি ফেলতেই ধরত না। গগনের মনে হল, মাছটা না খেলেই ভালো হত। অনর্থক এখন খেলাতে হবে। শেষে উঠে আসবে শ্যাওলা ধরা পাঁকগন্ধ এক মাছ। যাকে মাছ না বলে মৎস্যাবতার বললেই ভালো হয়। যার বয়স হয়তো পঞ্চাশ বছর।

মাছটা অবশেষে উঠল। যা ভেবেছিল তাই। মাছটা ইচ্ছে করলে ন্যাজের ঝাপটা মেরে গগনকে কাবু করে ফেলতে পারে। ইচ্ছে করলে খেয়েও ফেলতে পারে। সারা গায়ে কালো আঁশের উপর এক ধরনের সাদা সাদা লালা জড়িয়ে আছে। গগনের হাত ঠেকাতেই ইচ্ছে করছিল না। কোনো রকমে ঘাটের পৈঠেতে ফেলল! গগন আশ্চর্য হয়ে দেখল, মাছটার নাকে এক সোনার নথ লাগানো। অবাক কাণ্ড। মাছটা খাবি খাচ্ছে, চিঁ চিঁ করে একটা শব্দ করছে।

গগন কী করবে ভাবছে। এমন সময়ে তার পেছনে হাল্‌কা চুড়ির কিন কিন শব্দ হল। গগন চমকে ফিরে তাকাল। তার পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ন-দশ বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে। একরাশ ঘন কালো চুল। আকাশের মতো নীল বড় বড় দুটো চোখ। হাতে গোল গোল দুটো সরু সরু মিছরিকাটা সোনার চুড়ি।

গগন তাকাতেই মেয়েটি বলল— ওমা তুমি আমার ভোলাকে ধরেছ। তুমি কি গো, ওকে ছেড়ে দাও!

গগন বললে, এর নাম বুঝি ভোলা?

—হ্যাঁ গো, দেখছ না ওর নাকে নোলোক। আমার মা পরিয়ে দিয়েছিলেন।

—তোমার নাম কী মা?

—আমার নাম চুমকি। তুমি আগে ছেড়ে দাও, জানো না বুঝি জলের বাইরে মাছ বেশিক্ষণ বাঁচে না!

—দিচ্ছি মা, ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা বলছিলুম তো!

—আমার সঙ্গে পরে কথা বলবে। আগে ওকে ছেড়ে দাও। তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর। জলের মাছকে কেউ ডাঙায় তোলে!

গগন তাড়াতাড়ি মাছটাকে জলে ছেড়ে দিল। মুখ না ঘুরিয়েই বললে, এই নাও তোমার ভোলা আবার জলে চলে গেল। আর আমাকে নিষ্ঠুর বলবে—বলো মা, আর আমাকে নিষ্ঠুর বলবে?

সূচীপত্রে যান

ভোলা তখন ন্যাজ নাড়তে নাড়তে চলে যাচ্ছে। গগন কোনো উত্তর না পেয়ে ফিরে তাকাল। কোথায় কী, কেউ কোথাও নেই! গগন জোরে জোরে ডাকল,—চুমকি, চুমকি! বাতাসের শব্দ, সেই পাখিটা ডাকছে টুঁই-টুঁই।

নির্জন দুপুর। বড় বড় গাছের তলায় আলোছায়ার খেলা।

গগনের কেমন ভয়-ভয় করল। মনে হল দুপুর নয়, চারিদিকে নিশুতি রাত নেমে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, সে কি মানুষ? ছমছমে মন নিয়ে গগন বাগানের গেটের কাছে ফিরে এল। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁগো, চুমকি বলে এ বাড়িতে কোনো মেয়ে আছে? প্রশ্ন শুনে দারোয়ানের মুখটা কী রকম হয়ে গেল। কেন বাবু? গগন বললে, —না, বেশ মেয়েটি। এইমাত্র আমার সঙ্গে কথা হল, তারপর কোথায় যে চলে গেল হঠাৎ! দারোয়ান হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল—সে বাবু অনেককাল আগের কথা। এই বাড়ির মেজোবাবুর ছোট মেয়ে ছিল। বিশ-বাইশ বছর আগে ওই পুকুরে ডুবে মারা যায়। মেজবাবুও বেঁচে নেই। মাইজি এখন বালিগঞ্জে থাকেন। ওই ছিল একমাত্র মেয়ে। কী করে যে ডুবে মারা গেল কেউ জানে না। এই বাড়ির একটা ঘরে এখনো তার খাটবিছানা পাতা আছে। সব খেলনা বই সাজানো আছে। মাইজি মাঝে মাঝে আসেন। আজও এসেছিলেন। এই একটু আগে চলে গেলেন।

গগন তাকিয়ে দেখল, সেই অস্টিন গাড়িটা নেই।

গগনের নাটাগড়ের গল্প কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। গগন কিন্তু মাছ আর ধরে না। সব মাছই এখন তার কাছে ভোলা। চুমকি তাকে নিষ্ঠুর বলেছিল, সেই কথাটা তার মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে।

'মাছ কি ডাঙায় বাঁচে! তুমি এত নিষ্ঠুর কেন গো।'

নীল চোখ, কোঁকড়া চুল, চুড়ির মিঠে রিনি রিনি।

মাছের নেশা আর গগনের নেই।

সূচীপত্রে যান

ভূতেরা ভূতদের কিছু করাতে পারে না

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আমার বড়োমামার অনেক উদ্ভট কাণ্ডের এটি একটি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—'একটি খাঁটি ভূতের বাড়ি কিনতে চাই। মালিক যোগাযোগ করুন।' সাতদিন গেল, আটদিন গেল, একমাস গেল। কারুর দেখা নেই। চায়ের টেবিলে মেজমামা বললেন, 'ভূতের বাড়ি পাবে কোথায়? সব প্রোমোটারদের দখলে। ভূতের বাড়ি মানে পোড়োবাড়ি। পোড়োবাড়ির পড়ে থাকার উপায় আছে? ভূতদের জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়। সব উদ্বাস্তু হয়ে কোথায়-কোথায় ঘুরছে কে জানে। আমার একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। বিরাট একটা জায়গা কিনে সেখানে একটা পোড়োবাড়ি তৈরি করাব।'

বড়োমামা বললেন, 'পোড়োবাড়ি আবার তৈরি করা যায় নাকি? বাড়ি অনেক-অনেকদিন পড়ে থাকতে থাকতে পোড়োবাড়ি হয়। এটা সময়ের ব্যাপার।'

মেজমামা বললেন, 'একালের আর্কিটেক্টরা সব পারেন। পুরোনো ইট, কড়ি-বরগা, ভাঙা ফ্রেম, দরজা, জানলা কিনতে হবে। মাকড়সার জাল জোগাড় করতে হবে। ভাঙা ফার্নিচার। পুরোনো বিছানা, চাদর। পয়সা ফেললে সবই হয়। একটা গ্র্যান্ড পোড়ো বাড়ি। চিলেকোঠায় বাদুড়। কিছুদিন ফেলে রাখলেই ভূতেরা এসে গৃহপ্রবেশ করবে। বউ-বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সংসার সাজিয়ে বসবে। তুমি আমার এই প্রোজেক্টে যোগ দিতে পারো। ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি। একটা সাকসেসফুল হলে, পরপর আমরা এইরকম ভূতের বাড়ি প্রমোট করে যাব।'

বড়োমামা বললে, 'পার্টনারশিপে আমি কোনও কাজ করব না। পরে লাভের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে ভীষণ গোলমাল হবে। বাঙালির পার্টনারশিপ টেকে না।'

'তুমি এর মধ্যে লাভ দেখলে কোথায়? ভূতেরা ভাড়া দেবে নাকি! এটা আমাদের একটা খেয়াল, একটা বিলাসিতা। যেমন সেকালের বড়োলোকেরা চিড়িয়াখানা করত, মেটিয়াবুরুজের নবাব, রাজেন মল্লিক,—আমরাও সেইরকম ভূতখানা করব।'

সূচীপত্রে যান

মাসিমা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এইবার বললেন, 'তোমরা দুটোতে যে বাড়িতে থাকো সেই বাড়িটাই তো ভূতখানা।'

বড়োমামা, মেজমামা দুজনেই লাজুক-লাজুক হেসে বললেন, 'কি যে বলিস?'

মাসিমা যেন খুব একটা গৌরবের কথা বলে ফেলেছেন। 'চাসর' ভেঙে গেল। আবার জমবে কাল সকালে। মেজমামা বিখ্যাত অধ্যাপক। অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ তৈরি করেন। 'চাসর' শব্দটা তাঁরই তৈরি।

বেলা একটার সময় ঝাঁ-ঝাঁ রোদে ঘামতে ঘামতে ভদ্রলোক এলেন। একেবারে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। কুচকুচে কালো রং। ধবধবে সাদা পোশাক। বড়োমামা তখন চেম্বারে রুগি দেখছেন। ভদ্রলোক বসতে-বসতে বললেন, 'আই সি। ইউ আর এ ডক্টর। রোরিং প্র্যাকটিস।'

শেষ রুগিকে শেষ করে বড়োমামা ভদ্রলোককে বললেন, 'বলুন'।

'মাই নেম ইজ গোপাল গাঙ্গুলি। দেয়ার ইজ এ হাউস।'

'ভূত আছে?'

'অফ কোর্স। আছে বলেই না এসেছি।'

'কী রকম ভূত?'

'বেস্ট কোয়ালিটির ভূত। লাজুক নয়। বেশ ডাকাবুকো। হতাশ হওয়ার কারণ নেই।'

'ভূতদের পরিচয়! বায়োডাটা?'

'আমার ঠাকুরদা বেশ খেলিয়ে বাড়িটা করেছিলেন। গৃহপ্রবেশের দিন তেরপল চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তিনজন পিওর সাহেব। আমার ঠাকুরদার বন্ধু। সেই থেকেই এঁরা পারমানেন্ট। আমরা অনেক চেষ্টা করেও বাড়িটায় থাকতে পারিনি। বিক্রি করার চেষ্টা করেও ক্রেতা পাইনি। পুলিশের ক্যাম্প হয়েছিল। তিন দিন। সব পালাল। একমাস তাদের প্রত্যেকের চুল খাড়া হয়ে ছিল।'

'আমি কিন্তু যাচাই করে নেব!'

'অফ কোর্স! আজ অমাবস্যা। ইচ্ছে করলে আজই আপনি যেতে পারেন। মাত্র একঘণ্টার ড্রাইভ।'

'তাহলে চলুন খাওয়াটা শেষ করে বেরিয়ে পড়া যাক।'

সূচীপত্রে যান

শেষবেলায় আমরা আমাদের জায়গায় পৌঁছে গেলুম। বিরাট একটা বাগান। তার মাঝখানে বিউটিফুল একটা বাড়ি। কিছুটা দূরে রূপনারায়ণ। জায়গাটার নামও ভারী সুন্দর—গড়চুমুক।

বড়োমামা মন খারাপ করে বললেন, 'গোপালবাবু, দিস ইজ নট এ পোড়োবাড়ি।'

'বাট এ জেনুইন ভূতের বাড়ি। একটা রাত থাকলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। জলবৎ তরলং।'

'ভূত বিজ্ঞান পড়ে যতটুকু জেনেছি—দে ভেরি মাচ প্রেফার পোড়োবাড়ি।'

গোপালবাবু বললেন, 'মশাই আপনি তো যাচাই করে নেবেন! সন্তুষ্ট হলে কিনবেন, না হলে না কিনবেন। আমি তাহলে চলি। গুডলাক।'

বড়োমামা বললেন, 'জাস্ট ওয়ান প্রশ্ন—বাড়িটা এত ভালো হয়ে রইল কীভাবে?'

'মেনটেনেন্স আছে।'

'কে করে?'

'যারা আছে তারাই করে।'

গোপালবাবু চলে যাচ্ছিলেন। বড়োমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় আপনার দর্শন পাব?'

'ভয় নেই, আমিই দর্শন দেব।'

ঝপঝপ করে রাত চলে গেল। অমাবস্যার কুচকুচে কালো রাত। আমাদের সঙ্গে পাঁচ সেলের একটা টর্চ, মোটাসোটা কয়েকটা মোমবাতি, দেশলাই। নাইলনের দড়ি। মাসিমা রাতের খাবার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। জলের বোতল। এক ফ্লাস্ক চা। সঙ্গে মোটা একটা শতরঞ্চি, দুটো বালিশ।

গোপালবাবু গুড ম্যান। নীচের একটা ঘরে খাট-বিছানা সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। কোথা থেকে বেঁটে-মতো একজন লোক এসে হাজির হলেন; যেন মাটি ফুঁড়ে উঠলেন।

বড়োমামা জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কি ভূত?'

'না, আমি মানুষ। ডেকরেটারের লোক। এই খাট-বিছানা, জলের বোতল রাখার টেবিল আমার সাপ্লাই। এই খাটটা স্পেশাল খাট। তিন-চারজন এই খাটে আত্মহত্যা করেছে। খুব লাকি খাট। শুলেই বুক ধড়ফড় করে। কখনও মনে হবে ভূমিকম্প হচ্ছে। আচ্ছা আমি তাহলে আসছি। বেঁচে থাকলে কাল সকালে।'

'কে বেঁচে থাকলে?'

'আপনারা।'

লোকটি চলে গেলেন; যেন ভয়ে পালালেন।

বড়োমামা মুখে একটা শব্দ করে বললেন, 'ব্যাটা বক্কেশ্বর, আমাকে ভূতের ভয় দেখাতে এসেছে।'

আমি বললুম, 'এই সুইসাইড খাটটায় না শোয়াই ভালো।'

'ভয় পেয়েছিস মনে হচ্ছে। সব গল্পকথা। ভূতুড়ে বলে বাড়ি বিক্রি হচ্ছিল না। এইবার মওকা এসেছে—ভূতুড়ে বলেই বাড়ি বিক্রি হবে। অতএব এখন ভূত ম্যানুফ্যাকচার করবে। ভূত অত সোজা রে। সব গল্প। বিকট-বিকট কল্পনা।'

'বাড়িটা একবার ঘুরে দেখলে হয় না?'

'না, শব্দে যেমন পাখি উড়ে যায়, আমাদের চলাফেরার শব্দে সেইরকম ভূত পালিয়ে যাবে।

ভূতের ভিজিটের জন্যে একটা পরিবেশ চাই।'

ঘরটা বেশ বড়ো। এ-পাশে, ও-পাশে, দোতলায় আরও অনেক ঘর। গোটাকতক বাতি জ্বেলে আমরা বসে আছি। চারপাশে জবরদস্ত অন্ধকার। হাতের কাছে টর্চ। একটা আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে ভালো হত। গুলি করে ভূত মারা যায় না। মানুষ একবারই মরে। দুবার মরা অসম্ভব। বদমাইশ কেউ এলে মোকাবিলা করা যেত।

বাইরে নানারকম শব্দ হচ্ছে। সে হতেই পারে। দোতলায় কী হচ্ছে কে জানে। একটা চওড়া সিঁড়ি তিন প্যাঁচ মেরে ছাদের দিকে উঠে গেছে। সিঁড়িটাই ভয়ের। কেবল মনে হচ্ছে, কেউ নেমে আসবে। আমরা ঠিক করেছি কেউ ঘুমাব না। লুডো খেলে রাত কাটাব।

রাত এগারোটা। বাইরে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে একটা বড়ো সাইজের প্যাঁচা ডাকল। প্যাঁচার ডাকের সঙ্গে ভূতের একটা যোগ আছে। কুকুরেরও আছে। প্যাঁচার ডাকে বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। বড়োমামার ছয় পড়েছে। আমার একটা ঘুঁটি কেটে যাওয়ার কথা। বাতিটা হঠাৎ খুব কাঁপছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। বড়োমামা বড়ো-বড়ো হাই তুলছেন। আর জানি না।

* * *

সূচীপত্রে যান

একসময় মনে হল, পায়ে দড়ি বেঁধে আমাদের টানতে টানতে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পিঠের তলায় মাটি আর ঘাসের স্পর্শ। আচ্ছন্ন অবস্থায় বেশ ভালো লাগছে। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। একসময় থামলুম। আবছা-আবছা দেখতে পাচ্ছি। ধবধবে সাদা তিনজন সাহেব আর একজন লম্বা চওড়া বাঙালি। একজন সায়েব একটা গানের মতো কী গাইছে—

ডিগ, ডিগ, ডিগ,
মেরিলি ইউ ডিগ
ডিগ, ডিগ, ডিগ

মাটি কাটার শব্দ কানে আসছে। কানে আসছে বাংলা গান,

খোঁড়ো খোঁড়ো খোঁড়ো
কবর দাও, খবর দাও
খোঁড়ো খোঁড়ো খোঁড়ো
বড়োটাকে ফেলো তার ওপর ছোটোটা
স্লিপ স্লিপ স্লিপ
ফর এভার ফর এভার
ডিগ ডিগ ডিগ।

বিশ্রী লাগছে, কিন্তু কিচ্ছু করতে পারছি না। শুয়ে-শুয়ে নেমে যাচ্ছি নীচের দিকে। বাঙালি ভদ্রলোকের প্রার্থনা কানে আসছে,

ভূত হও, ভূত হও,
আছি চারজন,
হব ছয় জন,
ভূ-ভূ ভূত হও।

এইবার কান্না আসছে। 'মাসিমা, মাসিমা, বাঁচান-বাঁচান।' আমার তলায় বড়োমামা। জোড়া কবর। ভয় হল, যমজ ভূত হব না তো? না, তা হবে না। দুটো দু সাইজের ভূত হবে। দুবরাজপুরে মামা-ভাগনে পাহাড়ের মতো, মামা-ভাগনে ভূত। ইতিহাসে যা কখনও হয়নি।

তিনটি সাহেব আর একটা বাঙালি সমস্বরে বলছে,

বেরি, বেরি, বেরি
ডিপ ইন দ্য স্লারি।

হঠাৎ একটা বিকট শব্দ। বিশাল চেহারার একটা কালো কুকুর আমাদের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পড়ল ওদের ঘাড়ে। সিংহের মতো গর্জন। লাল ভাঁটার মতো চোখ। বিশাল চেহারা। সাহেবদের মধ্যে একজন বললেন— দিস ইজ স্মিথ'স ডগ। মোস্ট ফেরোসাস।

আমাকে ঠেলে সরিয়ে বড়োমামা উঠে বসে বললেন, 'নো, দিস ইজ মাই ডগ।' চারখানা ভূত ধোঁয়ার মতো আকাশে উড়ে গেল।

বড়োমামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলি, কুকুর মরে গেলেও কুকুর। প্রভুকে বাঁচাবার জন্যে তেড়ে এসেছে। তুই লাকিকে চিনতে পারলি না?'

বড়োমামার জার্মান শেফার্ড ডগ লাকি, তার চোদ্দো বছরের জীবন শেষ করে চলে গেছে। বাড়িতে তার সমাধি আছে। রোজ ফুল দেওয়া হয়। ভোর হয়ে গেছে, যাকে বলে প্রসন্ন সকাল। গোপালবাবু আসছেন। 'এ কী আপনারা ঘাসের ওপর ঠান্ডায় শুয়ে আছেন কেন?'

বড়োমামা বললেন, 'ঘাসের ওপর নয় তো, আমরা আমাদের কবরে শুয়ে আছি। রাত্তির বেলা কখন জানি না তিনটে সায়েব ভূত আর একটা বাঙালি ভূত ঠ্যাং ধরে টানতে-টানতে এনে, এখানে কবর দিয়ে খানিক নাচানাচি করে চলে গেল, বললে, 'ছিল চারটে হল ছ'টা।'

'কবর থেকে বেরোলেন কী করে?'

'তা তো জানি না।'

'সে কী মশাই।' গোপালবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে গেটের দিকে ছুটলেন—চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা।

মাসিমা সব শুনে একটা কথাই বললেন, 'ভূতেরা ভূতেদের কিছু করতে পারে না। নিজেদের চিনলে তো!'

সূচীপত্রে যান

সিঁড়ি

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আমাদের পুরনো বাড়ির উত্তর দিকের জানলাটা আমার একেবারেই ভাল লাগে না। মানুষ জানলা করে আলো-বাতাস আসার জন্যে। অন্ধকারের দিকে কেউ জানলা ফোটায়। ওদিকে একটা রহস্যজনক সিঁড়ি আছে। ঘুরতে ঘুরতে নেমে গেছে নীচের দিকে। দিনের বেলায় আবছা আলো। রাত্তির বেলায় থকথকে অন্ধকার। সিঁড়িটা কেন আছে, কী কারণে আছে কেউ বলতে পারে না। নামতে নামতে কোথায় যাবে তাও জানে না কেউ। আছে, আছে। কেউ গ্রাহ্য করে না। বাড়িটা আমাদের খুবই বড়। এত বড় যে, অনেক ঘর ব্যবহারই হয় না। বন্ধই থাকে। কেউ খোলেও না। নীচের তলাটা একেবারে বেওয়ারিশ পড়ে আছে।

'বাড়িটা এত বড় কেন মা?'

'তোমার ঠাকুরদাদা কিনেছিলেন। এই বাড়িটা ছিল ডাচদের।'

'মানে ওলন্দাজদের।'

'ঠিক বলেছিস। ওই বাড়িটা ছিল তাদের কর্মচারীদের কোয়ার্টার। এই অঞ্চলটা ছিল তাদের অধিকারে। ভারতে তারা ব্যবসা করতে এসেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে পেরে উঠল না। দক্ষিণ ভারতে কিছুকাল রইল। তারপর দেশে ফিরে গেল।'

'সিঁড়িটা কেন?'

'সিঁড়ি সিঁড়ি করে পাগল হয়ে গেলি।'

'তোমরা দেখবে না কেন?'

'আমাদের ঘেন্না করে। কত দিনের আবর্জনা। ছুঁচো-ইঁদুর। একেবারে তলায় কি আছে কে জানে। নেমে মরব না কি?'

সূচীপত্রে যান

কারও কোনো কৌতূহল নেই। আমার স্কুলের বন্ধু সুখেনকে বললুম, 'একদিন নামবি?'

'সামনেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। এখন ওসব করে কাজ নেই। পরীক্ষার পর দেখা যাবে।'

উত্তরের ওই জানলাটা আমার পায়ের দিকে। কাচের পাল্লা দুটো বন্ধই থাকে। মা কিছুতেই খুলতে দেয় না। আমি আর মা একসঙ্গে শুই। মা শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। আমার আর ঘুম আসে না। জানলাটার দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকি। চোখের ভুল কি না জানি না। মাঝে মাঝে কাঁচা দুটো দুধের মতো সাদা হয়ে যায়, একদম সাদা। সুন্দর একটা মেয়ের মুখ ফুটে ওঠে। বড় বড় চোখ কাচের মতো। এক মাথা সোনালি চুল। লাল দুটো ঠোঁট। মুখটা অনেকক্ষণ থাকে, তারপর অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে যায়।

কাউকে বলি না, কারণ বিশ্বাস করবে না। মেয়েটা আমাকে কিছু যেন বলতে চায়। কোনো কোনো দিন জানলার কাচ দুটো একেবারে কালো কুচকুচে হয়ে যায়। সাদা হয়ে ফুটে ওঠে একটা ফাঁস লাগানো ফাঁসির দড়ি। ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরি। মা-ও আমাকে জড়িয়ে ধরে। দুজনে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকি। মা আমার পাশে থাকলে পুতনা রাক্ষুসীকেও ভয় পাই না। পাশেই ব্রিজ। বিখ্যাত কালীমন্দির। বিরাট উদ্যান। দ্বাদশ শিবমন্দির। বড়, ছোট দুটো সুন্দর স্নানঘাট। সকাল থেকে ভক্তদের ভিড়। মহাসমারোহে বাদ্য-বাজনা করে আরতি। গভীর রাতে সব ফাঁকা। বড় বড় ঝুপসি ঝুপসি গাছ। একটা-দুটো জোরালো হ্যালোজেন বাতি। বড় বড় গাছের লম্বা লম্বা ছায়া। ঝিম মেরে থাকা চৌকিদারের ঘর। বিরাট গেটের বাইরে দুঃখী এক মা তার শিশুটিকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে একটা চটের ওপর দুমড়ে মুচড়ে শুয়ে থাকে। আমার বন্ধু সুখেন কেবল কাঁদে। কারো দুঃখ-কষ্ট দেখলেই তার দু'চোখে টসটসে জল। ওই মাকে দুখানা মোটা চট দিয়ে এসেছে। গায়ে দেবার চাদর। একটা বড় ছাতা। শিশুটির জন্যে রোজ দুধ দিয়ে আসে। ফিডিং বটল কিনে দিয়েছে। যা করে সব লুকিয়ে করে। কেউ যেন জানতে না পারে। শুধু আমি জানি। আমার আর সুখেনের অনেক পরিকল্পনা।

ঠিক রাত একটার সময় লম্বা একটা মালগাড়ি। ব্রিজের ওপর দিয়ে গুমগুম শব্দে যেতেই

থাকে, যেতেই থাকে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে, আমার বুকের ওপর পড়ে থাকা মায়ের সুন্দর গোল হাতটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ি। কোনো কোনো দিন শেষ রাতে হঠাৎ হয়তো ঘুম ভেঙে গেল। মায়ের মুখের ওপর ফটফটে চাঁদের আলো দুধের মতো গড়াচ্ছে। কপালে লাল টিপ। তাকিয়ে থাকি। মা দুর্গাকে যেন কেউ শুইয়ে দিয়েছে। পাতলা পাতলা দুটো ঠোঁট থির থির করে কাঁপে কখনো। একটু হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। আমার মা স্বপ্ন দেখছে।

'মা, তুমিও স্বপ্ন দেখো?'

'দেখি না আবার! জেগেও দেখি, ঘুমিয়েও দেখি। স্বপ্নে আমি তোকেই দেখি।'

দুই

গোলোকবাবুর বিরাট বয়েস।

কেউ বলেন নব্বই। কেউ বলেন একশো।

বিশাল জমিদার ছিলেন। এখন একটু পড়তি। বিখ্যাত পণ্ডিত। বিশাল লাইব্রেরি। সুন্দর একটা লন। লনের সঙ্গে যেন লেগে আছে লাইব্রেরির রক। মার্বেল বাঁধানো। এদিক থেকে ওদিকে দৌড়ে চলে গেছে বারান্দাটা। বাঁক ঘুরে পৌঁছে গেছে লাইব্রেরির পেছন দিকের কুঞ্জবনে। কামিনী, কাঞ্চন, বকুল, মাধবীলতা। বারান্দার ওপর দিকটা রঙ-বেরঙের কাচ দিয়ে ঘেরা। সার সার বেতের গোল চেয়ার।

ফটফটে ফর্সা রঙ। খাড়া নাক। কৃষ্ণের মতো টানা টানা চোখ। একমাথা পাকা পাকা চুল। সাদা ধবধবে ফতুয়া। ধুতি। পায়ে শুঁড়তোলা চটি। আমরা বলি, ভগবান দাদু। ভীষণ ভালবাসেন আমাকে আর সুখেনকে। কালীবাড়ির ওই মাকে সুখেন যা কিছু দেয়, সব চেয়ে নিয়ে যায় ভগবান দাদুর কাছ থেকে।

'তোমার ঠাকুরদা ছিলেন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। তোমাদের বাড়িটা ঐতিহাসিক বাড়ি।

হরিশঙ্করকে বলেছিলুম, বাড়িটা কিনছিস? সবাই বলে ভূতের বাড়ি। হরিশঙ্কর বললে, মানুষের চেয়ে ভূত ভাল। একটু ট্রেনিং দিয়ে নিতে পারলেই উপকারী বন্ধু। স্কুলে এত ভূত সামলাই, বাড়ির কটা ভূতকে সামলাতে পারব না! নামকরা শিক্ষক ছিল তো।'

'দাদু! ওই সিঁড়িটা?'

'পেছন দিকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা দোতলার বারান্দা থেকে নিচের দিকে তাকালে কী দেখতে পাও?'

'সিঁড়িটা বেরিয়ে আসেনি। সলিড দেয়াল।'

'সে কেউ দেয়াল দিয়ে সিঁড়িটা বন্ধ করে দিয়েছে। অনেক কালের ব্যাপার তো। সিঁড়ি নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। এমনও হতে পারে তলায় একটা আন্ডারগ্রাউন্ড আছে।'

'ভগবান দাদু। খুব যে জানতে ইচ্ছে করছে। জানলার কাচে সুন্দর একটা মেয়ের মুখ ভেসে ওঠে। মাঝে মাঝে একটা ফাঁস। ফাঁস লাগানো ফাঁসির দড়ি।'

'ও-সব মনের ভুল। নানা রকম গল্প, উপন্যাস, রহস্য-রোমাঞ্চ পড়ার ফল।'

তিন

সামনেই পরীক্ষা। পড়ার চাপে সিঁড়ির চিন্তা ভুলে গেলুম। সেদিন সন্ধেবেলা অনেকক্ষণ আলো ছিল না। রাত আটটায় আলো এল। পড়তে পড়তে বেজে গেল রাত বারোটা। মা বললে, 'এইবার শুয়ে পড়। খুব ভোরে ডেকে দোব।'

মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে আছি।

'ভীষণ ভয় করছে মা।'

'কীসের ভয়?'

'সামনে পরীক্ষা।'

'তুই না আমার ছেলে। আমার ছেলে হয়ে পরীক্ষার ভয়। সারা বছর যে মন দিয়ে পড়েছে, পরীক্ষা তাকে কী ভয় দেখাবে।'

'মা! তোমার মতো মা হয় না। জন্ম, জন্ম, জন্ম ধরে তুমি আমার মা হবে তো।'

'তুই আমার ছেলে হবি তো?'

'মা, পরীক্ষার পর আমরা সবাই পুরী যাব।'

'ঠিক বলেছিস। অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি।'

'মা, এত রাতে কোথায় পুজো হচ্ছে গো। ওই শোনো, শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজছে।'

'জানিস না, আজ অমাবস্যা। গঙ্গার ধারে রক্ষাকালীর পুজো হচ্ছে।'

'আরতি হচ্ছে।'

কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সেই মেয়েটি ঘরে চলে এসেছে। আমাকে ডাকছে, 'ওঠো। শিগগির ওঠো'।

'তুমি কে?'

'আমার নাম রেবেকা।'

'কেন এসেছ?'

'সিঁড়ির তলায় কী আছে দেখবে না? ওঠো ওঠো।'

কী ভীষণ অন্ধকার। পা ঘষে ঘষে নামছি। রেবেকা আমার হাত ধরে আছে। সাপের মতো ঠান্ডা। ক্রমশ আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। অদ্ভুত একটা টানে নামছি, নামছি। বলছি, 'রেবেকা। ভীষণ অন্ধকার। আমি ফিরে যাই।'

'এখান থেকে ফেরা যায় না। নামো নামো, আরো নামো।'

হঠাৎ মনে হলো, আর সিঁড়ি নেই। পা কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। রেবেকা হাত ছেড়ে দিয়েছে। আমি একপায়ে টাল খাচ্ছি। সামনে একটা গভীর কূপ। আলকাতরার মতো থকথকে অন্ধকার। চিৎকার করে ডাকলুম, 'রেবেকা।'

পাতাল থেকে উত্তর এল, 'চলে এসো।'

ভীষণ একটা হেঁচকা টানে পড়ে যেতে যেতে কী একটা ধরে ফেললুম। মোটা দড়ি। দড়িটা ছিঁড়ে গেল। পড়ে যাচ্ছি। চিৎকার করে উঠলুম, 'মা!'

একটা ঝাঁকুনি। মা দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে, 'কী রে! ভয় পেয়েছিস!'

সকালবেলা সব শুনে বাবা বললেন, 'এই রবিবার আমরা নামব। তোমার ভগবান দাদুও থাকবেন। তারপর মিস্তিরি ডেকে সিল করে দোবো।'

সূচীপত্রে যান

গাছ

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

ছেলেবেলায় আমি তো একটু দুষ্টু ছিলাম। সবাই বলত, ভীষণ দুষ্টু। একদণ্ড স্থির হয়ে বসতে জানে না। আমার মা বলতেন "ওইটাকে নিয়েই হয়েছে আমার ভীষণ জ্বালা। সারাদিন আমার এতটুকু শান্তি নেই।"

আমি লক্ষ্মী হওয়ার চেষ্টা যে করতুম না তা নয়। বইপত্র নিয়ে বসতুম। দু-এক পাতা হাতের লেখা করতে-না করতেই মাথাটা কেমন হয়ে যেত। নীল আকাশে নিলুর ঘুড়ি লাট খাচ্ছে, পাশের মাঠে প্রতাপ আর গোপাল ডাংগুলি খেলছে। মাথার আর কী দোষ।

আমরা তখন খুব একটা পুরনো বাড়িতে থাকতুম। বাড়িটার দুটো মহল ছিল। বারমহল আর অন্দরমহল। অনেক ঘর। চওড়া, টানা-টানা বারান্দা। তিনতলার ছাতটা ছিল বিশাল বড়ো। ইচ্ছে করলে ফুটবল খেলা যেত। সেখানে পাশাপাশি দুটো ঘর ছিল। কেউ একটু নির্জনে থাকতে চাইলে থাকতে পারত। একটা ঘরে থাকত আমার দিদির যত খেলনা। বড় পুতুল, ছোট পুতুল। দিদির বন্ধুরা বিকেলবেলা এসে খেলা করত। আমি মাঝে মাঝে এসে দুষ্টুমি করতুম। দিদি তখন তার বন্ধুদের বলত, "দ্যাখ ভাই কী বানর ছেলে!" দিদি আমাকে বানর বললে, আমার খুব ভাল লাগত। আমি দুষ্টুমি করলে দিদিরও খুব ভাল লাগত মনে হয়। মাঝে-মাঝে প্রবল লড়াই হত। তখন দিদি বলত, "দেখবি, যখন কোথাও চলে যাব তখন বুঝবি ঠেলা। কে তোকে গরমের ছুটিতে আচার তৈরি করে খাওয়ায় দেখব।"

রোজ রাত্তিরে বাড়িতে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবেই হবে। বাবা আপিস থেকে এসে আমাকে পড়াতে বসবেন। সারাদিনের লাফালাফিতে ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসবে। জানা জিনিসও ভুল করব। বাবা পরপর যোগ করতে দেবেন, একটাও ঠিক হবে না। 'উইক' বানানটা ভুল হবেই হবে। দুর্বলটা সপ্তাহ হবে, সপ্তাহটা দুর্বল। বাবা মাকে ডেকে বলবেন, "সারাটা দুপুর তুমি করো কী? ছেলেটাকে একটু দেখতে পারো না!"

সূচীপত্রে যান

মা তখন ফিরিস্তি দেবেন, ছেলে এই করেছে, ওই করেছে। বাবা গম্ভীর মুখে উঠে গিয়ে লম্বা বারান্দায় পায়চারি করবেন আর আক্ষেপ করবেন, "নাঃ, হল না, কিছুই হল না। ফেলিওর, ফেলিওর।" রাতে খেতে বসে বলবেন,—"কালিয়া, পোলাও খেয়ে কী হবে, ছেলেটাই যার মানুষ হল না!"

এত কাণ্ডতেও আমার কিছু হবে না। ঘুমিয়ে পড়ব। একসময় দিদি আস্তে-আস্তে ডাকবে, "চল্, খাবি চল্। কাল থেকে একটু ভাল করে পড়বি। তোকে বকলে আমার খারাপ লাগে।" কোনও-কোনওদিন দিদি আমাকে খাইয়ে দেয়।

এইভাবেই চলতে-চলতে গরমের ছুটি পড়ে গেল। একদিন দুপুরবেলা সবাই ঘুমোচ্ছে। আমি মায়ের পাশে শুয়ে ছিলুম। দিদি কয়েকদিনের জন্য মামার বাড়ি গেছে। শুয়ে থাকতে-থাকতে উঠে পড়লুম। ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মা যে ঘরে, তার পাশের ঘরে একটা টেনিস বল নিয়ে কেরামতি করছি। এখন থেকে প্র্যাকটিস না করলে, বড় হয়ে পেলের মতো খেলোয়াড় হব কী করে? বাবাই তো বলেছেন, "সাধনাতেই সিদ্ধি।"

প্রথমে সাবধানেই সব কিছু করছিলুম, হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে মারলুম এক শট। বাবার বইয়ের আলমারির সব কাচ ভেঙে চুরমার। পাশের ঘর থেকে মা দৌড়ে এলেন। ধড়াধ্বাম মারাটাই আমাকে উচিত ছিল কিন্তু বাবা বলেছেন, "একদম গায়ে হাত তুলবে না। ভয় ভেঙে যাবে। অন্য শাস্তি দেবে।"

মা আমাকে টানতে-টানতে ছাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে দিলেন, "থাকো এইখানে বাবা এলে তোমার বিচার হবে। বড্ড বেড়েছ তুমি। নির্জলা উপবাস।"

চারপাশে খাঁ-খাঁ করছে রোদ। দুপুরের নীল আকাশে গোটাকতক চিল উড়ছে। জানলার ধারে বসে আছি, মনখারাপ করছে। বাবাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। আলমারির সব কাচ চুর হয়ে গেল। খুব অন্যায় হল। কবে যে আমি মানুষ হব। এইসব ভাবছি। ভীষণ গরম। একটুও হাওয়া নেই। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। শেষকালে মনে হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলুম। গায়ে কেউ হাত রাখল। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন বাবা।

সূচীপত্রে যান

আকাশে তখনও শেষবেলার রোদ। ভয়ে কুঁকড়ে গেলুম। বাবার মুখের দিকে তাকালুম। দরজাটা হাটখোলা। তখন আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "বাবা! আজ আপনি এত তাড়াতাড়ি এলেন?"

কোনো উত্তর নেই। বাবা হাসছেন। কেবল হাসছেন।

আমি বললুম, "বাবা, আমি সব কাচ ভেঙে ফেলেছি। আমি খুব অন্যায় করেছি বাবা।"

বাবা তবু হাসছেন। মুখে এতটুকু রাগ নেই। আমি তখন প্রণাম করার জন্য বাবার পা স্পর্শ করতে গেলুম, দেখি কেউ কোথাও নেই। ঘর ফাঁকা। দরজাটা হাটখোলা। খুব জোর হাওয়া ছেড়েছে গ্রীষ্মের বিকেলের।

আমি ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেলুম। স্বপ্ন দেখেছি। নিশ্চয় স্বপ্ন। সাহস একটু ফিরে পেতেই এক ছুটে নিচে। দেখি মা রান্নাঘরে ঘুগনি তৈরি করছেন। আমাকে দেখে অবাক, "কী করে এলি, কে তোকে দরজা খুলে দিল?"

বাবা ঘুগনি খেতে ভালবাসেন, মা সেইজন্যই করছেন। কাচ ভাঙা নিয়ে ভীষণ কাণ্ডটা হয়ে যাওয়ার পরেই ঘুগনি এসে অবস্থাটাকে সামাল দেবে।

মাকে আমি সব কথা বললুম।

"তোর বাবা এসেছে? কোথায়?"

"দরজা তো বাবাই খুলে দিলেন!"

"সদরের দরজা আমি খুলে না দিলে আসবে কী করে?"

গোটা বাড়িটা সার্চ করা হল। বাবার পড়ার ঘর, শোওয়ার ঘর, ঠাকুরঘর, বাথরুম। আলনাটা দেখা হল। সেখানে বাবার অফিসের জামাকাপড় ছাড়া নেই। বাড়িতে ফিরে যা পরবেন সেইগুলোই গুছনো রয়েছে।

আমরা তখন পাশের বাড়িতে গিয়ে বাবার অফিসে ফোন করলুম। অফিসের বড়কর্তার সঙ্গে মা কথা বললেন। জানা গেল, বাবা অনেক আগেই সাইটে গেছেন। সাইট মানে উলুবেড়িয়ায়। সেখানে কোম্পানির নতুন ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে।

মা খুব অনুরোধ করলেন, "আপনি নিজে একটু খবর নিন। মনে হচ্ছে, একটা কিছু

হয়েছে।" ফোন নম্বরটা তাঁকে দেওয়া হল। টেলিফোনটাকে নিয়ে আমরা বসে আছি। বসেই আছি। ওদিকে মায়ের ঘুগনি ছাই। এক ঘণ্টা পরে ফোন বাজল।

কনস্ট্রাকশন সাইটে একটা লোহার রিম ক্রেন ছিঁড়ে বাবার মাথায় পড়ে গেছে। তখন বেলা ঠিক সাড়ে চারটে। আমি এমন বোকা ছিলুম, সেই খবরটা পেয়েই আমি না কি মাকে বলেছিলুম, "জানো, আমি কাচ ভেঙেছি বলে বাবা একটুও রাগ করেননি, শুধু হাসছিলেন।"

তখন আমার বয়স ছিল আট। আজ আশি। আমি আর কোনওদিন কিছু ভাঙিনি। না কাচ, না সম্পর্ক, না পরিবার, না জীবন। বাবার সেই হাসি হাসি মুখের হাসি যাতে কখনও না মিলিয়ে যায়, সেই চেষ্টা আমি করেছি।

সূচীপত্রে যান

সেই অদ্ভুত মানুষটি

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

বড়দা বললেন, 'তুই জানলার ধারে বসিসনি। আমাকে বসতে দে। পাহাড়ি পথে গাড়ি যখন ঘুরে ঘুরে উঠবে, চক্কর লেগে যাবে।'

বেশ জমিয়ে বসেছিলুম জানালার ধারে। সরে আসতে হল। বড়দার হুকুম। নড়চড় হওয়ার উপায় নেই। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি থেকে যাব কালিম্পং। কালিম্পং-এ যাচ্ছি ঠিক বেড়াতে নয়। দাদার কিছু কাজও আছে। দাদা বলবে কাজ বাবা বলবেন অকাজ। দাদার মাথায় অর্কিড ঢুকেছে। গ্যাংটকে কার যেন অর্কিডের চাষ আছে। সেখান থেকে অর্কিড কিনে কলকাতার কাচের ঘরে কী যেন বলে, কনট্রোলড আবহাওয়ায় লালন পালন করা হবে। যেমন খরচ তেমনি পরিশ্রমের ব্যাপার।

আমার গাছপাগল দাদা। প্রথমে মাথায় ঢুকেছিল চন্দ্রমল্লিকা। সে এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। ছোট টব। বড় টব। মেজো টব। ন টব। টবের ছড়াছড়ি। গাছ এ টব থেকে ও টবে যায়। ও টব থেকে সে টবে। কত রকমের খাদ্য। কালো গুঁড়ো গুঁড়ো। সাদা মিহি মিহি। দানা চিনি চিনি। কত রকম ফুলের নাম, টাইগারস নেল, স্নোবল। পাতা থেকে কালো কালো পোকা ঝাড়ার হরেকরকম বুরুশ। যত রকমের পুরস্কার আছে ফুলের জন্যে দাদা সব পেয়ে বসে আছে। চন্দ্রমল্লিকার পরি এল গোলাপ। ব্ল্যাক প্রিনস, প্রিমরোই, অ্যালবার্ট, ফিলিপস। গোলাপ আবার চন্দ্রমল্লিকার বাবা।

মা বলেছিলেন, 'বাবা, দু'-একটা পুজোর ফুলের গাছ লাগা না, টগর, করবী, অপরাজিতা, জবা।' দাদা ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'রাবিশ। ও সব ফুলের কোনও আভিজাত্য নেই মা। আমার হল মারি তো গন্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।'

দাদা এখন সেই গন্ডার মারতে কি ভাণ্ডার লুটতে চলেছেন। নেপালি ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। দাদা জানালার ধারে বহাল তবিয়তে বসে। কোলের উপর সোয়েটার, মাঙ্কি

সূচীপত্রে যান

ক্যাপ। গাড়ি নাকি ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ি পথে যত উপর দিকে উঠতে থাকবে ততই শীত করবে এবং তখন একে একে সব পরে নিতে হবে। গরম থেকে ঠান্ডা, সে এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আসনে পাগড়ি মাথায় পাশাপাশি দু'জন বসে আছেন! আমি এত ছোট, প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছি। সামনে যেন পাঁচিল। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। দ্যুৎ, কত কী দেখতে দেখতে যাব ভেবেছিলুম। দাদা সব মাটি করে দিলে।

আমার বাঁ পাশে দাদা, ডান পাশে আর এক ভদ্রলোক। জিনের প্যান্ট। জিনের চোরপকেট, চার কলার পুরো হাতা জামা। চোখে বাদামি কাচের চশমা। কপাল ঢাকা সান ক্যাপ। কেমন একটা ভয় ধরিয়ে দেওয়ার মতো চেহারা। ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা চুইংগাম বের করে মুখে ফেলে চিবোতে শুরু করলেন। আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। বিশাল চেহারা। কোলের উপর টেলিফটোলেনস লাগানো দামি ক্যামেরা। চিবুকে ঠোঁটে কেমন একটা বেপরোয়া ভাব। মাঝে মাঝে আবার হাঁটু নাচাচ্ছেন।

হঠাৎ একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। চশমার ভিতরে চোখ। তবু মনে হল চোখ দুটো নেচে গেল। মুখ ঘুরিয়ে নিলুম। চোখ নাচাবার কী আছে। মুখের যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল ভদ্রলোক বাঙালি। দাদার মুখের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলুম, ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথাটা বুকে ঝুলে পড়েছে। বা দাদা বা।

ভদ্রলোকের দিকে আর একবার তাকাতেই মনে হল ঠোঁটের কোণে কেমন একটা কৌতুকের মুচকি হাসি। আচ্ছা বিপদ তো? সামনে সর্দারজিদের পাঁচিল। পাশে জানালা আটকে ঘুমন্ত দাদা। এ পাশে কেমন সন্দেহজনক একজন মানুষ। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। ডানহাতের কনুইতে একটা খোঁচা খেয়ে চোখ মেলতে হল। চোখের সামনেই একটা হলদে রঙের চুইংগাম।

'নাও। গাম খাও। বুঝেছি খুব যা তা লাগছে। সুহাস তো দেখছি ঘুমিয়েই পড়ল।' আশ্চর্য আমার দাদার নাম কী করে জানলেন এই ভদ্রলোক। এঁর দেওয়া চুইংগাম খেয়ে মরব না কি? 'নো থ্যাংকস। আমি খাব না।'

সূচীপত্রে যান

'ভয় পাচ্ছ? খুব স্বাভাবিক। অচেনা লোক। তায় তোমার দাদার নাম জানি। তুমি কী ভাবছ তাও জানি।'

'কী ভাবছি?'

'ভাবছ আমি একটা ছেলেধরা। তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে ঝোলায় ভরে নিয়ে যাব। তারপর তোমার বাবার কাছ থেকে র‍্যানসাম আদায় করব। র‍্যানসাম মানে কী?'

'র‍্যানসাম মানে মুক্তিপণ।'

'ভেরি গুড। কিডন্যাপ মানে কী?'

'জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া।'

'ভেরি ভেরি গুড।'

'হাইজ্যাক মানে কী?'

'ছিনতাই।'

'ট্রিপল ভেরি গুড।'

'আপনি কি ইংরেজির মাস্টার মশাই?'

'কে জানে কে? যদি জানতেই পারতুম আমি কে, তাহলে কি এত খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন হত। তুমি কি জানো তুমি কে? জানো না। জানলে কি তোমার এই অবস্থা হয়। নাও ঘুমিয়ে পড়ো।'

'আমার কী এমন খারাপ অবস্থা হয়েছে।'

'বুঝবে পরে। তুমি কে কেউ জানে না। তুমিও না, তোমার গার্জেনরাও নয়। এই না জানার ফলে তোমাকে নিয়ে কত কাণ্ড হবে দেখবে। যেমন আমাকে নিয়ে হয়েছে। যেমন তোমার দাদা সুহাসকে নিয়ে হয়েছে।'

'আমার দাদাকে আপনি কী করে চিনলেন।'

'দেখে।'

'কখন দেখে? ছেলেবেলায়।'

'না, এখন দেখে। এইমাত্র দেখলুম আর চিনলুম।'

খুব ভয় পেয়ে চুপ করে গেলুম। কী লোক রে বাবা। এমন তো কখনও শুনিনি, কারও দিকে তাকিয়েই তার নাম জেনে ফেলা যায়। দাদাটাও এমন হয়েছে, এইরকম একজনের পাশে বসিয়ে কেমন দিব্যি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে।

গাড়িটা হঠাৎ ঝাঁকানি খেয়ে থেমে গেল। দাদার মাথাটা ঠাঁই করে সামনের সিটে ঠুকে গেল। ছোট্ট গাড়ি। জনকুড়ি লোক বড় জোর ধরে। হঠাৎ আচমকা এত জোরে কেন যে থামল। আমার পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক বললেন, 'জানতাম এইরকমই হবে। হঠাৎ ওপর থেকে একটা বোলডার গড়িয়ে পড়েছে।'

দাদা কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'বোলডারটা গাড়ির ছাদে পড়লে কী হত?'

ভদ্রলোক হাসিহাসি মুখে বললেন, 'গাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। টাল রাখতে না পেরে খাদে গিয়ে পড়তে পারত।'

'তা হলে কী হত?'

'আমাদের মৃত্যু হত।'

দাদার মুখটা ভয়ে যেন কেমন হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কী আমার তেমন ভয়টয় করছে না। কী হবে, কী হতে পারত, এসব ভেবে ভেবে মন খারাপ করার কোনও মানে হয় না। গাড়িটা এখন এখানে বেশ কিছুক্ষণ থেমে থাকবে। সামনের পথ পরিষ্কার না হলে যাওয়া যাবে না।

দাদাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি আমার পাশের ভদ্রলোককে চেন?'

ফিস ফিস করে বললে কী হবে, ভদ্রলোক ঠিক শুনে ফেলেছেন। দাদা উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি বললেন, 'না, না, তোমার দাদা আমাকে চিনবে না। কী করে চিনবে!'

'তা হলে আপনি কী করে চিনলেন?'

'আমি চিনতে পারি। আমার অনেক ক্ষমতা।' বলে তিনি আসন ছেড়ে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। বাস্! যেমন লম্বা তেমনি চওড়া মানুষ। দেখলেই ভয় করে। দাদার মুখেও বেশ ভয়ের ভাব। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে।

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে খুললেন। খুট করে একটা শব্দ হল।

সূচীপত্রে যান

সেকেলে পকেট ঘড়ি। এসব জিনিস আজকাল আর সহজে দেখা যায় না। ঘড়িতে কিছুক্ষণ চোখ রেখে ভদ্রলোক বললেন, 'না, এ-গাড়ি আর পথের শেষ দেখতে পাবে না।'

দাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'নিয়তি।'

'সে আবার কী?'

'নিয়তির ইংরেজি কী মাস্টার?' আমাকে প্রশ্ন।

'ফেট।'

'রাইট ইউ আর। সেই ফেট এই গাড়িটাকে টানতে টানতে খাদের দিকে নিয়ে যাবে। তারপর তিনশো মিটার নীচে পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে, বছরের পর বছর।'

'কী করে জানলেন?'

'আমি সব জানতে পারি। আর জানতে পারি বলেই আমি যা করতে চাই তা কোনও দিনই করতে পারি না।' ঘড়ি পকেটে পুরে, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে ভদ্রলোক নেমে পড়লেন।

আমরা দু'ভাই হাঁ হয়ে বসে রইলুম। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে আমাদের জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। একটু আগের ঝাপসা কুয়াশা কেটে গিয়ে আবার রোদ উঠেছে। মাথার টুপি হাত দিয়ে কপালের উপর আরও খানিকটা টেনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার ইনটিউশন বলছে আর চার-পাঁচ কিলোমিটার যাওয়ার পরই এ গাড়ি একটা খাদে গিয়ে পড়বে। বাঁচতে যদি চাও, তো নেমে এসো। মাস্টার ইনটিউশন মানে কী?'

'ইনটিউশন মানে মন, মানে সিক্সথ সেনস, মানে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।'

'ব্যস, ব্যস, প্রায় কাছাকাছি গিয়েছ। আচ্ছা গুডবাই।'

ভদ্রলোক গটগট করে উলটো দিকে হাঁটতে হাঁটতে পথের ঢাল বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গাড়ির পিছনের কাচ দিয়ে আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে সেই রহস্যময় মানুষটির চলে যাওয়া দেখলুম।

'দাদা।'

সূচীপত্রে যান

'বল।'

'কী করব?'

'বড় ভেঙে পড়েছি রে! এখনও ভাল করে ঘুম ছাড়েনি চোখ থেকে। তার উপর গাড়ি গিয়েছে থেমে। তার উপর লোকটি সাঙ্ঘাতিক ভয় ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার উপর। না, তার আর উপর নেই। আমার শরীরে শক্তি নেই। থ্যাস থ্যাস করছে। আমি চোখ বুজিয়ে বসে থাকি। যা হয় হবে।'

'যা হয় হবে কী গো।'

'হ্যাঁ যা হয় হবে।'

ওদিকে বোল্ডার সরানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এ রাস্তায় মিলিটারি ট্রাক চলে। পথ বেশিক্ষণ বন্ধ রাখা চলে না। রাস্তা প্রায় সাফ হয়ে এসেছে। এখুনি আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করবে।

'দাদা কী করবে?'

'কিচ্ছু করব না। তুই চুপ করে বোস। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে?'

খ্যাঁ খ্যাঁ শব্দ করে গাড়ি স্টার্ট নিয়ে ঘুরে ঘুরে আবার চলতে শুরু করল।

'কাজটা ভাল করলে দাদা? জেনে শুনে বিপদে পড়বে!'

'রাখ তোর বিপদ। বিপদ বললেই বিপদ। এতগুলি মানুষেরই কি এক ভাগ্য।'

বেশ কিছুটা যাওয়ার পর আমার ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল। পরিষ্কার রাস্তা। এই রোদ, এই মেঘ। ভয় পাওয়ার মতো কোনও ব্যাপারই নেই। দাদা স্যান্ডউইচের প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। ফ্লাস্কে চা আছে। সকলেই গুজগুজ করে কথা বলছেন, নানা ভাষায়।

হঠাৎ আমাদের পাশ দিয়ে একটা জিপ চলে গেল ওভারটেক করে। স্পষ্ট শুনলুম জিপের ভিতর থেকে কে যেন চিৎকার করে বললেন, 'সুহাস নেমে এসো। এখনও সময় আছে।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'দাদা শুনলে?'

'শুনলুম।'

'তাহলে?'

'তা হলে চা খা।'

উঃ কি দাদার পাল্লায় পড়লুম। গলা ছেড়ে মাকে ডাকতে ইচ্ছে করছে। গাড়িটা যতবার খাদের দিকে সরে সরে যাচ্ছে ততবার গলার কাছে একটা শব্দ ঠেলে ঠেলে আসছে, গেল গেল। এই বুঝি গেল।

আমরা দু'জনেই কেবল হাঁসফাঁস করছি। গাড়ির অন্য সকলে কেমন নিশ্চিন্তে বসে আছে। ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ আগে থেকে জেনে ফেলার এই দুর্ভোগ।

'দাদা আমরা কত কিলোমিটার এলুম?'

'কে জানে কত? চুপ করে বসে বসে ভগবানের নাম জপ কর। বাঁচার ওই একটাই রাস্তা।'

'তোমার কী মনে হয়, বাসটা সত্যি সত্যিই খাদে পড়ে যাবে?'

'যেতেও পারে। মাঝে মাঝে পড়েও তো। নীচের দিকে তাকালে দেখতে পাবি সব পড়ে আছে।'

ভয়ে পেট গুড় গুড় করে উঠল। দাদা এক আশ্চর্য মানুষ! জেনে শুনে কেমন বসে আছে। একেই বলে হাসি হাসি পরব ফাঁসি মা গো।

গাড়িটা একটা বাঁক ঘুরেই খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থেমে গেল। বেশ বড় রকমের একটা ঝাঁকুনি খেতে হল। এই রে, এইবার বোধহয় খাদে পড়ছে। চোখ বুজিয়ে মা-কে ডাকি। কতক্ষণ চোখ বুজিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'দাদা, আমরা কি পড়ে গিয়েছি।'

'গবেট, পড়ে গেলে আমরা কেউ বেঁচে থাকতুম না কি?'

'তাহলে।'

ড্রাইভার হিন্দিতে বলছে, 'আগেওয়ালা যো জিপ ওভারটেক করকে গিয়া না, ও জিপ গির গিয়া।'

দাদা লাফিয়ে উঠল, 'সে কী? এ কেয়া বাত?'

হুড়মুড় করে আমরা নেমে এলুম। তিন চারজন হলদে টুপি পরা নেপালি রাস্তার ধারে

ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক অনেক নীচে একটা জিপ চাকা চারটে আকাশের দিকে করে উলটে পড়ে আছে।

'কত মিটার নিচু হবে দাদা?'

'আমার মাথা ঘুরছে।' দাদা পথের পাশে বসে পড়ে বললেন, 'দাঁড়া একটু বসে নি।'

এক সর্দারজি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বললেন, 'করিব তিনশও মিটার তো জরুর হোঙ্গে।'

তাঁর কথার রেশ হওয়ায় মিলিয়ে যেতে না যেতেই নিচের সেই কুয়াশা ঘেরা উপত্যকা থেকে একটি কণ্ঠস্বর যেন ভেসে এল,

'মাস্টার, টার্ন টার্টল মানে কী?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলুম, 'কচ্ছপের মতো উলটে যাওয়া।'

সূচীপত্রে যান

ভূত সম্পর্কে দু'চার কথা

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

স্টেশনে নামা মাত্রই উত্তুরে বাতাসের ঝাপটা বুঝিয়ে দিল বেশ ঠান্ডা। আর একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে। একেবারে রংচটা বিকেল। স্টেশনে তেমন ভিড় নেই। তেমন নামী-দামি জায়গা নয়। আমার শীতকাতুরে সহকর্মী সুকুমার বললে, 'এটা হুনমান টুপির জায়গা।' স্টেশনের বাইরে চা-তেলেভাজার দোকান। সরষের তেলের ঝাঁজালো গন্ধ। সুকুমার বললে, 'খাঁটি তেল। একজোড়া আলুর চপ, এক গেলাস চা মন্দ হবে না। শীতটা কমবে। হাড় পর্যন্ত কেঁপে যাচ্ছে। হাওয়াটা আসছে কোথা থেকে? হিমালয় তো অনেক দূরে!'

ভাঙাচোরা দোকান। তেমন ছিরিছাঁদ নেই। উনুনের আগুনে ভেতরটা বেশ গরম। পেছন দিকে একটা পুকুর। ঝোপঝাড়-স্বামী-স্ত্রীর দোকান। বয়স বেশি নয়। শক্তপোক্ত চেহারা। মেয়েটির খুব যৌবন। মুখটা সুন্দর। খোঁপার বাহার। বেশ দুষ্টু দুষ্টু চোখ। মাঝে মাঝে কী একটা গান গুনগুন করছে। ভেতরে খুব আনন্দ। আমাদেরও বয়স কম। চপলাদের ভালই লাগে। আমাদের বিয়েও হয়নি। কোনও মেয়ে ভুলেও তাকায় না। একটি মেয়ে সুকুমারকে একটা চিরকুটে লিখেছিল—'প্রিয়তম' পরে জানা গেল, বছরে তিনমাস তার মাথা খারাপ থাকে। তাও সুকুমার এগোতে চেয়েছিল। যুক্তি—বিয়ের পর মাথা ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েটি সুন্দরী। দূর থেকে আমাকে একদিন দেখিয়েছিল। মাথার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিল। তিনি বলেছিলেন, কেন রিস্ক নেবে? সুস্থ মেয়েরাই অতিষ্ঠ করে মারে! চিরকুটটা সুকুমার সব সময় বুক পকেটে রাখে। ভারী নরম মনের ছেলে। মেয়েটির কী হবে ভেবে চোখের জল ফেলে। ভাল করে ঘুমোতে পারে না। কে দেখবে! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে। আমাকে ভাল তো বেসেছে, তা না হলে লিখবে কেন? কে যে পাগল বুঝি না। দু'জনেই পাগল। পাগলে পাগল চেনে।

দোকানের ভেতরে যেমন-তেমন বসার ব্যবস্থা। বেশিরভাগ খদ্দেরই বাইরে দাঁড়িয়ে।

সূচীপত্রে যান

ভেতরে আমরা কয়েকজন। তেলচিটে দুটো বাল্‌ব এদিকে-ওদিকে আলো ছিটিয়েছে। অন্ধকারেরই নানারকম। পাতলা, ঘন। কালো আলখাল্লা পরা একজন ফকির বসে আছেন। মাথায় কালো টুপি। সায়েবদের মতোই ফরসা। বনে হয় 'অঘোরী'। ভয়ঙ্করের উপাসক। মহাভারতের কাল থেকে চলে আসছে। অঘোর শিব এই সম্প্রদায়ের উপাস্য। এঁদের কথা না বলাই ভাল। ভীতিপ্রদ, গা ঘিনঘিন করবে। নরবলি সাধনার অঙ্গ। নরমাংস ভক্ষণ। নানারকমের কুৎসিত খাদ্য। ভৈরব আর ভৈরবীদের যৌন মত্ততা। এঁদের একধারাকে বলা হয় বীজমার্গী। এক বিশিষ্ট তান্ত্রিক আমাকে এই সব বলেছিলেন। তখন আমি কলেজে পড়ি। তান্ত্রিক হওয়ার ইচ্ছা ছিল। প্রেতসিদ্ধ হব। অলৌকিক শক্তি হবে। সেই সাধক বললেন, ও তোমার দ্বারা হবে না। অন্যরকমের শরীর ও মন চাই। সেই সাধকের দু'জন প্রেত ছিল। আঙুলে আঙুলে দামি পাথর বসানো আংটি। কোনও কিছুর অভাব নেই। ভাবামাত্রই জিনিস এসে যায়। বড় বড় মানুষরা পায়ের কাছে বসে থাকতেন।

সুকুমার পেছন দিকে গিয়ে পুকুর দেখছে। জলের ওপর রাত নামলে গা ছমছম করে। মৃত্যু চিন্তা আসে। ভাল লাগে না। জল সাংঘাতিক জিনিস। তরল রহস্য। সুকুমারের মা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন। সুকুমার তখন হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করছিল। তারপর থেকেই প্রায় স্বপ্ন দেখে, বিরাট থমথমে একটা দিঘি। কালো থকথকে জল। গভীর রাত। কোথাও একপাল কুকুর সমস্বরে কাঁদছে। তার মা গভীর জল থেকে ধীরে ধীরে উঠছেন। জলের ওপর দাঁড়িয়ে হেঁটে আসছেন দু'হাত সামনে বাড়িয়ে। সারা শরীরে শ্যাওলা জড়িয়ে আছে। ভয়ের স্বপ্ন।

সুকুমারের কাছে এগিয়ে গেলুম। ছেলেটাকে খুব সুন্দর দেখতে। স্বাস্থ্যবান, কিন্তু মনটা খুব কোমল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাল বেয়ে চোখের জল নেমেছে। বাইরের খোলা জায়গায় তারে একটা শাড়ি আর শায়া ঝুলছে। উত্তুরে বাতাসে একটু একটু উড়ছে। শায়াটা ফুলে ফুলে উঠছে। জমিটা ঢালু হয়ে জলের দিকে নেমে গেছে। বড় বড় কয়েকটা গাছ। একটা প্যাঁচা বিপুল শব্দে ডেকে উঠল। পাশের ঝোপে ঝিঁঝি ডাকছে। ট্রেনের শব্দ। কোথাও হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে। শীতের রাত।

'কেঁদেছিস?'

'ধুস্, কাঁদব কেন? মাঝে মাঝে জল গড়ায়। ঠান্ডা বাতাস।'

'এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

'ওই দ্যাখ জল, কালো থকথকে জল।'

সুকুমার এইবার ডুকরে কেঁদে উঠল। যতই হোক, মেয়েদের মন তো! তা ছাড়া ভারী মিশুকে। সরল। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে। পরিচিত মহলে এমন মেয়ে দেখিনি। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বেশ উদ্বিগ্ন, 'কী হল? কোথাও কষ্ট হচ্ছে?'

'মনে। দেহে নয়।'

খপ করে সুকুমারের হাতটা ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে ফকির সাহেবের পাশে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'গোলাপবাবা, দুঃখ দূর করে দাও। সন্ধেবেলা কাঁদতে নেই।' এতক্ষণে জেনে গিয়েছি, এরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী নয়, প্রেমিক-প্রেমিকাও নয়। ভাই-বোন। বাবা ছিলেন রেলের লাইনসম্যান। হঠাৎ মারা গেছেন। সে প্রায় চারবছর আগে। জমি, জায়গা, চাষবাস কিচ্ছু নেই। এই দোকানটাই সম্বল। ছেলেটির নাম, বিক্রম। মেয়েটির নাম, বিভা। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এরা উত্তর ভারতের মানুষ। চমৎকার, মজবুত স্বাস্থ্য। প্রাণখোলা, জীবনের চক্রান্তের কাছে হার মানতে প্রস্তুত নয়। দীর্ঘদিন বাংলাদেশে থাকতে থাকতে বাঙালি হয়ে গেছে।

ফকিরবাবাও উত্তর ভারতের মানুষ। গোলাপবাবা বলে ডাকে বিভা। ডাকার মতোই চেহারা, রং। এদের খুব ভালবাসেন। পিতার মতো। এরাও নিজেদের সমর্পণ করে দিয়েছে তাঁর কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এতসব জানা হয়ে গেল। ফকির সাহেব ভারী মিষ্টি। ভুল দেখছি কি না বলতে পারব না। তাঁর দু'চোখে যেন আলো জ্বলছে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। কাচের ওপর আলো পড়লে যেমন হয়।

সুকুমারকে বললেন, 'মানুষ একটা দুঃখই সহ্য করতে পারে না, তোমার দুটো। মা তোমার সঙ্গেই আছেন। ভয় পাও কেন? আর ওই মেয়েটি ভাল হয়ে যাবে, ভাল হয়ে যাবে। তারপর? আর বলব না। তোমরা কে? ওষুধ কোম্পানির?' উত্তরটা আমিই দিলুম, 'আমরা সরকারি কর্মচারী। জেলায়-জেলায় ঘোরাই আমাদের কাজ। কী কী শিল্প আছে, বড়-ছোট, হাতের

কাজ, নতুন কী করা যায়, বেকার সমস্যার সমাধান—এই সব আমরা দেখি; কিন্তু আপনি কী করে আমার বন্ধু সম্পর্কে তার জীবনের ভেতরের কথা ঠিকঠাক বলে দিলেন?' 'ও এমন কিছু নয়। একটু চেষ্টা করলে যে-কেউ পারবে। কিছু সাধনা আছে। এই জগৎটা প্রেত-পিশাচে ভরতি। তাদের দু'-একটাকে কাজে লাগাতে পারলে কী না করা যায়? সব সত্যি, আবার সব মিথ্যা।'

আর একটা ট্রেন একটু থেমে চলে গেল। আবার কিছু লোক। রিকশার প্যাঁক প্যাঁক হর্ন। দোকানের বাইরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়লেন। কত রকমের কথা! সবাই স্থানীয় মানুষ। কাজে-কর্মে কোথাও না কোথাও গিয়েছিলেন। কেউ কেউ খুব শব্দ করে চায়ের গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন। কেউ কেউ চায়ের সঙ্গে ধূমপান করছেন। বিভা জিজ্ঞেস করলে, 'দু'জনের কোথায় থাকা হবে শুনি! রাত তো হন হন করে এগোচ্ছে। শেষ ট্রেন আসার সময় হয়ে গেল। এরপর সব ভোঁ ভাঁ।'

'আমরা কোথায় আর থাকব? ডাকবাংলোয়। সেটা কোন দিকে? কত দূরে?' বিভা হি হি করে খানিক হেসে বললে, 'ওটা ডাকবাংলো নয় গো, ভূতবাংলো। এককালে অত্যাচারী এক সায়েবের নীলকুঠি ছিল। মাঝরাতে সায়েবের ভূত এসে গলা টিপে দেবে, তখন বুঝবে মজা।'

'ভূত-প্রেত আমরা মানি না।'

'ঠিক আছে। রাতটা কাটিয়ে এস। রাতে খাবে কোথায়? ওখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই'

'তা হলে?'

'জল খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ো। সায়েব ভূত কি খাওয়ায় দেখো। সকালে দেখা যাবে দাঁত ছিরকুটে পড়ে আছ।'

'ভূত ভূত কোরো না তো।'

'জায়গাটা দেখে মালপত্তর রেখে চলে এস। ইলিশের ঝোল, গরম গরম ভাত কেমন লাগবে? টর্চ আছে সঙ্গে?'

'আছে।'

'হনমান টুপি?'

'নেই।'

'বুঝবে, বুঝবে।'

বাইরে একটা রিকশাই দাঁড়িয়েছিল। হারানদার রিকশা।

রাস্তাটা পিচের। তেমন চওড়া নয়। ক্রমশ অন্ধকার থেকে ঘন অন্ধকারের দিকে চলে গেছে। ছাড়া ছাড়া বাড়ি। কোনওটা একতলা, কোনওটা দোতলা। টালি আর টিনও আছে। ঝোপঝাড়। জোনাকি। কোথায় খুব জোরে জোরে কথা হচ্ছে। হারানদা বললেন, নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে। শিবরাত্রিতে খুব ধুমধাম হবে। সারারাত যাত্রা হবে রেলের মাঠে। আমারও পার্ট আছে। নন্দী। খুব বেশি কথা নেই। গান আছে। আমার গানের গলাটা ভাল। নেশা-ভাং করি না। অভাবের জন্য কিছু হল না, হবেও না। মাথায়-মাথায় দুটো মেয়ে। বিয়ে দিলেই হয়। অনেক টাকা। গোলাপবাবা বলেছে, ভাবিস না, আমি আছি। সত্যি, মানুষটা ভগবান। কী না করে আমাদের জন্যে! নিজে থাকে একটা কবরখানায়। কী সুন্দর নাচে। আমি কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ। ফার্স্ট ডিভিশন।

কাঁসাই নদীর ধারে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল একটা কমপাউন্ড। বিশাল-বিশাল গাছ। মাঝখানে সাহেব আমলের বাংলো ধরনের একটা বাড়ি। খুব একটা যত্নে নেই। সরকারি তদারকি যেমন হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার বিদ্যুৎ নেই। চওড়া উঁচু রক। একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ঢোকার গেটের একটা পাল্লা ঝুলে মাটিতে ঠেকে গেছে। খুব বড় একটা শিমুল গাছের মাথায় বকের একগাদা ছানা। কক-কক করেই চলেছে। চতুর্দিকে খাঁটি অন্ধকার। হিমেল বাতাস। বুনো গন্ধ। অন্ধকার ফুঁড়ে চৌকিদার বেরিয়ে এলেন। খাটো ধুতি। খাকি শার্ট। মেজাজ খুব সুবিধের নয়। মদের গন্ধ। বললেন, 'এসডিও সায়েবের অর্ডারও এসেছে। এতক্ষণ ছিলেন কোথায়? ট্রেন তো লেট করেনি। আমার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। যে-ঘরটা খোলা, সেটাই আপনাদের। দু'নম্বর। যা তেল আছে আলোটা ঘণ্টাখানেক জ্বলবে। টর্চ আছে তো? আচ্ছা, আমি চললুম।'

'আপনি থাকবেন না?'

'পাগল হয়েছেন।'

'মানে? চৌকি দেবে কে?'

'আপনারা।'

লোকটি হনহন করে চলে গেলেন। আশ্চর্য ব্যবহার! যেতে যেতে আবার ফিরে এসে বললেন, 'রাত্তিরে ঘরের বাইরে বেরোবার চেষ্টা করবেন না।'

নাম জানা হল না। বাইরের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। হারানদা বললেন, 'আমি এখন কী করি? আপনাদের ফেলে যাই কী করে? কিন্তু যেতেই হবে।'

সুকুমার বললে, 'কী হচ্ছে বল তো? রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস?'

ঘরটা বড়। খুব এলোমেলো। দু'পাশে দুটো ফিতে লাগানো খাট। টানটান নয়। এর আগে নিশ্চয় মোটা মোটা লোক শুয়ে গেছে। দুটো বেড রোল। কী আছে খুললে বোঝা যাবে। একটা হ্যারিকেনের আলোয় কতটুকু আর বোঝা যায়! বড় একটা কাঠের টেবিল। দুটো বেঢপ চেয়ার। বোধহয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের। জানলা-দরজায় একটাও ছিটকিনি নেই। সব কাচ ভাঙা। পাঁই পাঁই করে হাওয়া ঢুকছে। বাথরুমের দরজার একই হাল। কোম্পানির আমলের নিকাশি ব্যবস্থা। সেখানে আবার আর এক কাণ্ড। পিছনের দিকে একটা দরজা। বাইরে থেকে সাফাইকর্মী আসবে। সামনের রকটাই বেড় দিয়ে এদিকে চলে এসেছে। বাংলোর পিছন দিক। রকের পরেই জমি। জঙ্গল হয়ে গেছে। গড়িয়ে চলে গেছে পাঁচিলের দিকে। পাঁচলের পরে কী অবস্থা রাতে বোঝা যাবে না, অনেকটা নীচে বয়ে চলেছে কাঁসাই। শীতকালে জল কম। বাথরুমের পিছনের দরজায় ছিটকিনি নেই। তার মানে যে-কেউ এদিক দিয়ে ঢুকে ঘরে চলে আসতে পারে। রকে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে যতটা পারা যায় দু'জনে একবার দেখার চেষ্টা করলুম। বিরাট এলাকা। প্রাচীন প্রাচীন সব গাছ। শীতের পাতা ঝরেছে। থেকে থেকে মচমচ শব্দ। রাতের প্রাণীরা শিকারের সন্ধানে। রাতেরবেলা গাছের ভাষা, চরিত্র বদলে যায়। মনে হয় অনেক বেশি জীবন্ত, রহস্যময়। বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যাবে না। হাড়কাঁপানো শীত। হারানদা বলে গিয়েছেন, আর একটু ওপর দিয়ে এগোতে পারলে কিছু ভাল দোকান পাওয়া যাবে। রাতে কিছু খেতে তো হবে। শীতের রাত বড় রাত।

সূচীপত্রে যান

'টাকা-পয়সা পকেটে ভরে নে। তালাচাবি লাগাবার কোনও অর্থ নেই। পেছন দিকটা হাওয়া খোলা। ওদিকে আবার নদী।'

গেটের বাইরে এসেই দেখি স্টেশনের দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। আসতেই পারে। গাড়িটা গেটের সামনে থামল, হারানদা। আরোহী গোলাপবাবা আর বিভা। অবাক কাণ্ড। তাঁরা গাড়ি থেকে নামলেন। নামল অনেক জিনিস। দুটো মোটা পাহাড়ি কম্বল। একটা বড় মশারি। একটা টিফিন ক্যারিয়ার। শালপাতার থালা। মাটির গেলাস। জল। কেরোসিন তেলের বোতল।

বিভা দাওয়ায় সব সার দিয়ে রাখতে রাখতে বলছে 'এর নাম ডাকবাংলো।' এখানে নেতা, বড়কর্তারা ভুলেও আসে না। তাই এই অবস্থা। হারানদা যখন সব বললেন, তখনই আমরা ঠিক করলুম, বাচ্চা দুটোকে বাঁচাতে হবে। এই শীতের রাত, পাশেই নদী, শ্মশান। এদের মা নেই না কি? সব মেয়েতেই মা আছে। গোলাপবাবা এইটাই তো তুমি সারাদিন বিশ-ত্রিশবার বলো।' সব শেষে এল একটা মোটা লাঠি। হারানদা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আত্মরক্ষা।'

বিভা বললেন, 'গোলাপবাবা বলেছে, তোমরা খুব ভাল ছেলে। তোমাদের সেবা করলে ভগবান সন্তুষ্ট হবেন। আমরা তো বড়লোক নই যে, তোমাদের ভাল ঘরে নরম বিছানায় শোয়াব। তা হলে এইবার ঝট করে খেয়ে নাও, গরম থাকতে থাকতে।'

বিভা ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে বললে, 'বাবা! একবার দেখে যাও, ঘরটার অবস্থা! এখানে থাকবে কী করে?'

হারানদা বললে, 'কুণ্ডুবাবুদের বাড়িতে একবার দেখব! ওদের নিচের দোকানের পাশে একটা ঘর আছে, বেশ সাজানো-গোছানো।'

বিভা বললে, 'খবরদার নয়। ওদের দুটো ছেলেধরা মেয়ে আছে। অ্যায়সা ফাঁদে ফেলে দেবে, এই কচিবাচ্চা দুটোকে চিবিয়ে খাবে।'

গোলাপবাবা বললেন, 'রাতটা কোনও রকমে কাটিয়ে দিক, কাল সকালে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

উপাদেয় রান্না। সুকুমার খেতে ভালবাসে। পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন হলেও, বেশ তৃপ্তি হল।

পাতা কোথায় ফেলা হবে? গোলাপবাবা বললেন, 'এঁটো পাতা যেখানে-সেখানে ফেলবে না। রাত্তিরবেলা সর্বত্র প্রেত পিশাচেরা ঘুরে বেড়ায়। সব তালগোল পাকিয়ে বিভার হাতে দাও।'

সুকুমার বললে, 'তা সম্ভব নয়। আমাদের পাতা আমরা ফেলব।'

বিভা একটা বড় চটের ব্যাগ সামনে মেলে ধরে বললে, 'হয় এর মধ্যে ফেলো, না হয় গরুর মতো চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফ্যালো।'

সব গোছগাছ করে নিয়ে সবাই চলে গেলেন। পড়ে রইলুম আমরা দু'জন। কিছু দূরে বেখাপ্পা একটা বাড়ি। দোতলা। বাড়িটার বয়স হয়েছে। রাস্তার দিকে টানা বারান্দা। ভেতরের ঘরে আলো জ্বলছে। বারান্দায় কেউ পায়চারি করছে। মনে হয় কোনও মহিলা। সুকুমার বললে, 'যাক বাবা, বাড়িটায় লোক আছে। আমরা একা নই। তেমন হলে ওখানে চলে যাব। বাড়ির ভেতরে বেশ ভারী গলায় কেউ বলে উঠলেন, 'মা, মা। জয় তারা!' বারান্দার মহিলা ভেতরে চলে গেল। দড়াম করে দরজা বন্ধের শব্দ হল। পাশেই কোথাও একপাল শেয়াল ডেকে উঠল। বলা নেই কওয়া নেই নদীর দিক থেকে হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা। গাছের একটা শুকনো ত্রিভঙ্গ ডাল মাটিতে পড়ে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে আবার কাত হয়ে গেল; যেন জীবন্ত কোনও প্রাণী। এমনই মনের অবস্থা, স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। হঠাৎ শীতের বাতাসে এত জোর এল কোথা থেকে? কৃষ্ণচূড়ার শুকনো ডাল কেন ভাঙল! নদীর ওপারের আকাশ হঠাৎ কেন এমন লাল? একঝাঁক কালো কালো কী উড়ছে ওসব। এত ধোঁয়া কেন? শ্মশানটা কোন দিকে?

একটু আগে আমি যা দেখেছি সুকুমারকে বলিনি। ভয় পেয়ে যাবে। একেবারে স্পষ্ট। আমরা যে-ঘরে থাকব সেই দু'নম্বর ঘর থেকে আপাদমস্তক চাদর জড়ানো একটা মূর্তি বেরিয়ে এসে প্রায় ভাসতে-ভাসতে বারান্দা ঘুরে পেছন দিকে ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেল। খুব ইচ্ছে করছিল পিছন পিছন যাই। আমার দাদু সিদ্ধ তান্ত্রিক। তারাপীঠে, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির বেলতলায় সাধন করেছেন। আবার বেদান্তে সুপণ্ডিত। শবসাধনাও করেছেন। আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। তোমার কোষ্ঠীতে কেতু যে-ঘরে আছে, তাতে অলৌকিক তোমাকে

টানবে। নানারকম দর্শন হবে; কিন্তু সাবধান, সঙ্গে গুরুদত্ত রক্ষাকবচ না থাকলে অশরীরী আকর্ষণে বীভৎস পরিণতি অনিবার্য।

এইবার যা হল, তা আরও অদ্ভুত। মাটিতে গোল একটা আলোর বৃত্ত। অথচ কোথাও কোনও আলো নেই। বৃত্তটা সরসর করে চলছে ডানপাশে পাঁচিলের দিকে। ওদিকে সেকালের নীল ভেজানোর সার সার কয়েকটা চৌবাচ্চা। আলোর বৃত্তটা তার একটায় হারিয়ে গেল।

মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে আমি আর সুকুমার ছাড়া কেউ নেই। একটু দূরে নির্জন একটা নদী। শীতকাল, তাই তেমন জল নেই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের বড় বড় গাছ। ইংরেজ আদলের একটা বাংলো। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণ। চৌকিদার পালিয়েছে। আলো বলতে একটা লণ্ঠন। চারিদিক নিস্তব্ধ। কাছাকাছি কোনও গাছে একটা পাখির ছানা—চিঁ-চিঁ করছে। সুকুমার খুব রেগে গিয়েছে—'রাত আছে, ঘুমোবার উপায় নেই। কোনও মানে হয়! চলে যাব অন্য কোথাও, সে উপায়ও নেই।'

মজা করার জন্যে বললুম, 'আজ রাতে আমি বিয়ে করব। আমার আর তর সইছে না। আমি বিভার প্রেমে পড়েছি। আমার ভূতের ভয় চলে গেছে। প্রেমের সাগরে মোচার খোলার মতো ভাসছি। এই মুহূর্তে আমার একজন পিশাচ চাই, যে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বিভার পাশে শুইয়ে দেবে। দু'জনে এই শীতের রাতে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকব। আমার বুকের উপর একটা হাত। লম্বা লম্বা পাঁচটা আঙুল। কানের পাশে গরম নিঃশ্বাস। দুটো মিষ্টি ঠোঁট।'

সামনের জমিতে কী একটা পড়ল! সিগারেটের খালি প্যাকেট। এ আবার কী! কে ফেললে! নিচু হয়ে প্যাকেটটা তুলতে গেলুম। নেই। আশ্চর্য ব্যাপার। সুকুমার শীতে কাঁপছে, না ভয়ে কাঁপছে! বললে, 'তুই বিভাকে বিয়ে কর, এক্ষুনি কর, আমার আপত্তি নেই।'

হঠাৎ দুম করে আমাদের ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। 'চল, চল।' আমরা বাইরে পড়ে আছি। দরজা ঠেলছি, খুলছে না। সারারাত বাইরে পড়ে থাকতে হবে না কি! ঘরে কেউ ঢুকেছে। দেশলাইয়ে কাঠি ঘষার শব্দ। দরজার ভিতর দিকে ছিটকিনি ভাঙা, তাহলে

বন্ধ করল কীভাবে! আর একবার দু'জন মিলে ধাক্কা মারলুম। অসম্ভব! বাথরুমের সার্ভিস ডোর দিয়ে ঢুকলে কেমন হয়! ঘুরে সেই দিকে গেলুম। একই অবস্থা। দরজার ছিটকিনি সব ভাল হয়ে গেল কীভাবে! ভিতরে অবশ্যই কেউ আছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছি। টিপ টিপ জল পড়ার শব্দ। ঘরে জল এল কোথা থেকে!

কোথায় যাই? কাকে বলি? সুকুমার ভীষণ রেগে গিয়ে বললে, 'ইয়ার্কি হচ্ছে? মাঝরাতে ইয়ার্কি?'

'আমাকে বলছিস কেন? এসবের জন্যে আমি দায়ী?'

'হ্যাঁ, তুই দায়ী। তুই যেখানে যাস, তোর পেছন পেছন একদল ভূত যায়।'

'চল, উলটো দিকের ওই বাড়িটায় যাই। দোতলার বারান্দায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে।'

'তোর মাথা। শীতের রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে তোর গলায় মালা দেবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা একটা পোড়োবাড়ি।'

'আমি দেখলুম জোব্বা পরা লম্বা একটা মূর্তি।'

'আলো নেই কেন?'

'তা বটে। তবু দেখলে হয়।'

সুকুমার খেপে গিয়ে বললে, 'শোন, আমার স্যুটকেসটা বের করে দে, আমি হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে চলে যাই। খুব হয়েছে, খুব শিক্ষা হয়েছে।'

'ঘরের দরজা খুলছে না, সুটকেস নিবি কী করে?'

'লাথি মেরে দরজা ভাঙব, ওই তো দরজার ছিরি। চল। অত ভয় কীসের!'

আমার তেমন ভয় করছে না, বরং মজা লাগছে। কোনও ব্যাপারে বেশি বাড়াবাড়ি হলে 'ইমপ্যাক্ট' কমে যায়। ভীষণ বিরক্তি লাগছে। আমারও ইচ্ছে করছে স্টেশনেই চলে যাই। যে ভাবেই হোক আমরা বিশ্রী একটা জায়গায় এসে পড়েছি। এখানকার অতীত ভয়ংকর। এমন হয় শুনেছি। অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সুকুমারের মেসোমশাই দুর্ঘটনার মারা গিয়েছিলেন, প্রাথমিক ধারণা এইরকমই ছিল। পরে রাতের পর রাত তিনি দেখা দিতে লাগলেন। কী একটা বলতে চান। অবশেষে জানা গেল, তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল

তার ভাইয়ের নিযুক্ত করা এক পেশাদার গুন্ডা। অশরীরীদের কোনও না কোনও চাহিদা থাকে। প্রতিকার চায়, প্রতিশোধ নিতে চায়। উদ্ধার পেতে চায়। সুকুমার খেপে আছে। গোল গোল চোখ দুটো জ্বলছে। তবু সাহস করে বললুম, 'শোন, ভূত-প্রেতে অবিশ্বাস করিস না। ইউরোপ, আমেরিকার মানুষও বিশ্বাস করে। সেখানে সুন্দর সুন্দর ভূত। আমাদের এখানে সব কেলো ভূত। ওখানে সব সুন্দর-সুন্দরী। আমেরিকার ইন্ডিয়ানায় জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট একটা গ্রাম! শান্ত, নির্জন। জঙ্গল চিরে একটা রাস্তা চলে গেছে। একপাশে অন্ধকার অন্ধকার অরণ্য আর একপাশে একটা বড় জলা। ওই বনপথে যারা সূর্যাস্তের পর গাড়ি চালিয়ে যায়, তারা প্রায়ই এক মহিলাকে দেখতে পায়। মাটি থেকে প্রায় পনেরো ফুট উঁচুতে গাছের ফাঁক দিয়ে দুলতে দুলতে আসছে। তুষারের মতো সাদা। মুখের আদলটা আছে। নাক, চোখ, ঠোঁট সেই। সব 'প্লেন'। চিৎকার করে বলছে, 'আমাকে বাঁচাও, আমার শিশুটিকে বাঁচাও।' অনুসন্ধানে জানা গেল, ওই জলায় ওদের দু'জনকে কে বা কারা ডুবিয়ে খুন করেছিল। দেখতে দেখতে চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল 'লেডি অফ দিউডস'। ব্যবসা শুরু হয়ে গেল। গাড়ির ভিড়। পুলিশ মোতায়েন হল। ঘোষণা করা হল, 'সাবধান নাবালকরা যেন না আসে।' বুঝলি? এটা মিছে নয়। ওখানকার সংবাদপত্রের খবর।'

সুকুমার বললে, 'চিত্ত আমার জুড়িয়ে গেল। এখানে এইবার লেডি অফ দি কংসাবতী দেখি।'

হঠাৎ কানে এল, কারা যেন কথা বলছে। শব্দটা আসছে অন্ধকার পোড়োবাড়িটার দিক থেকে। লম্বাটে বাড়ি। দোতলায় সামনের দিকে টানা একটা বারান্দা। বেশ শক্তপোক্ত বাড়ি। দোতলার অন্ধকারে কারা যেন কথা বলছে। সুকুমার বললে, 'আমি আর পারছি না। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। চল, ঘরে ঢোকার শেষ চেষ্টা করি।'

একটা ব্যাপারের সঙ্গে অনেকক্ষণ থাকলে সহ্য হয়ে যায়। আমাদেরও তাই হল অন্য কোনও ভাবনা নেই, একটাই ভাবনা অনেক রাত হয়েছে, এইবার শুতে হবে। মনে মনে ভাবছি, 'রাত কী সাংঘাতিক সময়! একটা আশ্রয়ের জন্যে মানুষ কীরকম ছটফট করে! একটা গরুও গোয়ালে ফিরতে চায়। সন্ধ্যার বন্ধুরা এখন কোথায়? কোথায় সেই গোলাপবাবা!

এখন কোন কবরে, কী সাধনায় ব্যস্ত! এখন একবার আসতে পারতেন!'

হঠাৎ নারীকণ্ঠের গগনবিদারী আর্তনাদ, 'মা-আ...' আরও কিছু শব্দ। নিস্তব্ধতা। সবই আসছে ওই বাড়ির ভিতর থেকে। লম্বা কালো একটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দৌড়, দৌড়। একেবারে ঘরের দরজায় আছড়ে। যে-দরজা একটু আগে ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সপাটে খুলে গেল। কর্পূরের গন্ধ। অদৃশ্য কেউ একজন বললে, 'ঠিক করে দিয়েছি, এইবার ঘুমিয়ে পড়।' গোলাপবাবা। নিমেষের জন্যে দেখা দিয়েই ঘরের বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে। যেভাবে মিছরির ডেলা জলে গুলে যায়, সেইভাবে।

সুকুমারের পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। নেয়ারের খাটে ঝপ করে শুয়ে পড়ল। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি। আমি ঘরটা একবার দেখে নিলুম। অন্ধকারে যতটা দেখা যায়।

কী-ই বা আছে ঘরে। এইটুকু জানি, কম্বলের তলায় আরও অন্ধকার। উষ্ণতা।

সুকুমারের মহাগুণ শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আমার মহাদোষ ঘুম সহজে আসে না। চিন্তার মিছিল চলতেই থাকে। শুয়ে শুয়ে ভূত-প্রেত, নয় বিভার কথা ভাবছি। মেয়েটা ভীষণ মজার। সব ব্যাপারটাই কেমন সামলাতে পারে হাসিমুখে। রঙ্গ-রসিকতাও জানে। দয়া, মায়া আছে। চেহারাটাও সুন্দর। শহুরে, শিক্ষিত মানুষের চোখে ওর গুণ ধরা পড়বে না। আমি ওর ভিতরটা দেখে ফেলেছি। বিভার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। এক সময় মনে হল, আমি আকাশে উড়ে যাচ্ছি। গ্রহ, নক্ষত্র, তারাদের পাশ দিয়ে। চাঁদটা যেন পালতোলা নৌকা। আরোহীরা সব হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের কাজ। চিকনের কাজ করা পাল। হালটা ঢোকরা শিল্পীদের তৈরি। দাঁড়িরা পরে আছে ছৌ-মুখোশ। কয়েকজন রাজা-মহারাজাও রয়েছেন। বিভা জামদানি শাড়ি পরে পালের খুঁটি ধরে নায়িকার মতো দাঁড়িয়ে আছে! হঠাৎ বন্দুকের শব্দ। সবাই হাততালি দিচ্ছে—শাবাশ, শাবাশ, ঔরঙ্গজীব। আমার ডানা ভেঙে গেছে। হু-হু করে নিচে পড়ে যাচ্ছি, নীচে, আরও নিচে, মাটিতে, ঘুম ভেঙে গেল। মেঝেতে পড়ে আছি। দুটো খাট দু'পাশে কাত। সুকুমারও মেঝেতে পড়ে আছে। সদ্য ভোর। দরজা হাট খোলা। কংসাবতীর কনকনে ঠান্ডা বাতাস। বাইরের দাওয়ায় একটা ফলস্ খোঁপা পড়ে আছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি, জিনিসটা কী? অবশেষে চিনতে

পারলুম, খোঁপা বড় করবার জন্যে মেয়েরা ব্যবহার করে।

ভোরের আলোয় রাস্তার ওপারে দুর্গ টাইপের বাড়িটার দিকে তাকালুম। সবকিছুই যার জীর্ণ। অবশ্যই অনেক ইতিহাস আছে। এইসব জায়গার প্রতি ইঞ্চিতে ঘটনার পর ঘটনা। মোগল, পাঠান, বর্ধমান রাজ, ইংরেজ, পর্তুগিজ, বর্গি। দখলের লড়াই, সম্পদ হরণের লড়াই। নীলকরদের লালসা। এক বা একাধিক অত্যাচারিতা রমণীর স্মৃতি আছে ওখানে। পিছন দিকে কবরও থাকতে পারে।

ভোরের আলোয় জায়গাটাকে মোটেই খারাপ মনে হচ্ছে না। একদিকে সুন্দর একটা নদী। নদীর শোভা নৌকা। তীরে পর পর তিনটে বাঁধা রয়েছে। বেশ চওড়া নদী। ওপারে ফাঁকা একটা মাঠ। মাঠের পারে সবুজে ঘেরা একটা গ্রাম। একটা মন্দিরের চূড়া। খোল-করতাল সহযোগে হরিনাম হচ্ছে। অতীতে এইরকম সব জায়গায় কলকাতার বাবুরা চেঞ্জে আসতেন। এখন, এই স্বাধীনতার পর কী হল কে জানে, চেঞ্জারবাবুদের মতিগতি সব অন্যরকম হয়ে গেল। আসলে ইংরেজরা বাঙালিদের খুব লাইক করত, পেটরোগা অম্বলের রুগি বলে। লন্ডনে অ্যানুয়াল রিপোর্ট পাঠাতেই হবে। সর্বেসর্বা কুইন। ইংরেজদের কুইন প্রীতি খুব। লর্ড ব্যারনরা কুইনের সামনে হাঁটু গেড়ে হাঁটে। রিপোর্টে বাঙালি সম্পর্কে লেখা হত— বাঙালিজ আর ভেরি নিরীহ। দেয়ার বউজ আর কলড কলাবউ। হাজব্যান্ডস আর ভেরি ওবিডিয়েন্ট টু দেয়ার বউজ। 'শুনচো' ইজ দ্য কমন ফর্ম অফ অ্যাড্রেস। প্লেন্টি অফ বাচ্চাস। দে কল দেম ন্যাংলাপ্যাংলাজ। অলওয়েজ ক্রাই। দে ইউস এ টার্ম 'চিল চিৎকার'। দে নেভার লাভ ওনলি ম্যারি। দে লাভ টু মেরি।

সেই চরিত্র আর নেই। বীরত্ব বাড়েনি। বেড়েছে ধান্দাবাজি। শের নয়, শৃগাল। সরকারি চাকরিতে ঢুকে আরও ভাল ভাবে বুঝেছি, বাঙালি কী বস্তু! আর এও বুঝেছি, আমিও এক বাঙালি। ভূত দেখা বাঙালি। আর সঙ্গে যে বঙ্গসন্তানটি রয়েছে, সে একটি আদুরে ননীগোপাল। ক' দিনের জন্যে ট্যুরে এসে বাড়ির সুখ খুঁজছে। যত অদ্ভুত কথা। ছোটলোক ভূত। ভূতের আবার ছোটলোক, ভদ্রলোক! ভূত হল ভূত। আমার ধান্দা অন্য। সরকারি

চাকরিতে প্রকৃত উন্নতি কোনওকালে হবে না। মাইনে কম। মাঝেমধ্যে প্রমোশন। বড়কর্তাদের প্রচুর তেল দাও। মন্ত্রীর আত্মীয় হতে পারলে বিদ্যুৎবেগে পদোন্নতি! একটাই প্লাস পয়েন্ট—লম্বা চাকরি, সব শেষে পেনশন। কাজ করো আর না করো চাকরি যাওয়ার ভয় নেই। আর ওরই মধ্যে একটু ইজ্জত—সরকারি চাকুরে। শ্বশুরমশাইদের ফেভারিট। সইসাবুদ করানোর জন্য লোকে আসবে। আমার ইচ্ছে সাংবাদিক হব, লেখক হব। এর মধ্যে ঝট ঝট করে কয়েকটা গল্প আর পাঠকদের প্রশংসাপত্র প্রকাশিত হওয়ায় উৎসাহ বেড়ে গেছে। লেগে থাকতে পারলে যা চাইছি তা হতে পারে। তখন নাম হবে। ফুলঝুরির মতো ঝরে ঝরে পড়বে। ছবি ছাপা হবে। সভায় ডাক পড়বে। বড় বড় কথা বলব! ধুতি-পাঞ্জাবি পরব। অসম্ভব রকমের সব ব্যাপার ঘটতে থাকবে। সুতরাং, কালকের ঘটনাটা আমার কাছে ঈশ্বরের দান, কৃপা। আমার লেখার উপাদান। ওই রহস্যময় বিদঘুটে রঙের বাড়িটায় লেখার মশলা আছে। দোকানের ওই বিভা নামের মেয়েটা একটা ক্যারেক্টার। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে। ওই পোড়ো বাড়িটায় কয়েক রাত্তির থাকলে কেমন হয়। হয়তো কোনও রাইভ্যাল এসে আমাকে খুন করবে। লাশ ভাসিয়ে দেবে কংসাবতীতে। তা হলে লিখবে কে! ঝট করে আবার জন্মে, তাড়াতাড়ি বড় হয়ে লিখব? নিশি রাত, বাঁকা চাঁদ। কাস্তে দিয়ে গলা কাটছে। ফ্যান্টাস্টিক হয়, যদি বিভার গর্ভে পুনর্জন্ম হয় এক জাতিস্মরের। পরে এই স্টোরিটা হিট যাত্রাও হতে পারে—'নিহত প্রেমিক যখন সন্তান'। বড় বড় নাম না হলে যাত্রার আকর্ষণ বাড়ে না।

মাফলার জড়ানো সুকুমার বললে, 'যাই বলিস, সকালটা খুব সুন্দর! রাতের উৎপাতটার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। এখন মনে হচ্ছে—মনের ভুল।'

'সে সব গবেষণা পরে করা যাবে, আপাতত চা। কোথায় পাওয়া যাবে।'

গোলগাল চেহারার ফুটফুটে এক কিশোর সামনে এসে দাঁড়াল, মাথার টুপি। হাতে একটা লাট্টু। সে আদেশের গলায় বললে, 'দিদি, তোমাদের চা খেতে ডাকছে।'

'দিদি? কোথায় তোমার দিদি?'

'ওই তো, হলদে রঙের বাড়িটা, নিচে দোকান, চলো চলো।'

সূচীপত্রে যান

আশ্চর্য ব্যাপার! সাধন-ভজন ছাড়াই ভগবানের কৃপা। ইচ্ছা হওয়া মাত্রই ইচ্ছাপূরণ। ছেলেটি লাফাতে লাফাতে সামনে চলেছে। আমরা পিছনে। আগাছা ক্রমশই পথের দিকে এগিয়ে আসছে। কিছু দূরেই বাঁপাশে দোতলা বাড়ি। সামনে বারান্দা। অনেকটা গাড়িবারান্দার মতোই। একতলার একপাশে বেশ বড় একটা ঘরে দোকান। মুদিখানা, স্টেশনারি সব একসঙ্গে। মাঝখানে দরজা। বড় বৈঠকখানা। পিছনদিকে অন্দরমহল। অনেক ঘর। দরজায় যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখেই চমকে উঠলুম। ঠিক দেখছি তো! মুখ টিপে টিপে হাসছে। 'এস, অবাক লাগছে! তাই না। পৃথিবীটা ছোট, তাই তো?'

'তোমাদের বাড়ি?'

'হ্যাঁ। আসব বলে আসনি, কিন্তু আসতেই হবে। কারণ, তুমি ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি।'

আমরা ঘরে ঢুকে বসলুম। বেশ সুন্দর, পরিষ্কার ঘর। মেঝেতে কার্পেটের বদলে মোটাকাঠির মাদুর পাতা। একটা বড় চৌকির ওপর মোটা কার্পেট। এধারে, ওধারে চেয়ার। পালিশ করা ছোট ছোট কয়েকটা টেবিল। সুকুমার অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি কীভাবে পরিচয় করাব ভেবে পাচ্ছি না। শেষে এই বললুম, 'সুকুমার, মাধুরী। খুব ভাল মেয়ে।'

সুকুমার নমস্কার করল। বেশ বুঝতে পারছি, আরও কিছু জানতে চায়। যা আমি জানাতে পারব না। একটি মেয়ে ট্রেতে সাজিয়ে শুধু চা নয়, ব্রেক ফাস্ট নিয়ে ঢুকল। সকলেরই বেশ ভাল সাজগোজ। যথেষ্ট সম্পন্ন। এই অঞ্চলটাই তো বনেদি মানুষদের। পূর্বপুরুষরা পর্তুগিজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসিদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বড়লোক। দেশের সর্বত্র তখন নবাবি শাসন। রঙের মিশ্রণ যে ঘটেছিল উত্তরপুরুষদের চেহারায়, তার ছাপ—চোখ, মুখ, নাক, চোয়ালের গঠন, গায়ের রং। মাধুরী শুধু সুন্দরী নয়, সাহসী।

'কী করে জানলে আমরাই এসেছি এই ডাকবাংলোয়?'

'দশ হাত দূরে তুমি আসবে আর আমি জানতে পারব না?'

'কী করে জানলে বলো না!'

'বিভাদি। এখানকার সকলের সব খবর তার কাছে, কেবল নিজের খবরটাই রাখে না।

সূচীপত্রে যান

স্টেশন এলাকাটা খুব সুবিধের নয়, অথচ দোকানটা কেমন চালাচ্ছে! বন্দুক চালাতে জানে। একবার এক মাতালকে অ্যায়সা পিটিয়েছিল, ওই এলাকায় সে আর আসে না। বিভাদি যখন এখান থেকে ফিরে যাচ্ছে, তখন আমার সঙ্গে দেখা হল। তারপর তোমাদের দেখলাম দোতলার বারান্দা থেকে। মনে মনে ভাবছি, ওখানে কেউ রাত কাটাতে চায় না, তোমরা কী করে থাকবে!'

'ঠিকই ভেবেছিলে। ভূত গল্পেতেই থাকে। কাল রাতে অভিজ্ঞতা হল। আবার এই অদ্ভুত সুন্দর সকালে মনে হচ্ছে, হয় তো স্বপ্ন।'

সুকুমার বললে, 'তুই স্বপ্ন ভাব, আজ আর আমি ওখানে থাকছি না।'

মাধুরী বললে, 'তোমরা এই ঘরে থাকবে। আমদের গেস্ট। এই বাড়িতে অনেক ঘর। লোকসংখ্যা কম। কোনও অসুবিধে হবে না। আমরা সবাই মিলে খুব আনন্দ করব।'

সুকুমার এতখানি একটা হাই তুলে বললে, 'আমি এখানে একপাশে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি?'

মাধুরী বললে, 'অবশ্যই! দাঁড়ান, একটা বালিশ এনে দিই।'

ঘরের ভিতরেই আর একটা ছোট ঘর। দরজা খুলে মাধুরী ভিতর থেকে একটা বালিশ এনে দিল। সুকুমার পড়ল কী ঘুমোল। যে মেয়েটি চা, জলখাবার দিয়ে গিয়েছিল, সে এসে সব সরিয়ে নিয়ে গেল। মাধুরী বললে, 'ওই ঘরটা দেখবে চলো।' হাত ধরে হ্যাঁচকা টান।

ঘরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। একটা দেওয়ালে নিজের শরীর দিয়ে ঠেসে ধরে মুখটা তুলে ধরল। ফোঁস ফোঁস করছে—'বদমাশ, আমাকে ভুলে গেছ। ভুলে গেছ, সরলার বিয়ের রাতে চন্দননগরের বাগানের কথা, সারারাত কে জেগেছিল? কে তোমার গল্প পড়ে, সম্পাদকমশাইকে প্রথম চিঠি লিখেছিল! কে কলেজ পালিয়ে দুপুরের শো-এ সিনেমা দেখেছিল! একটা খবর নেই, একটা চিঠি নেই, চিঠি লিখলে উত্তর নেই।' মাধুরীর চোখ উপচে দু'গাল বেয়ে জলের ধারা।

'তুমি শান্ত হও, সব বলছি, তুমি আমার সঙ্গে আছ, হৃদয়ে আছ, কী হয়েছিল বলছি। এখুনি কেউ এসে পড়বে।'

'কেউ আসবে না, এলেই বা কী? দেখুক, সব দেখুক। লেখকরা গল্প লেখে, জীবনের

কথা লেখে না। মিথ্যেবাদী। তাদের গল্পের চরিত্ররা সব বাস্তবের ভূত। তোমার 'সৈকত' গল্পটা পড়ে তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। ভেবেছিলাম, এই লেখককে রুটির মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিজের জীবনটা দিয়ে দেব। মরে যাব, শব হব। তারপর কোন ভাগ্যে জানি না, চন্দননগরের সায়েব বাগানে সরলার বিয়ের রাত। আমি তো তোমাকে সবই দিলাম, তুমি আমাকে কী দিলে? আর একটা গল্প 'নির্জন রাত'। তোমার নাম হয়েছে, তুমি অনেক পাবে। প্রথমার কথা কেন মনে রাখবে!'

বাইরের ঘরে সুকুমারের গলা, 'কোথায় গেলি রে! ওখানে ডি এম এসেছেন, ডাক পড়েছে।'

মাধুরী বললে, 'পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকব।'

বুক ঢিপ ঢিপ করছে। ডি এম-এর সঙ্গে আমাদের কাজের কোনও সম্পর্ক নেই, তবু কেন এই এত্তেলা। কেমন করে চৌকিদার জানল, আমরা এখানে আছি! দ্বিতীয় কারণ, মাধুরী। সৈকতের প্রেমিকা মাধুরী, নির্জন রাতের ভূত মাধুরী, আর এই জীবন্ত, উষ্ণ মাধুরী—কোনটা সত্য! সত্য তো একটাই। রকম রকম হতে পারে না।

ডি এম মানুষটি বেশ ভদ্র, অমায়িক। অনেককে নিয়ে বসে আছেন। তিনিই বলেছিলেন, 'এতকাল উপন্যাসে, লেখায় আপনাদের কথা পড়েছি, আজ সাক্ষাৎ আপনাকে দেখছি। থ্রিলিং।' ভীষণ খুশি। ফের বললেন, 'এতটা কম বয়েস হবে বুঝিনি। লাস্ট পুজোসংখ্যায় আপনার উপন্যাস 'পায়রা' সুপার্ব। হেসেছি, কেঁদেছি, জনে জনে পড়িয়েছি। বলতে পারেন, আমি আপনার ফ্যান। আপনাকে দেখলে আমার মিসেস খুব খুশি হবেন।'

এ খুব স্বাভাবিক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী যেখানে, সেখানে নানা লোক আসবেই, মৌমাছির মতো ভ্যান ভ্যান করবে। ডাক্তার রায় বাংলো নির্মাণ করছেন। চতুর্দিকে কর্মযজ্ঞ। নদীর স্রোতের মতো চতুর্দিকে টাকার স্রোত বইছে। হাঙর, কুমির কপাকপ। জেলার শাসক হাতের কাছে। ভিড় লেগে গেছে। চারপাশে একটাই ধ্বনি 'স্যর স্যর।' স্যর আমাকে বললেন, 'ভিড়টা পাতলা করি। ক'টাকে ভাল করে চাবকাই। তারপর আপনাকে নিয়ে বসব। পিয়োর আড্ডা।'

'আপনিটাকে একটু চেষ্টা করে তুমি করবেন?'

'হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। তুইও হয়ে যেতে পারে।'

ভিড় ঠেলে বাইরে এলুম। বাংলোটা বেশ চমৎকার জায়গায়। বড় বড় প্রাচীন গাছের সারি। রোদ ঝলসানো সকাল। নীল আকাশ। ঝিলমিল নদী। মনের ইচ্ছে, টুক করে গিয়ে বিভাকে একবার দেখে আসি। মনের ইচ্ছে মানুষ কী করবে? না এখন যাওয়া যাবে না। ভীষণ ভিড় হওয়াই স্বাভাবিক এই সময়টায় বাংলোর বাইরে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে এই সব ভাবছি দেখছি, দূরে একটা রিকশা আসছে। আরোহী চেনা চেনা। বিভা! সে আসছে। অসম্ভব। হয় না কি এমন? কেন আসবে?

নামতে নামতে বললে 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

বুকটা ছাঁত করে উঠল। 'তুই।' তার মানে ভীষণ কাছে। মনের ভেতরে। তাই বা কেন? ভোরবেলা এই শীতে ওই দিঘিতে চান করেছে। ভিজে চুল। আলগা করে ফিতে বাঁধা পিঠে ঝুলছে। মিহি শাড়ি, গায়ে সাদা একটা চাদর। মুখটা ভোরের আকাশের মতো উজ্জ্বল। কপালের মাঝখানে চন্দনের ফোঁটা। চা আর খাবার এনেছে।

অবিশ্বাস্য! ভূতের চেয়েও অবিশ্বাস্য। এ পৃথিবীর কোনও মেয়ে অকারণে এমন করতে পারে না। আমার কাঁধে হাত রেখে পাঁচিলের একপাশে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় বললে, 'এক ফোঁটা ঘুমোতে পারিনি। তুই আমাকে কী করেছিস! কী মন্ত্র ছুড়েছিস?'

'বিভা! আমি তোমাতে মরে গেছি। তুমি আমাকে কী করেছ? আমার কী হবে?'

'তার আগে ভাবো, আমার কী হবে? এ কি মরণদশা আমার। এখন সময় নেই। বাজারে গিয়ে এই ফ্লাস্কটা কিনেছি তোমার জন্যে। আগে কচুরি ভেজেছি। সব শেষে চা। গরম আছে। নদীর ধারে গিয়ে চালতা গাছের তলায় বসে খাও। দুপুরে আমার কাছে খাবে। মাছ ধরিয়েছি।'

রিকশায় উঠে চলে গেল। সময় নেই। সময় নেই। সত্যিই সময় নেই। একটা মেয়ে সারাদিন হাসি মুখে কাজ করছে মাথা ঠান্ডা রেখে। কিন্তু কী বলে গেল? এমন হয় না কি?

সুকুমার অসম্ভব গম্ভীর। স্বাভাবিক মেয়েদের মধ্যে ভগবান থাকেন। তা না হলে, এত

আকর্ষণ কেন! এত দিনের পুরনো একটা পৃথিবী। কাতারে কাতারে মানুষ আসছে, যাচ্ছে যেন তীর্থযাত্রীর দল! শেষ পর্যন্ত কেউ কিন্তু বুঝতে পারে না, জীবনের রহস্যটা কী? অলিগলি, রাজপথ। মিলন, বিচ্ছেদ। একপাশে একটুখানি থাকা। হাতে হাত, চোখে চোখ! বাঘের সঙ্গে হরিণ। নীলজলে হাঙরের পাক। আপনজন চায় না। অচেনা পর এসে হৃদয় জুড়ে বসে। বই পড়ে অনেক ফর্মুলা শিখেছি। এটার সঙ্গে ওটা মেশালে ওইটা হয়। ভালবাসার ফর্মুলাটা কী? দুটো হাইড্রোজেন এসে একটা অক্সিজেনের দুটো হাত ধরলেই এক বিন্দু জল। তখন হাইড্রোজেনও নেই, অক্সিজেনও নেই।

নদীর দিকে মুখ করে বসে পশ্চিমের আকাশে আলোর খেলা দেখবে বলে কোনো কালে কেউ পাথরের এই বেঞ্চিটা করেছিল। পা দুটো ঘাসে ডুবে যাবে। সাপ থাকলেও থাকতে পারে। ডানপাশে লম্বা, লম্বা গাছ। সুকুমার নির্বাক বসে আছে আমার পাশে। ওদিকে হইচই। জিপ আসছে, জিপ যাচ্ছে। ভীষণ একটা কাণ্ড চলেছে। অভিযোগ, পালটা অভিযোগ। মরুক গে!

লাল রঙের নতুন ফ্লাস্ক। শীতের সকাল। মিষ্টি রোদ। হিমেল বাতাস। গরম চা। ফিকে ধোঁয়া। কাল রাতের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার পর এই পরিচিত সুখ। গরম চা। পাতার শব্দ। একটা দুটো পাতা এদিকে ওদিকে খসে পড়েছে। টাকা ছাড়াও এত সুখ ছড়ানো রয়েছে এই এতটুকু একটা জায়গায়। কিছুই না, একটা সকাল, চতুর্দিকে সবুজ। রুপো চিক চিক নদীর জল। দূরের ওই পল্লিটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাল রাতে ভূতের তাড়া খেয়ে ওই দিকটায় গিয়েছিলুম। রাতে ওরা জাগে দিনে ওরা ঘুমোয়। ঠোঁটে লাল রং, খড়ি মাখা মুখ। ছাপা শাড়ি জড়ানো শরীর। রাতের জীবিকায় দিনের হাঁড়ি চড়ে। ওদের ছেলেমেয়েরা মাঠে নেমেছে। কলধ্বনি কানে আসছে। বয়স্কা মহিলার কর্কশ কণ্ঠ। পরিচিত গ্রাম্য গালাগাল।

সুকুমার এতক্ষণে কথা বললে, 'কী বুঝছিস?'

'খারাপ লাগছে। খুব খারাপ। জমাট একটা কান্না। ভেতরটা হু হু করছে।'

'কারণ? এত সুখ! একজন নয় দু'জন। দেওয়ার জন্য পাগল।'

'অপাত্রে দান। বিভা জীবন দেখেছে। অনেক বিশ্বাসযোগ্য। খাঁটি। আর একজন বই

পড়েছে, রোম্যান্টিক। প্রকৃত জীবনের খবর রাখে না। আর আমি? আমার কোনও চালচুলো নেই। স্রোতে ভেসে চলা শালপাতার ঠোঙা। আমি মরে গেলে কেউ খবর নিতে আসবে না। অনেক ঘরের একটা ঘরে তালা ঝুলে যাবে। শ্রাদ্ধও হবে কি না সন্দেহ। আমার প্রেতাত্মা আমার পাণ্ডুলিপি ওলটাবে। একজন, দু'জন, যারা আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে, মাঝরাতে ছায়াশরীর নিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব তখন তাদের মুখে দেখব আতঙ্কের ছবি। আমি একটা পাখি। আমার বাসা আমাকেই বানাতে হবে। আমার গানের শ্রোতা ভোরের আকাশ। নিজের দানা নিজেকেই খুঁটে নিতে হবে। আজ পর্যন্ত আমাকে ভালবেসে কেউ একটা দেশলাই কাঠিও দেয়নি। দুর্গাপুজোর সময় একটা জামা-প্যান্ট। ভাল, সে খুব ভাল। নেওয়ার অভ্যাসটাই চলে গেছে। এখন হঠাৎ কেউ কিছু দিলে অস্বস্তি হয়। কেমন যেন বোকা বোকা লাগে।'

একসঙ্গে অনেকটা বলে ফেলে মনে হল, আমি যেন রাস্তার ধারের প্যাঁচকাটা জলের কল। ছ্যার ছ্যার করে জল পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে। না, আর একটা কথাও বলব না। গাছের পাতায় বাতাসের শব্দ শুনব। দূর মাঠে রোদমাখা বালক-বালিকাদের কলরব শুনব। ওরা মূল সমাজের বাইরে। প্রান্তিক। বড় হলে মেয়েরা নামবে দেহব্যবসায়। ছেলেরা কী করবে? কে জানে!

ফ্লাস্কের চা শেষ হল। খুব যত্নে তৈরি। চা-টা খুব দামি নয়, দুধটা খাঁটি। সুকুমার আনমনে কচুরি খেতে খেতে বললে, 'আজ থেকে আমি তোকে খুব ভালবাসব। তোকে ভালবাসা মানে নিজেকেই ভালবাসা। আমরা দু'জনে টাকার এপিঠ, ওপিঠ। আমি কি পেয়েছি বল? জীবনে পয়সাটাই বড় কথা নয়। আমি আমার বাবার সমালোচনা করতে চাই না। আমার মাকে কেন জলে ডুবতে হল? সে অনেক কথা, অনেক কথা। আমি কলকাতার বাইরে চাকরি খুঁজছি। হয়তো পেয়ে যাব। তুই লিখতে পারিস, মেয়েরা তোকে ভালবাসবেই। তাতেই বা কী? প্রকৃত ভালবাসাটা কী? তেমন কিছু বাস্তবে থাকা কি সম্ভব?'

'আমিও সেইরকমই ভাবতুম, কিন্তু, আজ এ কী? লাল ফ্লাস্ক, গরম চা, কচুরি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়!'

'কেন, মাধুরী! ভেতরের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।'

সূচীপত্রে যান

'মাধুরী পেতে চায়, বিভা দিতে চায়। ভালবাসা নেওয়া নয়, দেওয়া। পারস্পরিক দেওয়া। তাইতেই তো পাওয়া। আদান-প্রদান।'

'রাখ, রাখ, থিয়োরি রাখ।'

চৌকিদার আসছে। খড়খড়ে খাকি জামা পরেছে। ফাঁকিবাজ। এখানে আসার পথে বিড়ি ধরিয়েছে। খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'বড় সায়েব ডাকছেন।' আমাদের খাওয়া দাওয়া দেখে একটু অবাক হয়েছে। জিজ্ঞেস করলে, 'এসব? কোত্থেকে এল?'

'সায়েবের বাড়ি থেকে। সায়েব আমার আত্মীয়। মাসিমা এইসব পাঠিয়েছেন। সায়েবকে তোমার সব কথা বলব। কাল রাত্তিরে যা যা করেছ।'

ঠোঁট থেকে বিড়িটা টান মেরে ফেলে দিয়ে বললে, 'এই না, মাইরি না! আমি যাত্রা করি। আমার নাম আছে। চাকরিটা ছোট। মানুষটা ছোট নয়। চাকরি করি কেন? সরকারি বাঁধা মাস মাইনে। পেনশান। চারটে পালা লিখেছি। চারটেই হিট।'

আমার অবাক হওয়ার পালা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করব কি না ভাবছি। অভিনেতা। চৌকিদারের অভিনয়টা কেমন সুন্দর হচ্ছে। আরও অবাক হলুম, যখন বললেন, মাধুরী আমার ভাইঝি। মাধুরীদের বাড়ির পিছন দিকেই বাড়ি। যাত্রার দলের সঙ্গে গ্রামে-গঞ্জে ঘোরার ফলে বিয়ে করার সুযোগ হয়নি। একা। দাদার পরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ভাব নেই। আবার শত্রুতাও নেই।

বড় সায়েব একটা আরাম কেদারায় আরাম করে বসেছেন। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর দিশি সায়েবদের স্বদেশভক্তি হঠাৎ বেড়ে গেছে। মিহি ধুতি, ফিনফিনে পাঞ্জাবি, তার উপর দামি শাল। ঠোঁটে মোটা চুরুট। চোখে সোনার চশমা। অফিসে এই সাজ চলবে না। এখানে আসাটা এক ধরনের বেড়ানো। রথ দেখা কলাবেচা। দুপুরের খাওয়াদাওয়া এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

ধোঁয়া। পোড়া পোড়া গন্ধ। বললেন, 'আমরা তোমার লেখার ভক্ত। আমিও চেষ্টা করি। দায়িত্বের চাপে বেশি দূর এগোয় না, কিন্তু খুব ভাল লাগে। শুনলুম কাল সারারাত এই বাংলোয় ভূতের তাণ্ডব হয়েছে? ভূত বিশ্বাস করা উচিত নয়, কিন্তু করি। শোনো, তোমার

সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে। আশ্চর্য হচ্চ? তোমার ছোটদাদু মহাত্মা সুশীলকুমার আমাদের পরিবারের গুরু। তোমাকে ভীষণ ভালবাসেন। তুমি তাঁর পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দাও। কখনও কখনও একটু লিখে দাও। তিনি মহাসাধক। অশরীরী তাঁর কাছে আসে প্রেত শরীর থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। কান্নাকাটি করে।' চুরুট নিবে গেছে। তামাকের গন্ধ ঘরে ঘুরছে।

ক্ষমতাশালী সরকারি কর্মচারী! তা হলেও মানুষ তো! এবং মানুষটি শিক্ষিত, ভদ্র, ধর্ম বিশ্বাসী। ব্যবধান ক্রমশই কমছে। নানা প্রসঙ্গ আসছে। আলোচনা হচ্ছে। চুরুটের মতো বিরক্তিকর দ্বিতীয় আর কিছু নেই! চুরুটের ধর্ম কী? বারে বারে নিবে যাওয়া।

আবার ধরালেন। বিরাট একটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'জীবনে অনেক দেখা হল, আরও কত কী দেখবে হবে! একটা কথা ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে— পারিবারিক সুখই সুখ! সবাই মিলে আনন্দে থাকা! এটা ধর্মও! তোমার দাদু, আমাদের গুরুদেব সেই উপদেশ, সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। আমরা অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করি! আজ তোমাদের কী কাজ?'

'যা করব, সেইটাই কাজ। ঘুরে ঘুরে বেড়ানো! লোকের সঙ্গে কথা বলা। জীবিকার সন্ধান! মানুষের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা। ছোট ছোট শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য। কী আছে, কী অবস্থায় আছে, আরও কী করা যায়?'

'তা, আমার সাহায্য নেবে না?'

'অবশ্যই, তা না হলে কোনও কাজই তো হবে না।'

'এখানে পড়ে থাকলে তো হবে না। আমার ওখানে চলো। তোমাদের একটা প্রোগ্রাম করে দোবো! আর একটা জিপ চাই।'

'তা হলে?'

'আজ রাতে আমরা ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান করব! মজলিশ। খাওয়াদাওয়া। তোমাদের ভাল লাগবে। ইংরেজরা খুব বড় করে, বিরাট পরিবেশে নিজেদের রাখত। সেইটাই আমরা এখন চুটিয়ে ভোগ করছি। গেলেই দেখতে পাবে। বিরাট কমপাউন্ড। ব্রিটিশ আমলের বড় বড়

গাছ। দুটো বড় দিঘি। চওড়া চওড়া রাস্তা। আবার সরু সরু রাস্তা এক একটা কুঞ্জবনে গিয়ে শেষ হয়েছে। নানারকম বসার ব্যবস্থা। সবুজ লন। দোলনা, ছোট-বড় কামান। যখন কলেজে পড়ি গুরুদেব কোষ্ঠী দেখে বলেছিলেন, তুই খুব বড় চাকরি করবি। আমি বলেছিলুম, অধ্যাপক হব, বিদেশে অধ্যাপনা করব। খুব বকেছিলেন, কেন ভারতবর্ষটা দেশ নয়! ও বাবা, পরে জেনেছি স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তুমি জানো না?'

'জানি। আমাকে একটা পাণ্ডুলিপি দিয়েছেন, দেখে দেওয়ার জন্যে।'

'কই, কই সেটা?'

'বাড়িতে তালাচাবি দিয়ে রেখে এসেছি। হারিয়ে গেলে আস্ত রাখবেন না।'

'ওঁর রাগ আছে?'

'বাপরে! রেগে গেলে ওঁর ফরসা মুখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে যায়। তবে আমার ওপর কোনওদিন রাগেন না।'

'কেন?'

'আমার মাকে বাঁচাতে পারেননি।'

'তোমার মা নেই?'

'অনেক ছেলেবেলায় মারা গেছেন। মাকে আমার স্পষ্ট মনে নেই। টুকরো টুকরো কয়েকটা ঘটনা ছাড়া!'

'স্যাড, ভেরি স্যাড। ওঁর কাছে তো সাধক বামদেবের কৃপা ছিল!'

'থাকলে কী হবে, আমার বরাত।'

'তা ঠিক, বরাত, গ্রহ!'

'ছোটদাদু, অবশ্য বলেন, নিজে সাধন ভজন করলে বরাতকে টপকে যাওয়া সম্ভব। আমাকে বলেছেন, যে চাকরিটা করছিস, এটা তোর নয়, তোকে শ্মশানে সাধন করাবই। আমার উত্তরাধিকার।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'আমি অনেক কিছু দেখতে পাই, বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা নেই।'

সূচীপত্রে যান

'রাখো তোমার বিজ্ঞান! বিজ্ঞানকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে! বিজ্ঞান এখন জ্ঞানের সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে আছে।'

'এই দেখুন না, আমাকে একটা ক্যাটস আই পরিয়ে দিয়েছেন।'

'কী হয়?'

'যত্রতত্র অশরীরীদের দেখা বন্ধ হয়। এমন হয়েছিল, রোজ খাট থেকে টেনে ফেলে দিত।'

'কে ফেলে দিত?'

'বলশালী কেউ! আমার বাবা এসব বিশ্বাস করেন না! তিনি বললেন, অনেকেই খাটটাকে গড়ের মাঠ ভেবে এই ধরনের বিপদে পড়ে। তোমার মেঝেতে শোয়াই সেফ। খাট সহ্য হচ্ছে না।'

'ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার।'

'বিজ্ঞানী। আর্মি ডিসিপ্লিন ফলো করেন। ভেরি স্ট্রিক্ট। দুর্জয় সাহসী। আদর্শবাদী। মিথ্যে কথা সহ্য করতে পারেন না। বছরে একবার পাহাড়ে বেড়াতে যান। যত কঠিন পাহাড়ই হোক তিনি উঠবেনই উঠবেন।'

'সুযোগ পেলে আলাপ করব।'

'আমরা তা হলে রেডি হই।'

'একটা ব্যাপারে একটু সাবধানে করি—এখানকার মেয়েরা খুব অ্যাগ্রেসিভ, বোলড! পজেসিভ। দেখতেও সুন্দরী। বিদেশিদের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল এক সময়। রক্তে মিশ্রণ ঘটা স্বাভাবিক। তাই রূপসি। পরিবারে, পরিবারে মেয়েদের আধিপত্য। লেখাপড়ায় ভাল। ক্রিয়েটিভ। ছবি আঁকা, গান, সাহিত্য, হাতের কাজে পারদর্শী।'

'আমাদের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক?'

'তাদের সঙ্গেই সম্পর্ক! কয়েকদিন ঘোরাফেরা করলেই বুঝতে পারবে। ভীষণ মিশুকে, সেই সঙ্গে ইত্যাদি, ইত্যাদি। একটু পরেই একটা ভ্যান আসবে। স্টেশনের গায়ে একটা খাবারের দোকান আছে, সেখানে একটা মেয়ে আছে—বিভা—প্রথমে তাকে তুলবে।'

'তাকে কেন?'

'ওর রান্না খেলে বুঝতে পারবে—কেন বিভা? মেয়েটা এত কাজের, দায়িত্ব দিলে একটা রাজ্য চালাতে পারে! দেবীশক্তি! মাঝে মাঝে ভাবি—ও একটা জ্যান্ত বিগ্রহ। একথা আমি সকলকে বলতে পারি না। বলা উচিতও নয়। কে কী ভাববে! তুমি আমার কাছের লোক। তোমাকে লোক বলতেও ইচ্ছে করছে না, কাছের ছেলে! কী বলব? আত্মীয়। সমস্যাটা কোথায় জানো, আমার এই পদ। নকল ব্যক্তিত্ব। যা ভাবব তা বলতে পারব না। তোমার লেখা পড়ে মনে হয়েছে— মেয়েদের ব্যাপারটা তুমি বেশ ভালোই বোঝো। না, না, এতে দোষের কিছু নেই। মায়ের বুকে মাথা রাখলে মনে একরকমের ভাব আসবে, প্রেমিকার বুকে মাথা রাখলে আর একরকম। নাথিং রং। ভালবাসা? হোয়াটস দ্যাট? এক্সপ্রেস করা যায় না, যায় না, যায় না। একটা ফিলিংস।'

সায়েব কিছুটা উত্তেজিত! সুকুমার অনেক আগেই উঠে গিয়েছে। সায়েব লম্বা বারান্দায় পায়চারি করছেন! হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'আমাকে কি তোমার কিছুটা থিয়েট্রিক্যাল, ইমোশানাল মনে হচ্ছে?'

চুপ করে আছি।

নেবা চুরুটটা দু'আঙুলের ফাঁকে। 'তুমি কোথায় ছিলে যখন এক গাদা হেঁজিপেঁজি সমস্যা নিয়ে ওই লোকগুলো এসেছিল, ইম্পোটেন্ট, অ্যাডিক্ট! কেউ ভায়ের বউয়ের সঙ্গে থাকে, কারও মেয়ের বয়সি মেয়ে রক্ষিতা! এখানকার পুরুষগুলো এই রকম, আর সুন্দরী, সুন্দরী মেয়েরা লাভ লোর্ন, লাভ সিক। আমি কী রকম নাটুকে গলায় বলছিলুম, নায়ারণ, নায়ারণ, তুমি খুব বেড়েছ, এইবার তোমাকে সাইজ করব। এই নায়ারণ একটা ক্যারেক্টার। যত রকমের পাপ কাজ আছে, সব করে। বাইরে নির্ভেজাল ভদ্রলোক। বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে! বহু পরিবার শেষ করেছে। তুমি অশরীরী ভূত দেখেছ, নায়ারণ ইজ আ লিভিং ভূত। র‍্যাসকেল বিভাকে টার্গেট করেছে। আই উইল কিল হিম। কফি, আমরা এখন কফি খাব।'

অনেক সাধ্য সাধনায় চুরুটটা ধরল। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কী? কী মনে হচ্ছে তোমার? আমিও একটা ক্যারেক্টার! দেয়ার ইজ অ্যানাদার ম্যান, স্ট্রেঞ্জ, মিস্টিরিয়াস। বিভার ঘাড়ে চেপে বসে আছে। বিদেশি। নিজেকে বলে ফকির। লোকটা স্পাই। আমি পুলিশকে বলেছি নজরে রাখতে।'

সূচীপত্রে যান

'এখানে এমন কী খবর আছে? ওই তো একটা নদী, শ্মশান, কবরখানা, ইতিহাস জর্জরিত পোড়ো বাড়ি কয়েকটা, ভূতুড়ে নীলকুঠি।'

'কী বলছ তুমি? এটা পশ্চিম বাংলার সেন্টার। একটা বিদঘুটে জায়গা। ওই ফকির এখানে কেন? কেন ওই দোকানটাতে ঘাঁটি করেছে! বিভার ভাই নেহাত ভালমানুষ। ও বিভাকে বিয়ে করতেও দেবে না, তা হলে ও না খেয়ে মরবে। আর দোকানের পজিশনটা ভীষণ লোভনীয়। মৃত্যুর থাবা উঁচু হয়ে আছে। আই মাস্ট ডু সামথিং ফর বিভা! আমার এই দুর্বলতার কারণটা কী? ইজ ইট আ স্পেল?'

জিপগাড়ি। শক্তিশালী ইঞ্জিন। শব্দ তো হবেই। পিছন দিকে বেশ ছড়িয়ে বসা যায়। রাস্তার অবস্থা ভাল না হলেই বেমক্কা লাফাবে। সুকুমার সামনে চালকের পাশে বসেছে। একেবারেই কথা বলছে না। মনে হয় আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। খুব স্বাভাবিক। আমাকে নিয়ে একটু বেশি আদিখ্যেতা হচ্ছে। তা আমি কী করব! কে কাকে ভালবেসে ফেলবে, ভগবানও মনে হয় জানেন না। আর এই কর্মের জগতে ভালবাসা একটা বাজে ব্যাপার। ন্যাকামি, ভণ্ডামি ইত্যাদি। ভালবাসা না বলে ভাললাগা বললে কিছুটা সামাল দেওয়া যায়।

বিভা আর আমি পিছনে বসেছি। সে বসিয়েছে। 'পেছনে, পেছনে' বলে উতলা না হলেই পারত। লক্ষ করেছি—সুকুমারের ভুরুটা কুঁচকে আবার ঠিক হয়ে গেল। আমিও তো এইরকম বলতে পারি, কলেজে স্নিগ্ধা কখনওই আমাকে পাত্তা দেয়নি। ধীরাজকে নিয়ে মেট্রোয় সিনেমা দেখতে গিয়েছে। অনাদিতে মোগলাই খেয়েছে। আমি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে দেখেছি। কী করব? ধীরাজ আমার বন্ধু। আজও বন্ধু। স্নিগ্ধা তার বউ। এখনও একটা উপেক্ষার ভাব। আমাকে পছন্দ করে না। আমি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদব? এখন আমার দিন ফিরেছে। মেয়েরা ভালবাসলে জীবনটা বেশ ভরাট লাগে। গাছে ফুল এলে গাছের যেমন লাগে। বালতিতে জল না থাকলে, খালি বালতি ফংফঙে। ধাক্কা লাগলে উলটে গড়াতে থাকে। সুকুমারের মনটা ব্যবসাদারের মন। ওর বাবার বড়বাজারে ব্যবসা আছে। খালি হিসেব আর হিসেব। জীবনানন্দের কবিতা পড়েনি। বিভূতিভূষণ পড়েনি। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাল লাগে না। পূর্ণিমার রাতের সৌন্দর্য বোঝে না। এতটুকু রোম্যান্টিকতা নেই। সামনের আসনে গাবদা মেরে বসে আছে। মনে হয় ঘুমোচ্ছে।

শীতকালের মিঠে রোদ। বিভাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। ভাল একটা শাড়ি পরেছে। হালকা নীল রং। নীল রঙের শাল। এতটুকু সাজেনি! এলো খোঁপা ফিতে দিয়ে বাঁধা। চওড়া পিঠের উপর পড়ে আছে। মনে হয় যোগাসন, প্রাণায়াম, এইসব নিয়মিত করে। আমিও করি। ছোটদাদু আমাকে শিখিয়েছেন। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে আমাকে বসাবেন। এই তো বাঁ দিকের রাস্তাটা সোজা তারাপীঠে চলে গিয়েছে। ছোটদাদুর আশ্রম। মন্দিরে বামদেবের বিশাল মূর্তি। তাঁর কুকুরটিও আছে। ওদিকে তারা মায়ের মন্দির। পিছনে অনেকটা নীচে দিয়ে বহে যাচ্ছে দ্বারকা নদী। বিভাকে নিয়ে যাব। ওকে নিয়ে কত কী করব—ভেবে পাচ্ছি না। পৃথিবীর বাইরে চলে যাব। চাঁদে একটা কটেজ করব। পাগল!

কখনও কোনও মেয়ের এতটা কাছে বসিনি। তাও আবার বিভার মতো মেয়ে। শরীরে শরীর লেগে আছে। উত্তাপ অনুভব করছি। আড়চোখে তাকিয়ে কাঁধের গোল গঠন দেখেছি। আরও কিছু। এইভাবে বসে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়। জীবনের কোনও অভাব-অভিযোগের কথা মন থেকে কোথায় কোন দূরে ভেসে চলে যায়। আত্মীয়স্বজনের সমালোচনা, বিরূপ মন্তব্য খড়কুটোর মতো হয়ে যায়। একবার দেখেছিলুম রাজপথের উপর দিয়ে বন্যার জল ছুটে আসছে। এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলুম জীবনের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। সে-ও একটি মেয়ে—কুসুম, আমার হাত খামচে ধরে ছুটতে শুরু করল 'পালা, পালা।' লক্ষ্মীদার গ্যারাজের ছাতে একটা মই বেয়ে উঠে পড়েছিলুম, আমি আর কুসুম। পরমুহূর্তেই জল আছড়ে পড়ল। মইটা কিছু দূর ভেসে গিয়ে বেখাপ্পা আটকে গেল। খালি তেলের ড্রাম, কাঠের টুল ভাসতে ভাসতে চলে গেল। মনে আছে আটাত্তর সাল। যেখানে যত খানাখন্দ, গর্ত ছিল সব জলে ভরে একাকার। শহরটা ছিল একতলা, উঠে গেল দোতলায়। ভয় পরিণত হল বিস্ময়ে। প্রেম এইরকম এক প্লাবন। অতীত আর ভবিষ্যতের দিকের দরজায় খিল তুলে দিয়ে বর্তমানের কোল পেতে দেয়। সেই কোল আমার পাশে। নীল শাড়ির অন্তরালে। বিভা আমার ডান হাতটা সেইখানে টেনে নিয়ে তার উপর নিজের একটা হাত রেখেছে। সেই হাতের চাপ কখন বাড়ছে, কখনও কমেছে। আবেগের ভাষা আমি বুঝতে শিখেছি। পূর্ব, পূর্ব, পূর্ব জীবনই গুরু। অনেক কথা সরাসরি মুখে বলা যায় না। সত্যি কথা বলতে কী—ভাষার

অনেক অক্ষমতা। প্রকৃত কথা শ্বাসে-প্রশ্বাসে, আকারে, ইঙ্গিতে, দৃষ্টিতে, স্পর্শে, আলিঙ্গনে, চুম্বনে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, শেকসপিয়ার, বায়রনের পাশাপাশি এইসব আমি প্রচুর পড়েছি। প্রথম কয়েক হাজার বছর মানুষের তো কোনও ভাষা ছিল না, শব্দ ছিল। বাঘ, ভাল্লুক, বেড়াল, শেয়াল শব্দ করছে, মানুষও শব্দ করছে। সমুদ্রের ঢেউ ভাষা ভাষা, বাতাসের পত্রালাপ।

গাড়ি অনবরতই লাফাচ্ছে, আর তখনই খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার হাত যুগলবন্ধনে কোলের কোন গভীরে, কত গভীরে কোন রহস্যময় তলে তলিয়ে যাচ্ছে। হাতা, খুন্তি, বাসনকোসন পেটিতে আবদ্ধ থাকলেও ধাতব শব্দ ছাড়ছে। হঠাৎ একটা গানের সুর ভেসে এল:

'এমন স্বপ্ন কখনও দেখিনি আমি।
মাটিতে যে আজ স্বর্গ এসেছে নামি।'

বিভার ফরসা অনামিকায় একটা আংটি। গাঢ় নীল রঙের জ্বলজ্বলে পাথর। এমন নীল পাথর আগে দেখিনি। ভয় করে। রহস্যময়। জিজ্ঞেস করলুম, 'ফকির সায়েব, গোলাপবাবা?'

'না, না, আমার মায়ের।'

'রংটার ভেতর একটা ভয় আছে!'

'সেই জন্যেই তো পরে আছি। দেখি না কী হয়!'

'কী হচ্ছে?'

'এই যে দু'জনে বসে আছি। কে ভেবেছিল!'

'তুমি কি জানো?'

আমার ইঙ্গিত ধরে ফেলেছে। সাংঘাতিক ইন্টেলিজেন্ট। আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বললে, 'সব জানি। মেয়েদের মনের ভেতর আর একটা মন থাকে।'

'তা হলে?'

'তাই তো তুমি সন্ধেবেলা ট্রেন থেকে নামলে।'

'সবাই বলে—।'

'আমি সবাইয়ের মধ্যে পড়ি না।'

'ফকির সায়েবকে সন্দেহ করে।'

'চেনে না তাই। গোলাপবাবার ক্ষমতা আমি জানি। গতকাল রাতে তুমিও কিছুটা বুঝতে পেরেছ।'

'পেরেছি। মানুষটি সহজ নয়। সাধক না হলে সাধককে বোঝা যায় না।'

আমাদের বাঁ দিকে সুন্দর একটি কালীবাড়ি। বহু ভক্তের ভিড়। গাড়ির গতিবেগ কমল। উর্দি পরা চালক বললেন, নামবেন নাকি? আজ শনিবার। মাকে প্রণাম করা উচিত। চালকের নাম, মতিলাল। গাড়ি একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে ফাঁকা জায়গায় থামল। বিভা নামতে নামতে বলল, 'মা খুব জাগ্রত। পেছন দিকে একটা গুহা আছে। অনেক আগে কাপালিকরা ওখানে নরবলি দিত। সায়েবরা এসে ওই সব বন্ধ করে। মন্দিরের পূজারি কাপালিকেরই বংশধর। চেহারা দেখলে আঁতকে উঠবে। তোমাকে নিয়ে একদিন ওই গুহায় ঢুকব।'

'কেন বলি দেবে? আমি তো বলি হয়েই গেছি।'

'একটু বাকি আছে। ওই গুহার মধ্যে একটা পাথরের স্ল্যাব আছে। সাদা পাথর মানুষের রক্তে লাল হয়ে গেছে। ওই গুহায় আমরা সাধন করব। আমি তোমার ভৈরবী।'

বেশ ভিড়। সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম দু'জনে। কাঁধে কাঁধে ঠেকে আছে। সমান উচ্চতা। মনে হচ্ছে, সদ্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী আমরা। মাকে পুজো দিতে এসেছি। পূজারি আমাদের কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলেন। সত্যিই সাংঘাতিক চেহারা। ছ'ফুটের উপর লম্বা। লাল চেলি। কপাটের মতো চওড়া বুক। সোনায় বাঁধানো গোটা গোটা রুদ্রাক্ষের মালা। চোখ দুটো লাল। গম্ভীর গলা। তারা মূর্তি। সত্যই জাগ্রত। সুকুমার বেশ কিছুটা দূরে। মাকে প্রণাম করছে। মতিবাবু সাষ্টাঙ্গে পড়ে আছেন।

বিভা আমার কানে কানে বললে, 'সেই লোকটা, নায়ারণ। খুনি। দাঁড়িয়ে আছে। কোনও মতলব আছে।'

পাতায় মোড়া প্রসাদ, জবা, বেলপাতা নিয়ে আমরা গাড়িতে উঠলুম। মতিবাবু ভক্ত মানুষ। চোখে জল। ধরা ধরা গলায় বললেন, 'মা আমাকে কতবার কতভাবে রক্ষা করেছেন! মা, মা!'

সূচীপত্রে যান

দুই

এদিকে জাঁকিয়ে শীত পড়ে। মাইল কুড়ি দূরে পাহাড়। পাহাড় টপকালেই অরণ্য। নদীর আঁকিবুকি। বর্ষায় ভরভরন্ত, শীতে ছিপছিপে। মা যেমন তার শিশুটিকে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখে, বিভাও আমাকে ঠিক সেইভাবে রেখেছে। বাতাস খুব ঠান্ডা। ফরসা কপালে হোমের টিপ। কী সুন্দর দেখাচ্ছে। এরকমও ভাবছি, আমার ভাগ্য কেন এত ভাল? আমি কী এমন সৎকর্ম করেছি? একেবারে অচেনা, অজানা একটি মেয়ে কেন আমাকে এমন ভালবাসল? যেন জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। বহু যুগের পরিচয়। হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া একটি রত্ন। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসা। অবাস্তব ঘটনা। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া, কিন্তু। একটা কিন্তু দৈত্যের মতো সামনে দাঁড়িয়ে। এর পরে কী হবে?

গাড়ি যত এগোচ্ছে রাস্তা তত খারাপ হচ্ছে। গাড়ির দুলুনিতে মাঝে মাঝে আমরা পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে পড়ে যাচ্ছি। অনেক ছেলেবেলায় আমার মা মারা গিয়েছেন। তাঁর কিছুই আমার মনে পড়ে না। ওলন্দাজ আমলের একটা ভূতুড়ে বাড়িতে একা একাই বড় হয়েছি। একজন রাঁধুনি। সম্ভবত ছিটগ্রস্ত। এক ধরনের ফল আছে—'কুচলা।' ছোট ছোট চকচকে দানা। ফলের বীজ। এইদিকেই হয়। খেলে খুব নেশা আর খিদে হয়। শরীরে অসুরের বল আসে। ছেলেবেলার সেই রাঁধুনি 'কুচলা' খেত। যেমন চেহারা, সেইরকম মেজাজ। দু'জন কাজের লোকও ছিল। তারা ভয়ে ভয়ে থাকত। বেশি ঢ্যাঁটামো করলেই ধোলাই, তবে যেমন কাজের, সেইরকম তার হাতের রান্না, সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভাল শাড়ি। শনিবার শনিবার রিঠা দিয়ে চুল পরিষ্কার করত। মাথায় খুব চুল ছিল। কালো কুচকুচে, সামান্য কোঁকড়া, সাজতে-গুজতে ভালবাসত, খোঁপার বাহার! সুন্দর সুন্দর খোঁপা। পাড়ার আইবুড়ো মেয়েরা বিকেলবেলায় খোঁপা বাঁধাতে আসত। তাদের কথাবার্তায় অনেক আকার-ইঙ্গিত, ধাঁধা থাকত। কী যেন কী বলাবলি করত, সেই বয়সে ঠিক বুঝতে পারতুম না। এখন বুঝি। সেইসময় রক্ষণশীল পরিবারের উঠতি বয়সের মেয়েদের দেহবোধ কীভাবে জাগত!

সেই মহিলার শরীরের বাঁধুনি ছিল আশ্চর্য রকম সুন্দর। মেয়েদের দিকে অবাক হয়ে

সূচীপত্রে যান

তাকাবার চোখ নিয়েই পুরুষরা জন্মায়—এইরকমই আমার ধারণা। একটু বড় হলে আসে নিয়ন্ত্রণ। উচিত, অনুচিত বোধ। এক ধরনের লজ্জা। মনে এক অভিভাবক এসে হাজির হয়। সাবধান করে। তখন একটা ছটফটানি তৈরি হয়। আলো আর পতঙ্গ। হয় সরে থাক, নয় পুড়ে যাও।

সে রোজ আমাকে স্নান করাবার জন্যে টানতে টানতে কলঘরে নিয়ে যেত। দু'জনেই চান করতুম। একটা ছোবড়ায় সাবান মাখিয়ে আমার সর্বাঙ্গে ঘষত। তারপর আমাকে বলত, 'আমার পিঠ ঘষে দে।' তখন সে অর্ধনগ্ন। ভীষণ ভয়। জলে থেকেই জল তেষ্টা পেত! কোনও কোনওদিন সে আমাকে তার বুকে চেপে ধরে বলত, 'আমাকে মা বল, মা বল।' ভুলেই গিয়েছি, একটা গাড়িতে আমি বিভার পাশে বসে আছি। হঠাৎ বেশ জোরেই বলে ফেলেছি, 'হবে হবে।' বিভা অবাক হয়ে বললে, 'কী হবে?' হেসে বললুম, 'অসম্ভব সম্ভব হবে।' বিভা বললে, 'মনের জোর থাকলেই হবে। সাহস চাই। ভিতুদের কিছু হয় না।'

কী হওয়ার কথা বলছি, বিভা বুঝবে কেমন করে। ওই অদ্ভুত মেয়েটিকে আমার আদর্শবাদী বাবা সহ্য করেছিলেন। কত রটনা, কত কুৎসা! তিনি মুখের উপর বলতেন, 'আমার মা-মরা ছেলেটাকে তোমরা দেখবে?'

'তা হলে বিয়ে কর।' সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।' 'সামাজিক বিধান।' আমি সমাজের বাইরে। সাহস পেত না দুটো কারণে, বিশাল বড় চাকরি করতেন। দ্বিতীয় কারণ, তন্ত্র সাধক। আমার ছোটদাদুর সঙ্গে শ্মশানে শব সাধনা করতেন। অনিমা, লঘিমা, অষ্ট সিদ্ধি তাঁর করতলগত। নিজে দেখেছি, কাচের ভারী পেপারওয়েট শোলার মতো হালকা করে দিয়েছেন। সেই বন্য মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে আধুনিকা করেছেন। সাজ-পোশাক, চালচলন একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। জর্জেটের বেগুনি রঙের শাড়ি পরে সামনে এসে দাঁড়ালে যুবরাজেরও মাথা ঘুরে যাবে। ঈশ্বর স্রষ্টা, আমার পিতা নির্মাতা। কী তাঁর তৃপ্তি! তান্ত্রিকের চোখে নারী হল শক্তি। শুভ আর অশুভ দু'রকমই হতে পারে। একটা সময় এল, যখন আমি তার সামনে থেকে ভয়ে সরে যেতুম। এত আলো সহ্য হত না, একদিন ছোটদাদু বিবাহের কথা তুললেন। অদ্ভুত স্পষ্ট উত্তর—আমি একজনকেই ভালবেসেছি, তার সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করেছি, বিয়ে তো একটা প্রথা, একটা অনুষ্ঠান, নাই বা হল।

সূচীপত্রে যান

এই আলোচনায় আমি উপস্থিত ছিলুম না। পাশের ঘরে পরীক্ষার পড়া চলছে। কানে এল। পাঁচরকম বই পড়ে বুদ্ধিতে গাঁট ধরেছে। জেমস, জয়েস লরেন্স। মনে একটা শব্দ জাগল—'কাম', প্রথম রিপু—সেটা যাবে কোথায়? তার পরে অবাক হয়ে দেখলুম—কামনা রূপান্তরিত হতে পারে 'পূজায়', 'উপাসনায়।' এই বিভা আমার পিতার একটি বিষয় হতে পারে। হবেই। একটা চ্যালেঞ্জ। বয়স হয়েছে তাঁর। মনের দিক থেকে অদম্য যুবক। অদ্ভুত একটা আবেগে বিভার হাতটা মুঠোয় চেপে ধরেই, ছেড়ে দিলুম। অদ্ভুত চোখে তাকাল।

ডানদিকের রাস্তা থেকে সাদা রঙের একটা অ্যাম্বাস্যাডার বেরিয়ে এসে বাঁক নিয়ে আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। পিছনের কাচে চোখ পড়তেই চমকে উঠলুম—কোনও সন্দেহ নেই—ছোটদাদু। কোথায় যাচ্ছেন? গাড়িটা আমাদের আগেই বাংলোর গেট পেরিয়ে ভিতরে অনেকটা দূরে চলে গেল। এইবার কী হবে? বিভার দুল পরা পাতলা কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললুম, 'ছোটদাদু!' 'দেখেছি।' 'কী হবে?' 'খুব আনন্দ হবে।' আমার রান্নাও ভাল হবে। যেই ভাবব গুরুসেবা, অমনি সবকিছুর স্বাদ পালটে হবে প্রসাদ। সারাদিন গান, গল্প, হাসি। দিনটা হয়ে যাবে উৎসব। আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।'

রাজার জাত ইংরেজ। খুব বড় করে বাঁচায় অভ্যস্ত ছিলেন। বিশাল বিশাল ঘর। চওড়া বারান্দা। বড় বড় জানলা, বিশাল বিশাল দরজা। আমরা ঢুকে দেখলুম, ছোটদাদু বিশাল একটা সোফায় বসে আছেন। অরুণবাবু তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকছেন। আমি আর বিভা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছি। অতবড় অফিসার। আমরা অনেক নিচের ধাপের মানুষ, ছোটদাদু আমাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর বিখ্যাত হাসিটি হাসলেন, 'আশ্চর্য হইনি হে! তোমাদের দেখা পাব জানতুম।' বিভার নামটা তিনি উলটে দিয়েছিলেন। বলতেন, 'ভাবি।' নামটা আমারও খুব পছন্দ হল। ছোটদাদু বললেন, 'তোমরা তোমাদের কাজে চলে যাও। একটু পরে আমি আসছি তোমাদের কাছে।'

আমরা আবার জিপে উঠলুম। অনেকটা ভিতরে আর একটা ব্লকে যেতে হবে। সেখানে কিচেন, প্যানট্রি, ওয়াশরুম, লন্ড্রি, বেকারি, সোডা ওয়াটার প্ল্যান্ট, স্টোর, সেলার। অতীতে এই সব ছিল। খুব দূর অতীত নয়। ইচ্ছে করলে সামান্য ঠিকঠাক করে আবার চালু করা যায়, কিন্তু এখন কিং, কিংডাম নেই। আর বিভা নয়, নতুন নাম পেয়ে গিয়েছি। ভাবিকে

জিজ্ঞেস করলুম, তোমার তো কত কাজ, আমি কী করব সারাদিন।' রান্নার জায়গাটা আমি সাজিয়ে গুছিয়ে নিই, আমার মতো করে। মেনুটা ঠিক করি। বাজার কী হয়েছে দেখি। তোমরা ততক্ষণ সব ঘুরে ঘুরে দেখে নাও। এখনও বেশ রোদ আছে। শীতকাল। তিনটের পরেই আলো কমে যাবে। একটু সাবধান করে দিই, পশ্চিমদিকে একেবারে শেষ মাথায় বিরাট একটা শুকনো পাতকো আছে। ধারে কাছে যাবে না। পরে বলব, কেনও যাবে না।' সুকুমার বললে, 'খিদে পেয়েছে যে, কী করব? বাইরে তো কোনও দোকানপাট নেই।' 'তোমরা ওই লনে গাছের ছায়ায় বোসো। দেখি কী করা যায়।'

জমাটি গল্পের আসর। মোটা কার্পেটের উপর নরম গদি। ছোটদাদু আজ খুব খুশি খুশি মেজাজে। কোলের উপর তাকিয়া। মুখে পান। তিন-চার রকেমের জর্দার কৌটো তাঁর পাশে একটা ট্রের উপর। মুখার্জিসাহেব গায়ে বেশ দামি একটা শাল জড়িয়েছেন। ডাক্তার পাকড়াশী মোটা একটা চুরুট ধরিয়েছেন। পুলিশ বিভাগের বড়কর্তা শঙ্কর সান্যাল, আইপিএস, সামান্য অন্যমনস্ক। এদিকে হঠাৎ চুরি আর ডাকাতি দুটোই বেড়েছে। বিহার থেকে আসছে, রোজ রাতে। বিজ্ঞানী বিপুলবাবু এসেছেন। কয়েকদিন পরেই আমেরিকা যাবেন। এক মাস ধরে তাঁর বাংলোয় বিশ্রী একটা উৎপাত শুরু হয়েছে। মাঝরাতে শোয়ার ঘরে কে মুঠো মুঠো ছাই, কাঠকয়লা, হাড়ের টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মশারির চালে, টেবিল, চেয়ার, কার্পেটে। সাহসী, খুব সাহসী। ভয় পাননি, ভীষণ বিরক্ত। এটা কী ধরনের অসভ্যতা! ছোট দাদুকে বলছেন, 'আমি ভয় পাব না, তবু আমাকে ভয় পাওয়াবার চেষ্টা!'

ছোটদাদু বললেন, 'ভয় পান না কেন? আপনার ব্রেন পার্শিয়্যালি কাজ করছে। গায়ে পিঁপড়ে উঠলে বুঝতে পারেন?'

'না।'

'একটা কানে কম শোনেন?'

'হতে পারে।'

'আজ দুপুরে এখানে একটা কাণ্ড ঘটেছে। ওই যে ছেলেটি বসে আছে, আমার নাতির সহকর্মী। ও মারা যাচ্ছিল অপঘাতে। ঘটনাটা আমার নাতির মুখে শুনুন।'

'কম্পাউন্ডের পশ্চিম দিকে, একেবারে শেষ মাথায় বিশাল একটা ইঁদারা আছে। খুব উঁচু

বাঁধানো পাড়। ভিতরে জল নেই, কিন্তু অনবরত জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। অদ্ভুত রহস্য!'

বিপ্লববাবু বললেন, 'সবেতেই তোমাদের আশ্চর্য লাগে। এর কারণ জানো? অজ্ঞতা, অজ্ঞতা। ভূপৃষ্ঠ স্তরে স্তরে সাজানো। একটার পর আর একটা। তাকের মতো থাকে থাকে। এই হল ভূস্তর। একটু দূরেই অন্তঃসলিলা নদী। বালি খুঁড়লেই কাচের মতো জল। ইঁদারার পাশেই কোনও স্তর দিয়ে ঝরে পড়ছে। অবরোধের কারণে ইঁদারায় জল ঢুকছে না।'

এইবার সিদ্ধসাধক কী বলেন! সবাই উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর মুখের দিকে। হাসতে হাসতে বললেন, 'বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের বাইরে অনেককিছু আছে, যা আমরা জানি না। শোনো তা হলে, ওটা ইঁদারার মতো দেখতে। কিন্তু ইঁদারা নয়।'

'তার মানে?'

'ওটা একটা গহ্বর। একশো বছর আগে এখানে এক শৈব সাধক ছিলেন, অবশ্যই তান্ত্রিক। এসেছিলেন কাশ্মীর থেকে। ওইখানে ছিল একটি শিবলিঙ্গ। তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল একটি সম্প্রদায়। একদিন, সেদিন ছিল শিবচতুর্দশী। সাধক তৃতীয় প্রহরের পূজা করছিলেন। হঠাৎ শিবলিঙ্গ আর সাধকের পাতাল প্রবেশ হল। পড়ে রইল বিরাট এক গর্ত। তাঁর শিষ্যরা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গুরুকে উদ্ধার করতে পারেননি।'

বিপ্লববাবু বললেন, 'ভূমি ধস হতেই পারে। এদিকে ছোট-বড় অনেক টিলা আছে। পাহাড় হওয়ার চেষ্টা করে থমকে আছে। এখানে ভূমিতল চঞ্চল, অশান্ত।'

ছোটদাদু বললেন, 'কাহিনি শেষ হয়নি এখনও। দশ বছর পরে সেই সাধককে দেখা গেল কেদারে। তিনি আর নীচে নামলেন না। কেদারকে বলা হয় দ্বিতীয় বারাণসী। ভারতে যত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ শিব আছেন, প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির শেকড়ের যোগ আছে।'

'সেটাও মানা যেতে পারে। শিলাস্তর সেই ভাবেই ছড়িয়েছে, তবে সাধকের কেদারে আবির্ভাব, গাঁজাখুরি গল্প। ভগবানের আরাধনা করুন, করতেই পারেন, দয়া করে অলৌকিক গল্প ফাঁদবেন না। শিক্ষিত মানুষ নেবে না।'

হঠাৎ বিপ্লববাবুর মাথার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠল। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ছোটদাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল? শরীর খারাপ লাগছে?'

অনেক চেষ্টার পর বলতে পারলেন, 'দেখলেন না! বিরাট বড় কালো একটা কুকুর এই

দরজা দিয়ে ঢুকে ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল!'

'কী, যা-তা বলছেন! কত বড়?'

'প্রায় একটা ঘোড়ার সাইজ।'

'এই অঞ্চলে সেন্ট বার্নার্ড কারও নেই। হঠাৎ কুকুরই বা আসবে কেন? আপনি একবার দেখে আসুন না। ওদিকেই তো রান্নাঘর। অনেকে আছে! অরুণ তুমি কুকুর পুষেছ না কি?'

'না, ও ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই।'

'তা হলে? প্রফেসর হ্যালুসিনেশনে ভুগছেন। আচ্ছা, আপনি কি সাপ ভালবাসেন?'

'কেন? এ প্রশ্ন কেন?'

'অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, আপনার পিছন দিকে ভারী সুন্দর একটা সাপ শুয়ে আছে। কালো কুচকুচে। গায়ে জরির কাজ।'

'কী বলছেন আপনি? কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'ভয় দেখাব কেন? আর ভয় দেখালেও, আপনি ভয় পাবেন কেন? এই তো একটু আগে বললেন, আপনার ভয়ডর নেই। ওদিকে না তাকিয়ে পিছনে হাত দিয়ে দেখুন। লক্ষ্মী সাপ।'

'যদি কামড়ায়!'

'তা হলে আপনি নড়াচড়া করবেন না। কাঠ হয়ে বসে থাকুন।'

বিপ্লববাবু পুলিশসাহেবকে বললেন, 'আপনারা চুপ করে বসে থাকবেন আমার এই বিপদে?'

তিনি বললেন, 'এ তো চোর, ডাকাত নয় যে, ধরে লকআপে ভরে দেব! আমরা বরং পা টিপে টিপে বাইরে চলে যাই।'

'আমি যে-কোনও মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি। মরে যেতে পারি।'

ছোটদাদু বললেন, 'ভয়ে, না সাহসে?'

'আমি মার্জনা চাইছি। আর অহংকার প্রকাশ করব না।'

'তা হলে বলি, মনে সাপ আছে, তাই বাইরে সাপ দেখি। এই দেখুন, এটা অরুণের বেল্ট।'

'ওটা ঠিক বেল্ট নয়, মাধবীর ড্রেসিং গাউনের কোমরবন্ধনী।'

'তা হলে দেখো, মনে যা আছে তা বাইরেও আছে, না থাকলেও আছে। মনে ভগবান, বাইরেও ভগবান, না থাকলেও তিনি সদা উপস্থিত। ভূত, প্রেত, পিশাচও তাই। যে-কুকুরটা দেখেছ, সে চলে যায়নি। এই ঘরেই আছে। একবারের জন্যে তোমাকে আমি দেখিয়েছি। বামদেবের কুকুর। আমার আশ্রমে মন্দিরে ওর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত অছে। নিত্য পূজা পায়। অদৃশ্য শক্তি হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। তোমার বিশ্বাস, অবিশ্বাসের তোয়াক্কা করে না। জগৎ অনেক বড়। রহস্য অতি গভীর। কিছু জানি না এইটিই শ্রেষ্ঠ জানা। আমরা এখন এর মুখে শুনি ওই ছেলেটির কী হয়েছিল!'

'সবুজ ওই লনে বসে আমরা মুড়ি, কড়াইশুঁটি, আলুর চপ খাচ্ছি। রোদ্দুরটা ভাল লাগছিল। উত্তরের ঠান্ডা বাতাস। হঠাৎ ধপধপে সাদা কাপড় পরা সুন্দর চেহারার এক বৃদ্ধা এলেন। সাদা চুল, ববছাঁট। বেশ লম্বা। তিনি আমাদের দিকে একবারও তাকালেন না। দূরে একপাশে আমাদের দিকে পিছন ফিরে সোজা হয়ে বসলেন। সামনে জিনিয়া ফুলের বেড। তার পাশে অ্যাস্টার। অভিজাত চেহারা। ভাবছি, আমাদের কিছু বলবেন না তো। একটা-দুটো মুড়ি ঘাসের উপর পড়েছে। তাড়াতাড়ি তুলে নিলুম। অদ্ভুত লাগছিল একটা ব্যাপার। মনে হচ্ছিল, তাঁর যেন কোনও ওজন নেই। জোরে বাতাস এলে নড়ে যাচ্ছেন, দুলছেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখছি নেই। সেই সময় একটা দাঁড়কাক কোথাও ডেকে উঠল। আমাদের কী হল বলতে পারব না, তবে চারপাশের আলো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গেল। আকাশে এক টুকরোও মেঘ ছিল না। হঠাৎ সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল। একটা তিরের মতো নিমেষে ওই কুয়োটার ধারে। আমি চেষ্টা করছি ছোটবার, কিন্তু পারছি না। এক পা-ও এগোতে পারছি না। ওদিকে সুকুমার ইঁদারার পাড়ে ঝুলছে। অদৃশ্য শক্তি তাকে টানছে। বাগানের দু'জন মালি ছুটে এসে তার পা দুটো ধরে টেনে-হিঁচড়ে মাটিতে এনে ফেলল। ওর নাকটা ছেঁচে গেল। সেন্স নেই।'

আমার কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি, এমন সময় অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল।

সকালের সেই মহিলা ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন, যেন জমাট ধোঁয়া। ভাসতে ভাসতে আসছেন। আমরা যারা বসে আছি, ভয়ে পাথর। সাদা সেই মূর্তি ঘরের মাঝখানে।

মুখার্জিসাহেব জ্ঞান হারিয়েছেন। ধোঁয়ার নারীমূর্তি ছোটদাদুর একেবারে কাছে এসে ছড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে গেলেন। ঘরের আলো কমতে কমতে এক সময় অন্ধকার।

রাত বারোটা। অতিথিরা কোনওরকমে পালিয়ে বেঁচেছেন। ছোটদাদু আর মুখার্জিসাহেব একটা সোফায় পাশাপাশি। কমপাউন্ডের বাইরে একটা জলা, সেখানে শেয়াল ডাকছে। টেম্পারেচার মনে হয় পাঁচে নেমেছে। শরীরে কাঁপুনি।

ছোট দাদু গম্ভীর গলায় বলছেন, 'নান্টু', মুখার্জিসাহেবের ডাকনাম। 'নান্টু! তোমার মনে পাপ ঢুকেছে। তুমি জানো কী পাপ! তোমার মা কীভাবে মারা গেলেন, তুমি আমাকে বলোনি। মিথ্যে কথা বলেছ। তোমার মা ওই ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। দেহ উদ্ধার করা যায়নি। এখানে আসার তিন মাসের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছিল। শ্মশানে যথারীতি সৎকার হয়েছিল, ডেথ সার্টিফিকেটও ছিল। না বলে কার দেহ সৎকার করেছিলে? নান্টু, তোমাকে জেল খাটতে হবে না তো? তুমি তোমার মাকে খুন করোনি তো!'

ঘরের উত্তাপ আরও কমে গিয়েছে যেন? ছোটদাদুর মুখ খুলে গিয়েছে। 'সিউড়ির বিষয় সম্পত্তি। অনেকটা। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি, সব তোমার। বৃদ্ধাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছ। তা হলে বাঁচতে দিলে না কেন? কার পরামর্শ! অনেক ব্ল্যাকমেলার। ক'জনকে সামলাবে?'

'আমাকে বাঁচান।'

'তোমরা পাপ করবে আর আমি বাঁচাব! পাপের বেতন মৃত্যু। রাত দিন হয়, পাপ পুণ্য হয় না।'

'আমি কী করব?'

'তুমি মরবে।'

তিন

একটা চিৎকার শোনা গেল, 'আগুন, আগুন।'

রান্নাঘরে আগুন লেগে গেছে। সর্বনাশ! ওখানে বিভা রয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা এইভাবে তছনছ হয়ে গেল কেন। আমার সাধক দাদু কী করতে চাইছেন? এতক্ষণ যাঁরা ভিড়

করেছিলেন, সকলেই পালিয়েছেন। একের পর এক গাড়ি উদ্যান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। শব্দ কানে আসছে। বিভা বেঁচে আছে। আগুনে কিছু হয়নি। রান্নাঘরের পেছনে ডাঁই করে রাখা খড়ের গাদায় আগুন লেগেছিল। কেউ বিড়ি, সিগারেটের শেষ টুক্‌রো ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। বিভা ঘরে ঢুকে বললে, 'ব্যাপারটা কী হল? সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল?'

ছোটদাদু হাসতে হাসতে বললেন, 'দরকার ছিল। আমি একটু আগে অরুণকে খুন করেছি এই যে তার বডি আমার পায়ের কাছে। এই যে আমার হাতে রিভলভার! এটা ওরই অস্ত্র। ছেলেটা বোকা চালাক। আজ রাতে একটা গ্র্যান্ড ফিস্টের আয়োজন করেছিল, লাস্ট সাপার। ভেবেছিল ভোর রাতে আত্মহত্যা করবে। কেন করবে? জবরদস্ত এক ব্ল্যাকমেলারের হাতে পড়েছিল। সাময়িক দুর্বলতা। এইরকমই তো হয় পাহাড়ি পথে সামান্য অসাবধানতায় পা পিছলে যায়। তারপর গভীর গভীর অন্ধকার। মরবি? মরতে চাস্? তা ভাল করে মর্। এমনভাবে মর্, যাতে আর এই জগতে আসতে না হয়। চির মুক্তি। অস্ত্রটা ওর বিছানায় বালিশের তলায় ছিল। ডাকলুম, চলে এল। তারপর ওর অহংকারটাকে গুঁড়িয়ে দিলুম। অহংকারই তো 'আমি'। অহংকারের মৃত্যুই তো আমির মৃত্যু। আজ শেষ রাতে অরুণের তন্ত্রমতে অভিষেক হবে। ওকে আমি আমার সাধনার সমস্ত ফলের উত্তরাধিকার দিয়ে যাব। সরকারি চাকরি করা আর সম্ভব হবে না ওর পক্ষে। হায় হায় ওর সব গেল, সব গেল। সবাই ডুকরে ডুকরে কাঁদো।

আমরা, আমি আর সুকুমার, আমরা কী করব? আমরা কোথায় যাব? বাংলো, জিপ গাড়ি। সারা জেলায় রাজকীয় চালে ঘুরে বেড়াব। পোড়া কপাল আমাদের। সুকুমার আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় বললে—তোকে আমি কতদিন বলেছি কেউ নাচালেই ধেই ধেই করে নাচবি না। তোর স্বভাবটাই উদ্ভট—ভূত, প্রেত, তন্ত্র, মন্ত্র, কাপালিক। তোর কাছে সব কিছুই অলৌকিক। আর তোর একটা মস্ত রোগ, প্রেমে পড়া। মেয়েদের তুই চিনিস না। গাছে তুলে দিয়েই মই কেড়ে নেওয়া।'

'তুই তা হলে কী বলছিস?'

'যে কাজে এসেছি, সেই কাজ ভালোভাবে করে ফিরে যাওয়া। চাকরিটা তো বজায় রাখতে হবে। এখানে তো আমরা ভূত দেখতে আসিনি।'

সূচীপত্রে যান

'খাঁটি কথা। দাদু, দাদু করছিস। দাদু কী করবেন। তিনি সাধক মানুষ। সাধনার পথ দেখাবেন। চল, আমরা পালাই।'

'বিভা?'

'তোর বিভার নিকুচি করেছে। জীবনের সব ঘাটে নোঙর ফেললে নৌকো এগোবে? তোর সমস্যাটা কোথায় জানিস, তুই লেখক হয়ে মরেছিস, আমরা পাঠক, আমাদের প্রচুর স্বাধীনতা?'

'আমরা যে এখান থেকে চুপিসাড়ে পালাব, আমাদের ব্যাগ দুটো কোথায়?'

'মরেচে। সে তো গাড়িতেই আছে, নামানো হয়নি। কেলেঙ্কারি কাণ্ড।'

'গাড়িটা কোথায়?'

'তা তো জানি না।'

'চল তা হলে, গাড়িটা খুঁজি। কোথাও একটা গ্যারেজ আছে নিশ্চয়। গাড়িটা চিনতে পারবি?'

'চেনার চেষ্টা করব।'

আলো অন্ধকার পেরিয়ে কে একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে আসছেন। আমাদের কাছে এসে বললেন, 'কী করছেন এখানে? চলুন চলুন। আপনাদের সবাই খুঁজছে। খাওয়া শুরু হয়ে গেছে।'

বিরাট ঘর, লম্বা টেবিল। এ মাথা থেকে ও মাথা। ইংরেজ আমলের। সারি সারি চেয়ার। ঝলমলে আলো। উর্দিপরা বেয়ারাদের নিখুঁত পরিবেশন। তবে যাঁরা বসেছেন তাঁরা সবাই নিখুঁত দেশি। টেব্‌ল ম্যানার্সের অ আ ক খ জ্ঞান নেই। তার ওপর মদ্যপান করেছেন। ভাগ্য ভাল আমরা দু'জনে অনেকটা দূরে, আলাদা বসেছি। সরকারি চাকরিতে গ্রেড আছে। ক্লাস ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর। আমি আর সুকুমার টু।

হঠাৎ বিভা কোথা থেকে এসে মুখটা নামিয়ে কানের কাছে এনে চুপিচুপি বললে, 'দেখেশুনে খেয়ো। আমি দেখতে পারছি না। খাওয়া হয়ে গেলেই উত্তরের বারান্দায় চলে এসো। একটা ভালো ঘর ব্যবস্থা করে রেখেছি। সারাদিন বহুত ধকল গেছে। শুয়ে পড়বে। দরজাটা ভেজিয়ে রাখবে।'

'ছোট দাদু?'

'বাবা নগেনবাবার আশ্রমে গেছেন। থাকবেন। খুব একটা দূরে নয়। নদীর ধারে। তারা মায়ের মন্দির আছে।' এখানে তো সবই বিরাট বিরাট। উত্তরের চওড়া বারান্দা। ধার ঘেঁষে বড় বড় গাছের সারি। মাথার ওপর মৃদু আলো। এখানে একটা তো ওখানে একটা। মাঝে মাঝে বড় বড় মূর্তি দাঁড় করানো। জায়গায় জায়গায় বেতের চেয়ার। অনেকটা এগোবার পর দেখলুম আলোছায়ায় বিভা দাঁড়িয়ে আছে। নিচু গলায় বললে, 'এসো, এদিকটা খুব নির্জন।'

'ভয় ভয় করছে।'

'কীসের ভয়? এখানে কোনো ভয় নেই।'

'ভূত!'

'বেশি ভূত ভূত করো না। সত্যি সত্যি ভূতে ধরবে।'

বিভা অন্ধকারে অদৃশ্য হল। ঘরটার আকার আর সাজসজ্জা দেখে সুকুমার স্তম্ভিত। সায়েবরা আকার-আকৃতিতে বড়। রাজার জাত। তাদের জীবন ধারণের পদ্ধতিও তো সেইরকমই হবে। দুপাশে দেয়াল ঘেঁষে ঝকঝকে দুটো খাট, গদি আঁটা বিছানা। বড় বড় জানালা। নেট লাগানো। সুন্দর সুন্দর পর্দা। নেটের পাতলা মশারি। কুমার বললে, 'কতদিন ভালো করে ঘুমোইনি, আজ একবারে সাউন্ড স্লিপ। একটুও সময় নষ্ট করা চলবে না। সুকুমার মশারির ভেতর ঢুকে গেল। নানারকম আরামসূচক শব্দ, টুকরো টুকরো। সুকুমার ডানপাশে ফিরে ঘুমের অতলে চলে গেল। ছেলেটা ভারি সরল। ভীষণ সৎ। আমি জানি, আমার ঘুম সহজে আসবে না। মশারির ভেতর ঢুকে হাত বাড়িয়ে আলো নেভাতেই থই থই অন্ধকার। চিত হয়ে শুয়ে আছি। সেইটাই আমার অভ্যাস। বাতাসে শীত ঢুকে পড়েছে। বাইরে অজস্র নিশাচর পোকা-মাকড় নানা সুর ও ছন্দে শব্দ করে চলেছে। প্যাঁচার কর্কশ ডাক, কোনো গাছের মাথায় পাখির ছানারা অবিরাম শব্দ করে চলেছে। কোথায় আছি, কেমন আছি! এরই নাম জীবন। ঘুম আসছে। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে ট্রেনের শব্দ।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আমার বুকে একটা মাথা। একটা হাত দিয়ে কেউ আমাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। নরম উষ্ণ আলিঙ্গন। রয়েছি একটা চাদরের তলায়। জাফরানের গন্ধ। প্রথমে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। পরে বুঝতে পারলুম

বিভা। তার নরম পশমের মতো চুলে আমার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। ক্রমশ ক্রমশ দুটো শরীর এক হয়ে যাচ্ছে। জগৎ হারিয়ে যাচ্ছে। একটা তরঙ্গ, ভীষণ একটা আবেগ। চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্তিত্ব। পাপ নেই, পুণ্য নেই। সময় নেই। শুধু তট আর তটিনী। কী উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস। বাতাসের সুরে একটি মাত্র কথা—'তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব কী করে!' রাত এখনও অনেক বাকি। নাইবা হল ভোর।

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

বহ্নিদৈত্যকে একঘণ্টা গান শুনিয়ে ঠাকুরদা বাড়ি ফিরলেন

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আমার ছোটোদাদু সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ আমার বাবার ছোটোমামা মস্তবড়ো একজন তান্ত্রিক ছিলেন। তারাপীঠে তিনিই প্রথম বামদেবের মূর্তি সম্বলিত একটি মন্দির স্থাপন করেন। বামদেবের কালো কুকুর কালুয়াও তাঁর পাশে আছেন। দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে বিস্তীর্ণ একটি জায়গায় সুন্দর এই আশ্রম ও দ্বিতল মন্দির। এস আশ্রমটির নাম 'বামদেব সঙ্ঘ'। মন্দিরের দ্বিতলে বামদেবের শয়নকক্ষ। সেখানে তাঁর ত্রিশূল, কমণ্ডলু, চিমটা ও বাঘছাল আছে। এখানে বসে গভীর ধ্যান করা যায়।

আমার ছেলেবেলা কেটেছে একটা হানাবাড়িতে। বাড়িটার খুব বদনাম ছিল। কিন্তু আমার পিতামহ ও পিতা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করতেন না। আমার পিতামহ খুব শিক্ষিত ছিলেন। নামকরা শিক্ষক। বরাহনগরের মানুষ, যাঁরা প্রাচীন, তাঁরা যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামটি শুনলে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করতেন। আমার ঠাকুরদা ব্রহ্মদৈত্যকে গান শুনিয়েছিলেন। সেই সময়কার বরাহনগর, সিঁথি, দমদম, ঘুঘুডাঙা—এইসব অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। চোর, ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে, ফাঁসুড়ে— কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। যা যা থাকা উচিত সবই ছিল। গোটাকতক খাল ছিল, তার মধ্যে একটার নাম দেঁতের খাল। এই খালটি দক্ষিণেশ্বরের পাশ দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। এরই কাছাকাছি একটি অঞ্চলকে বলা হত খোসালের মাঠ। এখানে প্রচুর ডাকাত ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার কলকাতা থেকে ফেরার পথে এদের পাল্লায় পড়েছিলেন।

আমার ঠাকুরদা জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে পড়তেন, বর্তমানে যার নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ। তিনি হেঁটে কলেজে যেতেন আবার সেইভাবে ফিরতেন। সেকালের মানুষ নিজের দুটি পায়ের ওপর যথেষ্ট ভরসা রাখতেন। কালীচরণ ঘোষ রোডের মুখে শীতলা মন্দিরটি খুবই প্রাচীন। এদিকে তখন বড়ো বড়ো বাগানবাড়ি ছিল। বড়ো বড়ো মানুষ সেইসব বাগানবাড়ির মালিক ছিলেন। যেমন প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শিল্পপতি এফ এন গুপ্ত,

সূচীপত্রে যান

ব্রাহ্মবেণী পাল। ঠাকুরদা খুব ভালো গান গাইতে পারতেন। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এদিকে-ওদিকে লণ্ঠন, কুপি জায়গায় জায়গায় জ্বলে উঠেছে। চারপাশে বড়ো বড়ো গাছ। বাদুড়রা রাতের চক্করে বেরিয়ে পড়েছে। শেয়ালরা প্রথম প্রহরের ডাক ডেকে গেছে। আমার ঠাকুরদা গান গাইতে গাইতে আসছেন। একতলা শীতলা মন্দিরের কাছে আসা মাত্রই মন্দিরের ছোট্ট ছাদ থেকে একটা ভারী গলা ভেসে এল— বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে। ঠাকুরদা ওপর দিকে তাকিয়ে বিরাট এক পুরুষকে দেখতে পেলেন। গলায় গোটা পৈতে। গান থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে? অন্ধকারে কী করছেন! উত্তর এল— আমি ব্রহ্মদৈত্য, এই গাছে থাকি। ঠাকুরদা এক ঘণ্টা বসে বসে গান শোনালেন আর সেই প্রেতের আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

তবু কী হল। এই ভূতুড়ে বাড়িতে এসে শুরু হল লাগাতার মৃত্যু। আমার ছোটোদাদু আর আমার বাবা দুজনেই সমবয়সি। ছোটোদাদু আমার ঠাকুরমার কাছেই মানুষ হয়েছেন। দুজনেই খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। আমার বাবাও যে তন্ত্রসাধক ছিলেন সেকথা জেনেছি বাবার পরলোকগমনের পর। মামা আর ভাগ্নে একসঙ্গে শক্তিসাধনা করতেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বেলতলায় সারারাত কাটত। ছোটোদাদু চলে গেলেন তারাপীঠে। মহাশ্মশানে সাধনভজন করে তিনি সিদ্ধ হলেন। শ্রদ্ধেয় সাধক তারাক্ষ্যাপা তাঁর গুরু। তন্ত্রসাধন করলে সিদ্ধাই হয়। একথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করে গেছেন। ছোটোদাদুরও অনেক সিদ্ধাই ছিল। তাঁর মধ্যে একটি হল— লোকের মুখের দিকে তাকিয়েই তাঁর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতেন। গভীর রাতে যখন 'আসনে' বসতেন তখন তাঁর শরীর থেকে অদ্ভুত একটা জ্যোতি বেরত। আর তাঁকে ঘিরে নানা রকমের শব্দ হত। সেই শব্দ দূর থেকে শোনা যেত। যেমন খিলখিল হাসি, অনেক শকুনের খ্যা-খ্যা চিৎকার, কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খের শব্দ, মড়মড় করে ডাল ভাঙার আওয়াজ। সেইসময় ভয়ে সবাই দূরে সরে যেত। ধারে কাছে ঘেঁষত না। আমি একবার অমাবস্যার রাতে ছোটোদাদুর চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। দু-চোখে নীল আলো। আমি তখন স্কুলে পড়ি।

সূচীপত্রে যান

তিল মাটিতে পড়া মাত্রই দপ করে জ্বলে উঠল

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

ছোটোদাদু আমার বাবাকে বললেন— তোরা তো শুনলি না। এই বাড়িতে এসে আমার দিদি, আমার জামাইবাবু, আমার ভাগ্নীরা—একে একে সবাই তো মারা গেল। তুই আর তোর এই ছেলেটি শিবরাত্রির সলতের মতো জ্বলছিস। বাবা বললেন, আমি তোমার ভাগ্নে। তোমার মতোই সাহস রাখি। আমি শেষ দেখতে চাই। ছোটোদাদু খুব পান খেতেন, দুটো গাল সবসময় ফুলে থাকত। ওই পান ভেদ করেই কথা আসত। ছোটোদাদুর পোশাকটি ছিল ভারী সুন্দর। ধুতি, সিল্ক-টুইলের পুরো হাতা শার্ট। একমাথা কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল। খুব লম্বা ছিলেন না। গায়ের রঙ ছিল পেতলের মতো। কিছুক্ষণ ভাবলেন। ভেবে বললেন—তাহলে আমাকেই নামতে হচ্ছে। দেখি আমার ঝুলিতে কী শক্তি আছে।

এসে গেল শনিবার। এবং অমাবস্যা। খবর এল আজ রাতে ছোটোদাদু আসবেন, বিশেষ কিছু ক্রিয়া হবে। বাড়িটার ভেতরে উত্তরদিকে খানিকটা জমি ছিল। সেখানে বাবার বাগান। বড়ো গাছ, ছোটো গাছ সবই আছে। পূর্ব-দক্ষিণ কোণের একটা জায়গায় ছোটোদাদু অন্ধকারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। মাথার ওপর দোতলার বারান্দা। পূর্বদিকে সীমানা-পাঁচিলের পাশেই একটা টিনের চালা। ছোটোদাদু যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই জায়গাটায় আমরা কেউ যেতুম না।

এটাই মনে হত ওখানে পা দিলে মরে যাব।

এরপরে ছোটোদাদু তিনবার হাততালি দিলেন। আর মুখ দিয়ে শিসের মতো অদ্ভুত একটা শব্দ একটানা করে গেলেন অনেকক্ষণ। আমরা...। অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছি। ভয়ে সিঁটিয়ে। ঝোলা থেকে এরপর কালো তিল বের করে প্রথমে একটা জায়গায় ফেললেন। ঠোঁট দুটো নড়ছে অর্থাৎ মন্ত্র পড়ছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, তিলগুলো মাটিতে পড়া মাত্রই দপ করে জ্বলে উঠল। পাঁশুটে রঙের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ওপর দিকে উঠছে। ঠিক যেন ধূমাবতীর চুল।

সূচীপত্রে যান

ছোটোদাদু যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে তিল ফেলতে লাগলেন। যেখানেই ফেলছেন, সেখানেই আগুন জ্বলছে। আগুনের বলয়ের মধ্যে ছোটোদাদু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এরপরে যা ঘটল তা আজও ভুলতে পারিনি। আমার এই সাধক দাদু ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকলেন। উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। চেহারাটা হয়ে যাচ্ছে বিপুল। ওই জমিতে তিনবার পায়ের গোড়ালি ঠুকলেন। একটা শব্দ হল। যেন অনেকগুলো খাঁচা একসঙ্গে ভেঙে গেল।

পরের দিন সকালে ওই জায়গায় যে দৃশ্য দেখলুম তা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হতে পারে। বেশ বড়োমাপের গোল একটা হাড় পড়ে রয়েছে। সেই হাড়টার গায়ে চুল বেরিয়ে গেছে। ছোটোদাদু দেখে একটি কথাই বললেন—খতম।

এরপরে ওই বাড়িতে কোনো অকাল মৃত্যু, দুর্ঘটনা, রাতের বেলায় ভীতিপ্রদ আওয়াজ, দপদপ করে হ্যারিকেনের আলো নিভে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি।

সূচীপত্রে যান

মা বলে ডাকলেন, গগনভেদী চিৎকার

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

কামারহাটি এলাকাটা জুটমিলের জন্য বিখ্যাত। আর যেখানে জুটমিল, সেখানেই তৈরি হয় ঘন বসতি। বিভিন্ন প্রদেশ ও ধর্মের মানুষ এক জায়গায় এসে পাশাপাশি বাস করেন। জুট মিলের ডাক্তারখানাও থাকে। বিখাত ডাক্তার এস কে বন্দ্যোপাধায় এখানকারই একটি জুটমিলের মেডিকেল অফিসার। তাঁরই অধীনে কাজ করতেন আমার বড়োমামা সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। তিনি একবার ঘোরতর অসুস্থ হয়েছিলেন। কোনো ডাক্তারের ক্ষমতা ছিল না তাঁকে সুস্থ করার। অদ্ভুত ধরনের অসুখ। যার ৯০ ভাগই সাইকোলজিক্যাল। সমস্ত কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল। সেই সময় আমার ছোটোদাদু বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁর বিশাল গোল টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বললেন, দেখা যাক কী করা যায়। বড়োমামাকে নিয়ে চলে গেলেন তারাপীঠে। বামদেব সঙ্ঘের ঘরে ছোটোদাদু আর বড়োমামা। তারামায়ের মন্দিরের বিখ্যাত শক্তি পাণ্ডাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, একটু চেষ্টা করে দেখা যাক মায়ের কৃপা হয় কি না।

বড়োমামার অবস্থাটা তখন এইরকম, ঘড়ির টিকটিক শব্দের মতো তিনি তাঁর ভিতরে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। যাকে পাচ্ছেন, তাকে আঁকড়ে ধরে বলছেন, আমি এখনই মরে যাব, তোমার কাছে কোনো ওষুধ আছে? এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছেন না, অনবরত কাঁদছেন। ছোটোদাদু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, আর মুচকি মুচকি হাসছেন। শক্তি পাণ্ডাকে ছোটোদাদু বললেন, কাল সকালে তুমি মায়ের মন্দিরে ওই সুধাংশুকে নিয়ে বসবে। হোম, যাগ-যজ্ঞ যা করার সব করবে। আমি এদিকে বামদেবের মন্দিরে বসব। বড়োমামার ছোটোদাদুকেই পছন্দ। শক্তি পাণ্ডাকে সহ্য করতে পারছেন না।

ছোটোদাদু বললেন, তুমি যা চাইছ তাই হবে, ও আমার নির্দেশমতো পুজোটাই শুধু করবে।

ছোটোদাদু ঢুকলেন বামদেবের মন্দিরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ভেতরে কী করছেন,

সূচীপত্রে যান

কিছুই বোঝার উপায় নেই। মন্দিরের কাজ শেষ হল। শক্তি পাণ্ডা বড়োমামাকে নিয়ে বামদেবের মন্দিরের সামনে এসে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় দরজা খুলে গেল। ছোটোদাদু বেরিয়ে এলেন। পুজোর পোশাক। অনাবৃত প্রশস্ত বুকে সাদা পৈতে শুয়ে আছে। মুখ-চোখ জবাফুলের মতো লাল, পরিধানের কাপড়ও লাল। তাঁর হাতে দুলছে একটি কবচ। একটাও কথা নেই মুখে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। বড়োমামার ডান হাতের উপর বাহুতে সেই কবচটি পরিয়ে দিয়ে মা বলে ডাকলেন, গগনভেদী চিৎকার। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁকে অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। কবচটা পরিয়ে দিয়ে বড়োমামার বুকে আলতো করে একটা ঘুসি মেরে বললেন, যাও তুমি ভালো হয়ে গেছ। যাও মাকে প্রণাম করে এস। কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে বড়োমামা লাফিয়ে উঠলেন, আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি ভালো হয়ে গেছি। সত্যি, বড়োমামা ভালো হয়ে গেলেন। সেদিন বামদেবের মন্দিরে বহু মানুষকে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হল। ছোটোদাদু বললেন, পরিবেশন করবে সুধাংশু। সুধাংশু তাই করলেন।

সূচীপত্রে যান

ছোটোদাদু ক্যানসার রোগটা নিজের শরীরে তুলে নিয়েছিলেন

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

ছোটোদাদুর বৈঠকখানা ছিল দেখার মতো। বড়োলোকের বাড়ি, বিরাট যৌথ পরিবার। বাড়ির সামনেটা ইতালিয়ান ঢঙে তৈরি। সেই বাড়ির জন্য এখনও আমার ভেতর একটা বেদনাবোধ জেগে ওঠে। উঁচু ভিতের ওপর তৈরি। সাত ধাপ সিঁড়ি বেয়ে একটা রক। পরপর তিনটি প্রবেশদ্বার। বিশাল বড়ো একটা বৈঠকখানা। সেই বাড়িটা না দেখলে স্থাপত্য কৌশলটা বোঝা যাবে না। যাক সে কথা। কিছুই থাকবে না, এটাই যেন বাঙালির নিয়তি।

বৈঠকখানার ঘরের মাঝখানে বিশাল একটা গোলটেবিল। সেই টেবিলটা ছেলেবেলায় দেখে আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, এইটাই লন্ডনের রাউন্ড টেবিল। এই বাড়িতেই, এই টেবিলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এসে বসেছিলেন। তখন তিনি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন। নামকরা একজন ডাক্তার। এই বাড়ির পূর্বপুরুষও একজন বিখ্যাত ডাক্তার। ডাক্তার রায় এই বাড়িতে বসেই ব্যারাকপুর নির্বাচন কেন্দ্রে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বিপরীতে নির্বাচন অভিযান পরিচালনা করে জয়ী হয়েছিলেন।

গ্রীষ্মকাল, ৪টে। ছোটোদাদু দোতলা থেকে নেমে এসে ওই টেবিলে বসলেন। ইতিমধ্যে ঘরে অনেক লোক। তাঁরা ভাগ্য জানতে এসেছেন। একসঙ্গে সকলেই হুড়মুড় করে কথা শুরু করলেন। ছোটোদাদু যখন হাসতেন, মনে হত আকাশ খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ছে। আর যখন গম্ভীর হয়ে থাকতেন, মনে হত এখনই যেন বজ্রপাত হবে। সেই মুহূর্তে তিনি ভীষণই গম্ভীর। একটা আঙুল তুলতেই ঘর নিস্তব্ধ। তিনি বললেন, একজন আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি। বরাহনগর বাজারে বাস থেকে নেমেছে। নন্দকুমার রোড ধরে সে আসছে।

এইকথা বলতে বলতে সুন্দর চেহারার এক যুবক ঘরে ঢুকলেন। প্রণাম করার জন্য নিচু হতেই ছোটোদাদু বললেন, মুখ দিয়ে কাশির সঙ্গে রক্ত বেরলেই টিবি হয় না। অন্য কারণও থাকতে পারে। সেই ছেলেটির চোখেমুখে ভীষণ একটা আশ্চর্যের ভাব। তিনি তখনও কিছু বলেননি। ছোটোদাদু বললেন, এখানে বোসো। যুবকটি কিছু বলতে চাইছিলেন। ছোটোদাদু বললেন, তোমার ভাবনাটা আমি বইয়ের মতো পড়তে পারছি। কথা বলে কোনো লাভ নেই। দ্যাখো, পৃথিবীর দুটো দিক— লৌকিক আর অলৌকিক। এই দেহটা নিয়ে যা জানতে পারি, তাকেই বলে

সূচীপত্রে যান

লৌকিক। আর দেহের ভেতর যে সূক্ষ্মদেহ সে দেখে, তাকেই বলে অলৌকিক। এইবার দেখো, এই যে দেখছ বুড়ো আঙুলটা, এটা আমি তোমার কণ্ঠনালিতে একবার ঠেকিয়ে দিলুম। কাল এসে জানাবে কেমন আছ।

যুবকটি আজ সম্পূর্ণ সুস্থ প্রবীণ একজন মানুষ। আমারই ভাই দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছে ছোটোদাদুর বহু কথা সঞ্চিত আছে। ঝাড়লে একটা বই হয়ে যাবে।

এতদিন পরে সময় সময় নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয়। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করি, তুমি কি তোমার ছোটোদাদুর মৃত্যুর কারণ? আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। আমার সম্পর্কে তাঁর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী একের পর এক ফলেছে। এখনও হয়তো কিছু বাকি আছে। সেটাই হবে আমার শেষ পাওনা।

সেই সময়, অর্থাৎ ১৯৭০ কী '৭২ সালেই আমারই পরিচিত কলকাতার এক বিশিষ্ট মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হলেন। বড়ো ব্যবসায়ী। ইলেট্রিক্যালসের এজেন্ট ছিলেন। বড়ো বড়ো হাউসে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজকর্মও করতেন। ধনী মানুষ, উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। আমি মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে যেতাম। দোতলার ঘরের বিছানায় শুয়ে থাকতেন। তখন ক্যানসার হলে কিছুই আর করার থাকত না। গলা বুজে গেছে। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরেই তাঁর দু-চোখে জল নামত। ভীষণ সাহসী মানুষ ছিলেন। আশি মাইলের কম স্পিডে গাড়ি চালাতেন না। তাঁর স্ত্রী আমাকে বললেন, কিছু কি করা যায় না?

আমার তো একমাত্র সহায় ছোটোদাদু। তাঁকে বললুম, কী করা যায়? কিছুক্ষণ ভাবলেন। এরপর তিনবার বামদেবের নাম উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা চল দেখি কী করা যায়। এখনও মনে আছে, একদিন সন্ধ্যার মুখে তাঁকে নিয়ে সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলুম। তিনি রুগির ঘরে ঢুকে সকলকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। আমিও বাইরে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন। সেই পরিবারের সমস্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করে নেমে এলেন রাস্তায়। একটা গাড়ি ছিল, উঠে বসলেন। আমি পাশে। চালককে বললেন, কালীঘাটে চলো। মাকে প্রণাম করলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে মন্দির থেকে নামতে নামতে বললেন, আমার সব বিদ্যা তোমাকে দিয়ে যাব। তখন বুঝিনি কেন বললেন।

ছোটোদাদুর থ্রোট ক্যানসার হল। তখনও বুঝিনি কেন হল। এখন বুঝেছি, তিনি রোগটা নিজের শরীরে তুলে নিয়েছিলেন। কারণ সেই ভদ্রলোক সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আরও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন।

একটি ছবি, একটি ছবি।

খসখস শব্দ

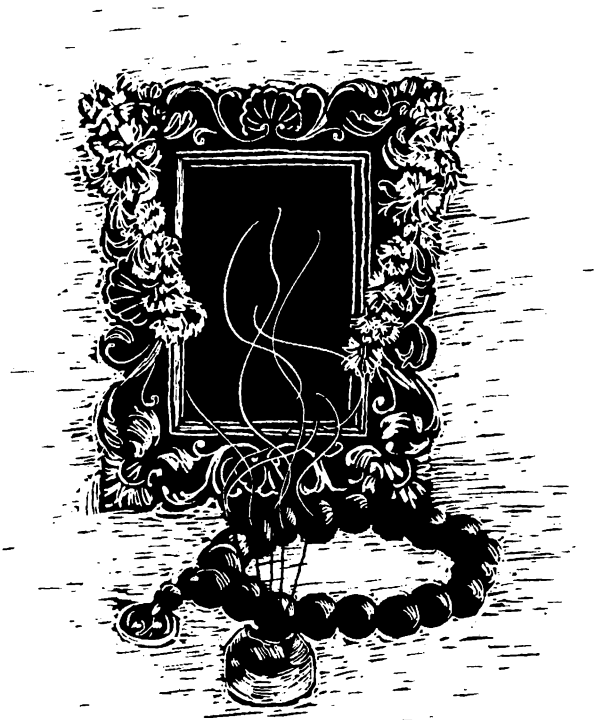

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আমি তাঁকে এস কে বোস নামেই চিনতাম। কলকাতার এক সম্পূর্ণাঙ্গ বনেদি মানুষ। বোধহয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরিবারের সঙ্গে দূর আত্মীয়তা ছিল। পাক্কা সাহেব। প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা। নিখুঁত ইংরেজি পোশাক। থ্রি-পিস স্যুট, টাই। টাই ছাড়া আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। দু-খানা গাড়ি ছিল। একটা সানবিম। তার হুডটা খোলা যায় আবার তোলাও যায়। আর একটা অস্টিন। এত বড়ো মিশুকে ও উপকারী মানুষ আমি দেখিনি। কলকাতায় তখন সব কিছুর আকাল। বেবি ফুড, পাউরুটি এইসব সামান্য সামান্য জিনিসও দুষ্প্রাপ্য। তিনি তেল পুড়িয়ে আমাদের বরাহনগরের বাড়িতে কখনও রুটি, কখনও বেবি ফুড পৌঁছে দিয়ে যেতেন। তখন বাড়িতে একটা বেবি এসেছে। বেবি ফুড ছাড়া অন্য কোনো দুধের কথা ভাবাই যেত না। কারণ, খাটালের গোরুর দুধ শিশুকে দেওয়া যায় না। তিনি কখনও কখনও আমাকে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের একটি বিখ্যাত বনেদি দোকানে চা খেতে যেতেন। সেই দোকানটি ছিল চা, কেক, স্ন্যাকস ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত। এই বোসসাহেব একদিন আমাকে বললেন, আপনাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব। আপনি ভাগ্য, জ্যোতিষী এইসব মানেন, আপনার নিজেরও চর্চা আছে। আপনার ভালো লাগবে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তখন কে ছিলেন, নামটা ভুলে গেছি। তাঁর বাড়িতে এক তন্ত্রসাধক এসেছেন। তিনি সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ান। জেট সেট গুরু। আজ জার্মানিতে তো কাল আমেরিকায়। ত্রিকালসিদ্ধ। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—তাঁর হাতের মুঠোয়।

এক বিকেলে সেই চেয়ারম্যান সাহেবের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির। জুতোর সংখ্যা দেখেই বুঝতে পারলুম প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। তন্ত্রসিদ্ধ সেই সাধকটি তিনতলায় আছেন। তিনি মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসেন। চেয়ারম্যান সাহেব তিনতলার ফ্ল্যাটটি তাঁর জন্যেই রেখেছেন। খুবই সুন্দর। বড়ো হলঘর, শোবার ঘর, লেখাপড়া করার ঘর, করিডর। দামি

সূচীপত্রে যান

কার্পেট মোড়া। দেখলুম বোসসাহেবের খুব হোল্ড। আমাকে নিয়ে সোজা গুরু যে ঘরে রয়েছেন সেই ঘরে ঢুকলেন। ওয়াল-টু-ওয়াল কার্পেট। সুন্দর সুন্দর ডিভান। ভারী সিল্কের পর্দা।

প্রথম বিস্ময়— গুরুজি একটু হেলে বসে আছেন। পাশে, ওপাশে সিল্কমোড়া বালিশ। গদিটা এত নরম যে তাঁর দেহের নীচের অংশ ভেতরে ডুবে গেছে। অবাক হওয়ার কারণ— কোনো মানুষের এইরকম গায়ের রঙ দেখিনি—হালকা নীল। চোখ দুটো রুবি রেড। ছোট্ট একটি মানুষ। পরে শুনেছিলাম, ওঁর হাতের ও পায়ের আঙুলের সংখ্যা ছয়, ছয়। দু-হাতে বারো, দু-পায়ে বারো। ভয়ে ভয়ে কার্পেটের ওপর বসলুম। বোসসাহেব প্রণাম করলেন, আমিও প্রণাম করলুম। ভক্তির চেয়ে ভয়ই বেশি হল। শুনলুম ভারতবর্ষে যত রাজা-মহারাজা আছেন সবাই এঁর ভক্ত। অনেকে শিষ্যত্বও স্বীকার করেছেন। জানি না ইনি কী সাধন করান। নিজে তো কাপালিক।

বোসসাহেব বললেন, বাবা এই ছেলেটি কিছু জানতে চায়। তিনি বললেন, কী জানতে চাও? ভবিষ্যতে কী হবে তাই তো? আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বললেন, পাশের ঘরে চলে যাও, টেবিল, চেয়ারে বসো, ওখানে প্যাড আছে, কলম আছে। তোমার তিনটে মূল প্রশ্ন কাগজে লিখে আমার এই সহকারীকে দাও। পাশের ঘরে গিয়ে তিনটি প্রশ্ন লিখলুম। সেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন, তিন ভাঁজ করে এই লম্বা ঘামে ভরুন। মুখটা আঠা দিয়ে জুড়ুন। সেই ভদ্রলোক খামটাকে গালা দিয়ে সিলমোহর করলেন। আমি ভাবছি বাবা, কী ব্যাপার! খামটা হাতে নিয়ে গুরুজির কাছে এলুম। পরবর্তী আদেশ, ওই পাশের ঘরে যাও। সেখানে আমার গুরুর ছবি রয়েছে। সেই ছবির পায়ের কাছে রেখে চলে এসো।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখলুম, কাঠের বেদি, একটি বড়ো ছবি, ফ্রেমে বাঁধানো। অদ্ভুত চেহারার এক সাধক। এঁদের দেখছি সবই অদ্ভুত। অনেক ফুল, ফুলের মালা। আমি ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে লম্বা খামটি পটের তলায় রেখে বেরিয়ে এলুম। সহকারী দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ওই ছবি ও ছবির তলায় খামটি ছাড়া আর কিছুই রইল না। আমি গুরুজির ঘরে এসে বোসসাহেবের পাশে বসলুম।

নানারকম কথা হচ্ছে, অনেক ভারী ভারী লোকজন আসছেন। ঝুড়ি, ঝুড়ি ফুল ও মিষ্টি

সূচীপত্রে যান

আসছে। আমরাই কেবল খালি হাতে এসেছি। কিছুক্ষণ পরেই যে ঘরে পট রয়েছে সেই ঘরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। গুরুজি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও তোমার উত্তর এসে গেছে। নিয়ে এসো। ধীরে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলুম। দেখলুম খামটা মেঝেতে পড়ে আছে। তুলে নিয়ে গুরুজির ঘরে এলুম। তিনি বললেন, দেখে নাও। খামটা কেউ খোলেনি। সিলমোহর যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। ইনট্যাক্ট। তিনি বললেন, খুলে দেখো, কী উত্তর এসেছে। খামটা খুললুম। আমি যে প্রশ্ন লেখা কাগজটা ভরেছিলুম সেইটার সঙ্গে পরিষ্কার বাংলায় তিনপাতার একটা উত্তর। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর এসেছে। শুধু তাই নয় লাল একটা পাথরও এসেছে। নির্দেশ—এটি ধারণ করো, তোমার ভালো হবে। আমি এতটাই অবাক হয়েছি কথা বলতে পারছি না। বুঝে উঠতে পারছি না কীভাবে কী হল। আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। বললুম, আমাকে আপনার গুরুদেবের একটা ছবি দেবেন? তিনি বললেন, দেওয়ার মালিক তো আমি নই। আমি কিছুই নই। সামান্য এক ভৃত্য। তাঁর কৃপায় বেঁচে আছি। তাঁর কৃপাতেই তোমরা আমার কাছে আসছ। আবার ওই ঘরে যাও পটের সামনে বসে চোখ বুজিয়ে প্রার্থনা করো, তোমার আবেদন জানাও। আবার সেই ঘরে। দরজা বন্ধ করে পটের সামনে বসলুম। চোখ বুজিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকলুম।— একটি ছবি, একটি ছবি। খসখস শব্দ। চোখ মেলে তাকালুম। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ছবির তলা থেকে সাদা মতো কী একটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। গোটা কতক ফুল মেঝেতে পড়ে গেল। সেই সাদা বস্তুটি ছিটকে বেরিয়ে এসে মেঝেতে পড়ল। একটি ছবি। পটের ছবিরই ছোটো সংস্করণ। হাতে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকালুম। সারা শরীর কাঁপছে। দুর্ভাগ্য আমার, সেই মহাপুরুষের নামটি আমি মনে রাখিনি।

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

সাঁইবাবা অলৌকিক শরীরে গোপীনাথ কবিরাজকে কাশীতে দেখে গেলেন

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আমি যখন সরকারি চাকরি করি, তখন এক আধ্যাত্মিক মানুষ হরলাল ভট্টাচার্য আমাদের দপ্তরে উচ্চপদে ছিলেন। অমন সুন্দর চেহারার মানুষ খুব কম দেখা যায়। প্রাথমিক সামান্য তিক্ততার পর আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি খুব লিখতে ভালোবাসতেন। অনেক কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতা আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলুম। অক্সফোর্ড থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল— 'Know Thyself'। প্রখ্যাত আই সি এস হিরণ্ময় ভট্টাচার্য বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন।

হরলালবাবু একদিন আমাকে বললেন, তোমাকে নিয়ে আমি কাশীতে যাব। কাশী দর্শন তো হবেই, আর একটা খুব বড়ো কাজ আমাদের করতে হবে। তখনই জানলুম পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর গুরু। গোপীনাথজিকে বলা হত 'কাশীর চলমান শিব'। তাঁর রচনাবলি পড়লে বহু অলৌকিক ঘটনার কথা জানা যায়। তিনি উপাধি পেয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায়। কাশীতেই তাঁর জীবন কেটেছে। বেনারস সরকারি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর শেষ চাকরি। গোপীনাথজি তখন গঙ্গার ধারে আনন্দময়ী মার সুন্দর আশ্রমের দোতলায় রয়েছেন। মাই তাঁকে নিয়ে এসেছেন।

হরলালবাবু বললেন, তিনি যে ঘরে রয়েছেন, সেই ঘরের একপাশে তুমি চুপ করে বসে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমিও থাকব। তুমি সব দেখবে আর মনে মনে নোট করবে। তোমাকে লিখতে হবে। প্রথম দিনের কথা বেশ মনে আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বাঁদিকে মাঝারি মাপের একটি ঘর। টানা লম্বা বারান্দা। শেষ হয়েছে গঙ্গার উপর একটি নাটমন্দিরে। তলায় বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা। এপাশে, ওপাশে, যেদিকেই তাকানো যাক অবারিত দৃষ্টি। সামনের গঙ্গায় কত কী ঘটে চলেছে। ভারী সুন্দর জায়গা। গোপীনাথজি দরজার দিকে মুখ করে একটি তক্তপোশে বসে আছেন। পরনে শুধুমাত্র একটি ধুতি। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। প্রশস্ত

সূচীপত্রে যান

বুক। গলার কাছে টকটক করছে লাল রং। যোগীর লক্ষণ। সেই সময় তিনি কিন্তু ক্যানসারে ভুগছেন। তখন এত ওষুধ-বিষুধ বেরোয়নি। দেহ-ব্যাধি এইসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন এক সাধক বসে আছেন। তক্তপোশে কিছুই পাতা নেই। কোথাও একটা বালিশও নেই। একেবারে সোজা খাড়া বসে থাকা। স্বভাবতই গম্ভীর। ঘরের মেঝেতে বসলুম। কিছুই পাতা নেই। দরজা দিয়ে ঢুকে আমি বাঁ পাশে বসেছি, আর দক্ষিণ দিকে ভারী সুন্দর একটি মেয়ে বই, খাতা, কলম নিয়ে বসে আছে। সাদা একটা তোয়ালেও রয়েছে। মেয়েটি মাঝেমাঝে উঠে কবিরাজজির পিঠ মুছে দিচ্ছে। ভীষণ গরম। গঙ্গার দিক থেকে অল্প অল্প বাতাস এলেও প্রচণ্ড গরম। ঘরে কোনো পাখা নেই। পরে জেনেছিলুম, ওই মেয়েটি কঠিন কোনো বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছে। থিসিস জমা দেবে। কবিরাজজি মেয়েটিকে গাইড করছেন।

মাঝে মাঝে এমন সব বিষয় মেয়েটিকে বলছেন যার কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন বুঝি শৈবতন্ত্রের উপর কাজ চলছিল। আমি আর হরলালবাবু বসেই আছি। মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। চোখ দুটি খুব বড়ো বড়ো। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে কেমন যেন ভয় ভয় করে। তলার দিকটা ঈষৎ লাল। আমাদের দিকে তাকালেও কিছু বলছেন না। হরলালবাবুকে ক্রিয়াযোগের অনেক কিছুই তিনি দিয়েছেন। সেই সম্পদ তাঁকে অত সুন্দর করেছে। গৃহস্থাশ্রমে থেকেও তিনি ছিলেন যোগী। এরই মাঝে কেউ একজন এসে এদিক-সেদিক দু'চারটে কথা বলার পর হঠাৎ বলে বসলেন, আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর কিছু লিখুন না। কবিরাজজি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ওই বিষয়টা অনেক নীচের। আমার মন এখন গুরুর কৃপায় অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সেখান থেকে আর নামতে পারব না।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর একদিন খুব উৎসাহ নিয়ে সূর্যবিজ্ঞানের কথা বলতে লাগলেন। হরলালবাবু আমাকে ইশারা করলেন, অর্থাৎ ভালো করে শোনো। একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বললেন। এটি ঘটেছিল তাঁর জীবনে। বর্ধমানে গুরু বিশুদ্ধানন্দজির বাড়িতে। বিশুদ্ধানন্দজি ভারতের প্রাচীন সূর্যবিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁকে গুরুপদে বরণ করার আগে গোপীনাথজি তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে বিশুদ্ধানন্দজির বাড়িতে গেছেন। তাঁকে ঘিরে অনেকেই বসে আছেন, গোপীনাথজিও বসলেন। বসে বসে ভাবছেন ইনি কী আজগুবি কথা বলছেন।

মানুষ নিমেষে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যেতে পারে। অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। ইচ্ছে করলে নিজের শরীর থেকে আগুন বের করতে পারে। একটা চারাগাছে ফল ফলাতে পারে। এ যেন জাদুকরের কারসাজি। মাদারি কা খেল। এখনও জানেন না কার কাছে গেছেন। এই যোগী যে কোনো মানুষের ভেতরে ঢুকে যেতে পারেন। মুচকি মুচকি হাসছেন, আর নবাগত এই তরুণটির মনের ভাবনা পড়ছেন।

যে ঘরে বসে আছেন, সেই ঘরের সামনে একটি দাওয়া। তারপরেই অনেকটা খোলা জায়গা, ফুলের বাগান। বিশুদ্ধানন্দজি গোপীনাথকে বললেন, বাইরের দিকে তাকিয়ে বল তো, ওটা কী ফুল? কবিরাজমশাই বললেন, গাঁদা ফুল। একটা ফুল তুলে নিয়ে এসো তো। নির্দেশমতো একটি ফুল তুলে আনলেন। দাও আমার হাতে দাও।

বিশুদ্ধানন্দজি তাঁর হাতের তালুতে ফুলটি রেখে হাত মুঠো করলেন। কিছুক্ষণ পরে হাত খুলে একটি গোলাপ ফুল গোপীনাথজির হাতে দিলেন। তিনি অবাক। গাঁদা ফুল কী করে গোলাপ ফুল হল। বিশুদ্ধানন্দজি হাসতে হাসতে বললেন সৌরশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেই বস্তুর রূপান্তর ঘটানো যায়। হিমালয়ের আড়ালে একটি জায়গা আছে, সেই জায়গাটি দেবভূমি। সাধারণ মানুষ সেখানে যেতে পারে না। ওখানেই আছে সূর্যমন্দির। সেখানেই শেখানো হয় সূর্যবিজ্ঞান। উপযুক্ত গুরুর কৃপা ছাড়া সেখানে যাওয়া যায় না। সূর্যই স্রষ্টা। বীজ থেকে গাছ, ফুল, ফল, মানুষের জীবন, স্বভাব, গায়ের রং, প্রজাপতির পাখনার কারুকার্য, ঘাসের সবুজ, একই উদ্যানে লাল, সাদা, নীল ফুল—সবই সূর্যদেবের মহিমা।

কবিরাজজি অভিভূত হলেন। পরে বিশুদ্ধানন্দজিকেই গুরু হিসেবে স্বীকার করলেন। গুরুর কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উত্তরপ্রদেশের সেই মেয়েটি মাঝে মাঝে এসে মায়ের স্নেহে পিঠের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে। এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে যে ক'দিন কাটিয়েছিলুম, সেই কদিনই ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।

এইবার ঘটল সেই অদ্ভুত ঘটনা। সকাল তখন ক'টা হবে, দশটা। গঙ্গার বুকে সূর্যের আলো, যেন আগুন জ্বলছে। তরঙ্গভঙ্গে ছিটকে ছিটকে উঠছে আলোর তির। বসে আছি। হঠাৎ কানে এল খসখস পোশাকের শব্দ। ভারী লম্বা পোশাক পরে কেউ যেন আসছেন। ঝড়ের বেগে

ঘরে প্রবেশ করল একটা লাল ঢেউ। টকটকে লাল আলখাল্লা পরা একজন মানুষ। একমাথা ঘন কোঁকড়া চুল। কোনো মাথায় এত চুলও দেখা যায় না। মূর্তি কবিরাজজির সামনে এগিয়ে গেলেন। তাঁর হাঁটুতে দুবার চাপড় মারলেন। কপালে একটা চুমু খেলেন, তারপরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। কেউ কোথাও নেই।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কে এসেছিলেন? কবিরাজজি মৃদু হেসে বললেন, চিনতে পারলে না, সাঁইবাবা। আমি বললুম, তিনি তো পুত্তাপূর্তিতে থাকেন? কাশীতে কবে এসেছেন? মহামহোপাধ্যায় অদ্ভুত উত্তর দিলেন। বললেন, সশরীরেও আসতে পারে, অশরীরেও আসতে পারে। আমার মনে হয় তুমি যাঁকে দেখলে, তিনি তাঁর লৌকিক দেহ নিয়ে এখন দক্ষিণ ভারতেই আছেন। অলৌকিক শরীরে আমাকে দেখে গেলেন। আমি বললুম, এই যে পোশাকের শব্দ, সুন্দর গন্ধ, পরিষ্কার একজন মানুষ, তাহলে কী দেখলুম, কিছুই না। গোপীনাথজি বললেন, তুমি কি পায়ের দিকে তাকিয়েছিলে? আমি বলুম, আজ্ঞে না।

তাকালেই দেখতে পেতে ওঁর পা দুটি ভূমি স্পর্শ করছিল না। কিছু মনে কোরো না, নিজের কথা একটু বলে ফেলছি। আমাকে দেখতে অনেকেই আসেন। আবার নাও আসেন। জিজ্ঞেস করলুম, আপনি সাধক, একজন সাধক অনেক কিছুই দেখতে পান। আমরা তো বিপরীত জগতের মানুষ, আমাদের দর্শন হবে কীভাবে। কী সুন্দর উত্তরই না তিনি দিলেন। প্রাণ ভরে গেল। বললেন, 'সঞ্জীব, একেই বলে সাধু-কৃপা।'

সূচীপত্রে যান

হঠাৎ দেখি চেয়ারে
গৌরিদা,
তারপরই নেই,
টেবিলে শুধু শ্বেত শঙ্খ

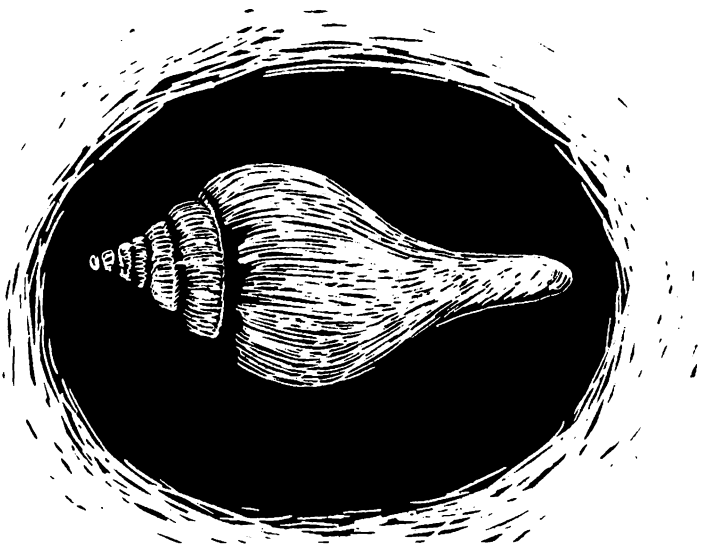

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

কলকাতায় ফোর্ড ফাউন্ডেশন এল প্রচুর ডলার নিয়ে। ফাউন্ডেশন কলকাতার বস্তি উন্নয়ন করবে। প্রথমেই কাজ শুরু হল মুরারীপুকুর বস্তিতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে সেখানে চালান করে দিলেন। এক আমেরিকান দম্পতি ডিরেক্টর। তাঁদের নাম মিঃ অ্যান্ড মিসেস এসভেরিয়া। অক্সফোর্ড থেকে এলেন ইকনমিস্ট ড. রোজেন। আর আমরা কয়েকজন। এন্টালি সি আই টি রোডে নতুন একটা বাড়ির দোতলার পুরোটাই তাঁরা ভাড়া নিয়েছিলেন। সারাদিন বস্তি অঞ্চল এফোঁড়-ওফোঁড় করি তথ্য সংগ্রহের জন্য। বিকেলবেলায় সি আই টি রোডের অফিসে ফিরে এসে রিপোর্ট লিখি। তারপর সেই রিপোর্ট একটা মিটিং-এ পড়ি, আলোচনা হয়। তারপর প্ল্যান তৈরি হবে, পরে মাস্টার প্ল্যান।

সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। কলকাতার জনজীবনের বিষাক্ত, রক্তাক্ত ছবি। বাঁচার তাগিদটা মানুষের জীবনে কত প্রবল, তা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। এইসব অভিজ্ঞতাও লিখতে হত। ভাদ্র মাসের প্রখর রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেল। শুরু হল পেটের গোলমাল। একদিন অফিসে মাথায় হাত দিয়ে একপাশে বসে আছি। মিসেস এসভেরিয়া পাশে এসে কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল মাই ইয়ং ফ্রেন্ড? আমি বললুম, পেট। তিনি হা হা করে হেসে বললেন, 'যে কলকাতায় বিষ্ণুচরণ ঘোষ আছেন, সেই কলকাতার ছেলের পেটের সমস্যা! চলো তোমাকে আজই, এখনই তাঁর কাছে নিয়ে যাই।'

জীবনে প্রথম আমেরিকান ফোর্ড গাড়িতে চাপলুম। পাশে এক স্নেহময়ী, মমতাময়ী বিদেশিনি। এই আমার যোগের জগতে প্রবেশ। ঘোষ পরিবার হল যোগের পরিবার। এই বাড়ি থেকেই বেরিয়েছিলেন স্বামী যোগানন্দ। আমেরিকায় তিনিই প্রথম ভারতীয় যোগ প্রচার করেন। প্রতিষ্ঠা করেন 'যোগদা মঠ', সে অন্য কথা।

এই যোগাযোগের ফলেই আমার সঙ্গে দু-জনের ঘনিষ্ঠতা হল। একজন বিখ্যাত যোগী

সূচীপত্রে যান

বুঢ়্ঢা বোস আর একজন সুখ্যাত ডাক্তার গৌরশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। আমাদের সকলের গৌরিদা। তিনি জার্মানিতে ছিলেন। জার্মান ভাষায় পারদর্শী। কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনে জার্মান ভাষা শেখাতেন। জার্মান ভাষায় ডাক্তারি বই লিখেছিলেন, যা ওদেশে পাঠ্যপুস্তক হয়েছিল। বিষ্ণুচরণ ঘোষের হাতে তৈরি 'যোগী'। 'যোগী' মানে যোগাসনে অসীম দক্ষতা। কমল ভাণ্ডারি, মনোতোষ রায়, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরিদার সমসাময়িক। এঁদের সকলেরই গুরু প্রখ্যাত যোগী বিষ্ণুচরণ ঘোষ, যাঁর দাদা স্বামী 'যোগানন্দ'। বুদ্ধ বসু (বুঢ়্ঢা) এই পরিবারের জামাতা। গড়পারের এই পরিবারটি একটি ইতিহাস।

আমার সঙ্গে গৌরিদার যখন দেখা হল, তখন তিনি ডানলপের কাছে একটি আশ্রম করেছেন, আশ্রমটির নাম 'জয়ন্তী মাতা-আশ্রম'। সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করছেন। তাঁর গুরু ছিলেন 'রামঠাকুর'। পরমগুরু হলেন 'নীলঠাকুর'। জানি না ভুল হল কি না। রামঠাকুরের শিষ্য নীলঠাকুর না নীলঠাকুরের শিষ্য রামঠাকুর। গৌরিদার কাছে অলৌকিক শক্তিধারী রামঠাকুরের কথাই শুনেছি। গৌরিদা তাঁর সাধনার কথা বলতে গিয়ে রামঠাকুরের প্রসঙ্গ বারে বারে আনতেন, বলতেন, 'গুরু আমার জীবনের সমস্ত পাশ কেটে দিয়েছেন। আমি তাঁর কৃপায় জীবন ঘিরে যে অতিজীবন আছে, তার স্বাদ পেয়েছি। এখন আত্মদর্শনের চেষ্টা। আমি যোগের চুরাশি রকমের আসন সহজেই করতে পারি। শীর্ষাসন ও তার বিভিন্ন ধরন আমার করতলগত। রাজযোগে প্রাণায়াম আমি আয়ত্ত করেছি। কুম্ভকে সারাটা দিন কাটাতে পারি। সাধারণ মানুষের চেয়ে আমার শ্বাস প্রশ্বাসের মাত্রা অনেক কম। এসবই গুরুকৃপা। ইচ্ছে করলে তুমিও পারবে। তোমাকে একটা কথা বলি—'মানুষ একতলায় থাকলে যা দেখে একশো তলায় উঠলে আরও অনেক বেশি দেখে। আর অনন্তের কাছাকাছি উঠলে সে আর কিছু দেখে না, তখন সমাধি। জানো তো, আমার ইষ্টদেবী হলেন জয়ন্তী মাতা—মা দুর্গারই একটি রূপ। দশমহাবিদ্যারই এক বিদ্যা। জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী ষোড়শী, ধূমাবতী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা। তন্ত্রসাধকের শেষ সাধন হল ছিন্নমস্তা। নিজের রুধির নিজে পান করা। শ্যামা-সুধা-তরঙ্গিনী।'

গৌরিদা যখন এইসব কথা বলতেন, তাঁর আশ্রমের দোতলায় বসে তখন গা ছমছম করত। একদিন চেপে ধরলুম। তখন সন্ধ্যাশেষ হয়ে ওই নির্জনে রাত নামছে। একসময় ওই জায়গায়

বিশাল হোগলা বন ছিল। মানুষ ভয়ে যেত না। ডাকাতের ভয়ে। তখনও শহর ওই অঞ্চলটিকে গ্রাস করেনি।

গৌরিদা বললেন, শোনো, সাধনলব্ধ শক্তি কারোকে দেখাতে নেই। তবে, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তুমি ঠিক কোথায় কোন জায়গায় থাকো আমি জানি না। তবে রাত দুটোর সময় তুমি আমাকে তোমার ঘরে দেখতে পাবে। তোমার ঘরের বর্ণনাটা আমি দিচ্ছি। দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা খুব খাড়া। ভাঙা ভাঙা। একপাল্লার একটি বিশাল দরজা। মোটা বার্মা কাঠ। কালো রং করা। তোমার ঘরে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল আছে। দুপাশে দুটি চেয়ার। একটার হাতল আছে; আর একটার নেই। তুমি একটা তক্তপোশে শোও। বিছানার কোনো বাহার নেই। মোটা নেটের মশারি। ঘরে একটা দেওয়াল আলমারি আছে। তুমি জেগে থেকো না। আমি গেলেই তুমি জেগে উঠবে। আমি ওই হাতলছাড়া চেয়ারটায় বসব। আর একটা শব্দ করব যা তোমার ঘুমের ভেতর দিয়ে কানে পৌঁছবে। সমুদ্রের ভাঙা ঢেউয়ের মতো।'

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। বাড়িটির নিখুঁত বর্ণনা। যেন বহুবার গিয়েছেন। গৌরিদা অদ্ভুত একটি কথা বললেন—'মানুষ যেমন লটবহর নিয়ে বেড়াতে পারে, সেইরকম একেবারে কিছু না নিয়েও বেড়াতে পারে। এমনকী দেহ ছাড়াও বেড়ানো যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ইচ্ছা ও ইচ্ছার শক্তি। বাইবেলে পড়নি—Let there be light, and there was light। আমি বললুম, 'গৌরিদা' আপনার কাছে যা সহজ আমার কাছে তা ভয়ংকর কঠিন। এমন কী, অবিশ্বাস্য।' তারপরে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'জীবন তো এই সবে শুরু করলে, দেখাটা বাড়ালেই বুঝতে পারবে ভারতবর্ষ হল আধ্যাত্মিকতার দেশ। শঙ্করাচার্য যা করে গেছেন তা কি গল্পকথা। গৌতম বুদ্ধের সাধনা কি পণ্ডশ্রম। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ কি শুধুই রসগোল্লা খেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ কি মিথ্যাবাদী।'

বাড়ি ফিরে এলুম, ক্যালেন্ডারটা একবার দেখলুম, অমাবস্যা। জানলায় ঝুলছে মিশকালো আকাশ। পাশের কালীবাড়িতে মধ্যরাতের আরতির ঘণ্টা শুরু হয়েছে। শুয়ে পড়লুম। চিত হয়ে শোয়াটাই আমার স্বভাব, মাথার ওপর মশারির চাল। মশারির বাইরে থইথই অন্ধকার। ঘুম আসতে দেরি হল না। যদিও জেগে থাকার চেষ্টা করেছিলুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ভুলেই গিয়েছিলুম গৌরিদা কী বলেছিলেন। পাশের ঘরে বাবা শুয়ে আছেন, তৃতীয় আর

কেউ নেই। পিতা-পুত্রের সংসার। হঠাৎ দেখি হাতলহীন চেয়ারে গৌরিদা বসে আছেন। কোনো কথা বলছেন না। টেবিলের উপরে একটা কিছু রেখেছেন। তাড়াতাড়ি উঠে মশারির বাইরে বেরিয়ে এলুম। চেয়ার খালি। কেউ কোথাও নেই। ঘরে একটা সুন্দর গন্ধ আর শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর একটি শ্বেত শঙ্খ। এমন সুন্দর শাঁখ এ বাড়িতে ছিল না। কী হল বুঝতে বুঝতেই ভোর হয়ে গেল।

সূচীপত্রে যান

‘একি তুমি এখানে!’ প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে বেড়াচ্ছি

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

তখন পুলিশ কমিশনার কে ছিলেন মনে নেই, কিন্তু তাঁর ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে জার্নালিজম পড়তেন। ভীষণ ভালো ছেলে, মিশুকে, অমায়িক। একদিন আমাকে বললেন দ্যাখ, কাল অমাবস্যা। আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি। প্রথমে একটু ভয়ভয় লাগবে, আমারও লেগেছিল। কিন্তু পুরো জায়গাটায় সাধনা গমগম করছে। পা রাখলেই কীরকম একটা অনুভূতি হয়। কিন্তু সারারাত থাকতে হবে। আমি বললুম, সে কোনো ব্যাপার নয়, রাত জাগায় আমার ভয় নেই, বরং রাতে আমি জেগে থাকতে ভালোবাসি। আমি যেখানে থাকি, তার কিছুটা দূরে স্বামী সত্যানন্দের আশ্রম। সেখানে এক বড়ো সাধিকা থাকেন, তাঁর নাম সতীমা। গঙ্গার ধারের নাটমন্দিরে সাধিকারা সারারাত জপ করেন। তিনটে পাশই খোলা। পশ্চিমে গঙ্গা, পরপারে বেলুড় মঠ। সাধনভজনের শ্রেষ্ঠ জায়গা। সতীমা আমাকে বলেছেন, 'রাত দুটোর সময় বাতাস ঘুরে যায়। পৃথিবীটা যে নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে, ধ্যানের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে তা বেশ বোঝা যায়। তুই যদি এখানে একদিন সারারাত জপধ্যানে বসিস, তাহলে কত কী যে দেখতে পাবি, শুনতে পাবি, তার ইয়ত্তা নেই। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের উদ্যানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব অভিজ্ঞতা ও দর্শন হয়েছিল, তা এখানেও হতে পারে। কিন্তু সাধনা করতে হবে। আমি একদিন ঠাকুরের মতোই দেখলাম, গঙ্গার জল থেকে মহাপ্রভু সংকীর্তনের দল নিয়ে উঠলেন। হরিনাম করতে করতে গেটের দিকে চলে গেলেন। আর একদিন দেখলাম, একশো আটটা প্রদীপ বাতাসে ভাসতে ভাসতে বেলুড় মঠের দিক থেকে এই আশ্রমে দিকে আসছে। শিখাগুলো একটুও কাঁপছে না। মাঝে মাঝে এইরকম একটা অনুভূতি হয় যেন পৃথিবী শ্বাস ফেলছে।

জায়গাটার নাম নিমতা। আমি ও আমার বন্ধু রাত আটটার সময় একটা আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলুম। নির্জন, নিরিবিলি, অনেকটা জায়গা। সবটাই প্রায় বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটাই একতলা কোঠা বাড়ি। বাকি সব চালা। শীতের রাত, মাটি থেকে একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে। মাঝে মাঝে যখন বাতাস ছাড়ছে, তখন শরীর কেঁপে উঠছে। ঢোকার মুখ থেকেই দেখলুম অনেকটা দূরে একটা শামিয়ানা। সেখানে অনেক লোকের ভিড়। আলো জ্বলছে। সেখানে আলো খুব ঘন,

সূচীপত্রে যান

তারপর গোটা এলাকাটায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এক পাশে তিন-চারখানা দামি মোটর গাড়ি পার্ক করা। পরে জেনেছিলুম, অনেক বড়ো বড়ো লোক, মন্ত্রী, ডাক্তার, সরকারি কর্মচারী এখানে অমাবস্যার রাতে আসেন।

আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষ ওই বৃহৎ যজ্ঞে কেন এল, কার আকর্ষণে এল— সেটা বুঝলুম শেষ রাতে। সারারাত ধরে কালীপুজো হল। মায়ের দিকে তাকিয়ে আসনে বসে আছেন সাধক। আমি পিছন দিক থেকে তাঁকে দেখছি। মায়ের মূর্তি মনে একটা ভয় জাগাচ্ছে। অন্যান্য জায়গায় মাকে যেমন দেখি—হাতে খড়্গ থাকলেও মুখে মধুর হাসি। এই মা সেরকম নন। এঁর আলাদা তেজ। দুটো চোখে আলাদা জ্যোতি। ত্রিনয়নে কী লাগানো হয়েছে, বুঝতে পারলুম না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন আলো ঠিকরে আসছে, তাতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।

রাত ক্রমশ ভোরের দিকে এগোচ্ছে। তিনি একভাবে পুজো করে যাচ্ছেন। শরীর যেন পাথর তৈরি। হঠাৎ তিনি আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, পূজার স্থানের গণ্ডি ছেড়ে সকলের সমস্ত রকম স্পর্শ বাঁচিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। হাতে একটা মাটির পাত্র। হনহন করে এগিয়ে চললেন উত্তরের দিকে। আমরা যেখানে ছিলুম, সেখানেই রইলুম, কেবল শুনতে পেলুম তাঁর কণ্ঠস্বর। কাকে যেন ডাকছেন, আয় আয়। অন্ধকার আকাশ, চারপাশ নিস্তব্ধ। তারারা সব বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত। একটা হুটোপুটির শব্দ হল। দূর থেকে দেখছি পুরো জায়গাটা প্রথমে ঘন কালো হয়ে গেল, তারপর নড়তে লাগল। তিনি ফিরে আসছেন। সরল ঋজু চেহারা। টকটকে লাল কাপড়, গলায় লাল উত্তরীয়। রুদ্রাক্ষের মালার পাশে স্ফটিকের মালা। যখনই আলো পড়ছে, তখনই ঝলসে উঠছে। ফিরে এসে আসনে বসে পড়লেন। সারা ঘরে অদ্ভুত একটা গন্ধ।

আমার বন্ধু আমাকে ইশারা করল, ওঠ। আমরা দুজনে একটু নির্জনে চলে এসে সেই জায়গাটির দিকে সাহস করে এগিয়ে গেলুম। খুব কাছে যাওয়ার দরকার হল না। তার আগেই দেখতে পেলুম, কমপক্ষে একশোটা শেয়াল। তারা মহাপ্রসাদ খাচ্ছে। আলো ফুটল।

পূজা শেষ, বসার ঘরে সেই সাধক এসে বসেছেন। আমার বন্ধু আমাকে তাঁর সামনে হাজির করতেই তিনি চমকে উঠে এই কথাই বললেন, 'একি তুমি এখানে!' আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলুম। এরপর তিনি একটিও কথা বললেন না। তাঁর ওই প্রশ্নটি নিয়ে জীবনপথে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি কোথাকার মানুষ, কী কারণেই বা এখানে—এই ভাবনাটি চিরকালের জন্য আমার মধ্যে ভরে দিয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। এই প্রশ্নের উত্তর আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। এই সাধকের নাম অনেকেই জানেন—নারান (নারায়ণ) ঠাকুর।

সূচীপত্রে যান

আয়নায় দেখতে গিয়ে দেখি যন্ত্রণাক্লিষ্ট বৃদ্ধার মুখ

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আসানসোলের 'আপকার গার্ডেন্স' পশ এলাকা। কলকাতার 'নিউ আলিপুর'-এর মতো। সেখানে আমাদের এক আত্মীয় থাকেন। সুখী পরিবার। কোনো ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই। একটি মেয়ে একটি ছেলে প্রাণপণে লেখাপড়া করছে। মেধাবী। মানচিত্রের মাথায় উঠবেই উঠবে। বহুবার আসার আহ্বান জানালেও সুযোগ হয়নি। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের আদি পর্বের সঙ্গে আমার যোগ ছিল। তখন গঠনের কাল। বীরেন মহারাজ দায়িত্বে। শিল্প সঞ্চালনে রয়েছেন প্রখ্যাত শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরেন মহারাজ পরে কানাডা মিশনে চলে গেলেন। অধুনা প্রয়াত।

সরকারি কাজে পুরুলিয়ায় গিয়ে যেমন তেমন একটা হোটেলে উঠেছি। হাড়কাঁপানো শীত। ঠান্ডার আক্রমণে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। বাজারে বীরেন মহারাজের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। দুজনেই অবাক। দেওঘর বিদ্যাপীঠের স্মৃতি উথলে উঠল। কিছুক্ষণ সেইসব আলোচনা হল, পথের একপাশে রোদে দাঁড়িয়ে। বীরেনদা বললেন, হোটেলে থাকা চলবে না, এখুনি আমার ওখানে চল। সঙ্গে সঙ্গে পুঁটলি-পাটলা নিয়ে বীরেনদার সঙ্গে বিদ্যাপীঠে। বিশাল জায়গা। একটা গ্রাম বিশেষ। তখনও তৈরি হচ্ছে। কত কী হবে। তখন ধু ধু মাঠ। এখানে-ওখানে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা বাড়ি। শীতের রোদে ঝলমল করছে। বিহারী শীতের বাতাসে কাঁপুনি ধরছে। হাসপাতাল বাড়িটি সদ্য সমাপ্ত। বিদ্যালয় ভবন প্রায় শেষ। ঠাকুরের মন্দির তৈরি প্রায় শেষ। রামানন্দবাবুর অলংকরণ। থাকার ব্যবস্থা হল সদ্যসমাপ্ত সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে। তারপর গভীর চাঁদনী রাতে যা হল, স্পাইনচিলিং অভিজ্ঞতা। সে-কথা এখানে নয়। এখানের কথা পুরুলিয়ার অতীতকে স্পর্শ করে আসানসোলে।

আমাদের এই আত্মীয়টির বাড়িতে খানিক মজা আছে। বেশ বড়ো দোতলা বাড়ি। বাগান আছে পরিমাপ মতো। বড়ো গাছ, ছোটো গাছ, ফুলগাছ। এক সময় আরও ভালো ছিল,

সূচীপত্রে যান

যখন পরিবারের সকলে জীবিত ছিলেন। শুরুটা ভালোই হয়, শেষটা নিয়েই সমস্যা। শুরু আর শেষ নিয়েই বাঙালির যত দার্শনিকতা। ফুচকা দেখে লাফাবে, পরক্ষণেই অম্বলের ওষুধ খাবে। বাড়িটার দোতলায় উঠতে হলে পাশের রাস্তায় বেরোতে হবে। সেইদিক দিয়ে আরেকটা সিঁড়ি দোতলার বারান্দায় অর্থাৎ দোতলাটা একতলা থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি অতিথি। প্রথম রাত। ওই দোতলায় আমার শয়নের ব্যবস্থা হল। বড়ো বড়ো ঘর। লাল ঝকঝকে মেঝে। বিশাল একটা খাট। চারজন সহজেই শুতে পারে। একা আমি। গ্রিল দিয়ে ঘেরা চওড়া বারান্দা। একটা আম গাছ ঝুঁকে আছে। আমের সময় হাত বাড়িয়ে একটা, দুটো আম পেড়ে আনা যেতে পারে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট গাছটাকে বেশ আলোকিত করেছে, যেন উৎসবের রাত। নির্জনতার উৎসব। একটা কিছু বেজে উঠলেই হয়। পাশেই কয়লা অঞ্চল। রেল শহর। মিশনারি স্কুল। রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল। ব্রিটিশ আমলে আসানসোলে অনেক দাপুটে সাহেব, মিশনারি আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছিলেন। রানিগঞ্জের রানি—বর্ধমানের মহারানি। ব্রাহ্মদের প্রভাব প্রতিপত্তি এদিকে খুব ছিল। এই অঞ্চলের অতীত ভাবলে মন কেমন করে। এক সময় চেঞ্জের জায়গা ছিল। কারমাটারে বিদ্যাসাগর মহাশয়। মধুপুরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গিরিডির ব্রাহ্মপল্লি। শিমুলতলার বাঙালি।

কিছুক্ষণ এইসব ভাবনায় বিভোর থাকার পর বারান্দা অভিযানে বেরলুম। ডানপাশে বহুদূর চলে গেছে। যেন No man's land, একেবারে শেষকালে ধাপ বেয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠেছে। বাথরুম ইত্যাদি। ফাঁকা ফাঁকা আরও অনেক ঘর। একটা গা ছমছমে পরিবেশ। আমি যে ঘরে থাকব, সেই ঘরের আলো পিচকিরির মতো বারান্দার খানিকটা জায়গায় এসে পড়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে জল পড়ে আছে। হইচইশহর বেশ কিছুটা দূরে। রাত ক্রমশ থকথকে হচ্ছে। বোধহয় ঘোর অমাবস্যা।

হঠাৎ লক্ষ করলুম, দরজার সামনে বারান্দার যে অংশ, সেখানে একটা সুন্দর ড্রেসিং টেবিল। ওটা ওখানে কেন? ঘরের তো অভাব নেই। টেবিলটার কাছে গেলুম। আয়না থাকলেই মুখ দেখতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা দেখি তো, আজকে মুখটা কেমন দেখাচ্ছে। চমকে উঠলুম। আয়নায় যন্ত্রণাক্লিষ্ট এখ বৃদ্ধার মুখ। এ মুখ কার? এ তো আমার মুখ নয়। কপালে হাত দিলুম। আয়নায় যে মুখ ভাসছে, সে মুখে কিছুই হল না। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে আমার

দিকে তাকিয়ে। শীর্ণ একটি মুখ। কেউ কোথাও নেই। মুখটা যেন আয়নায় আটকে গেছে।

আর কোনো কথা নয়। ঘরে এসে খাটে চিত। চোখ বুজিয়ে থাকাই ভালো। গবেষণার প্রয়োজন নেই। সন্দেহ নিরসনেরও দরকার নেই। হঠাৎ মনে হল কপালে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে। বরফের মতো ঠান্ডা। শরীর ক্রমশ অবশ হয়ে আসছে। চিন্তাশক্তি লুপ্ত। সকাল। ঝলমলে সকাল। দিনের আলোয় সাহস বাড়ে। প্রথমেই আয়নাটার সামনে গেলুম। আমার মুখ, কিন্তু এ কী? আমার কপালটা পুড়ে ঝুল কালো হয়ে গেছে। আর সামনের আমগাছের ডালে একটা মরা কাক ঝুলছে।

নীচে নেমে এলুম। প্রথমে ভেবেছিলুম, রাতের এই অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলব না। কিন্তু আমার কপাল। এল ফ্যামিলি অ্যালবাম। একটি ছবি। এই মুখ। সে এক লম্বা কাহিনি। ওই ঘরে বসে হোম করলুম। তারপর চণ্ডীপাঠ। বাড়ির প্রবেশপথের নিমগাছটি কেটে দিতে বললুম। কিন্তু প্রতিশোধ নিলেন সেই প্রবীণা। আচমকা মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় গৃহবধূ মাথায় আঘাত পেলেন। স্বপ্নে এলেন তিনি। বললেন, নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম, তোমার জন্য পারলুম না। তোমার ছোটো দাদুকে বলে দিও। আমি চলে যাচ্ছি তারাপীঠের মহাশ্মশানে।

এই বাড়ির কর্তা আসানসোলের এক সুপরিচিত মানুষ 'বেবোদা' নামে খ্যাত। ভালো নাম শৈলেন মুন্সি। সহধর্মিণী সোমা। পরোপকারী আত্মভোলা বেবোদার বাহন একটি মোটর সাইকেল, আর তাঁর আত্মার আত্মীয় হিমালয় ও গ্লেসিয়ার।

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

সিদ্ধ তান্ত্রিকের শেষ পুজো ছিন্নমস্তা, অমাবস্যায় রক্ত দিয়ে মায়ের পুজো করব

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

অনেকদিন আগে যুগান্তর পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছিল—গণপতি ম্যাজিশিয়ান এখনও জীবিত আছেন। যশ, খ্যাতি, ম্যাজিক— সব ছেড়ে দিয়ে তিনি এখন সিরিটি শ্মশানে একটি কুঠিয়ায় আছেন। মহা তান্ত্রিক। অনেকে জানতেন তিনি নিরুদ্দিষ্ট। অনেকটা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই। আমাদের বাড়ির কাছে কাশীনাথ দত্ত রোডে তিনি থাকতেন। সেখানে অনেকটা জায়গা নিয়ে একটি মন্দির করেছিলেন। এরপরে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। 'মিস্টিরিয়াস ডিস অ্যাপিয়ারেন্স' তখনকার বিখ্যাত স্টেটসম্যানে এইরকমই একটা হেডিং ছিল।

গণপতি একজন সেরা জাদুকর। সারা ভারতে তাঁর নাম। অনেক আধুনিক খেলা দেখাতেন। হুডিনির সমগোত্রীয়। আমাদের পূর্ব পুরুষদের মুখে তাঁর নাম অনেক শুনেছি। বিশ্ববিশ্রুত জাদুকর পি সি সরকারের কিছু আগে বা সমসময়ে গণপতি এই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কোথাও তাঁর কোনো জীবনী আছে কি না জানি না।

একদিন অফিসে বসে আছি, এমন সময়ে আমার এক শিল্পী বন্ধু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে—পড়েছিস, গণপতি বেঁচে আছেন। একটু জিরিয়ে নিয়ে প্রস্তাব দিল আজই, এখুনি আমরা শ্মশানে যাব। সেই প্রথম সিরিটি শ্মশানের নাম শুনলুম। জিজ্ঞেস করলুম, সেই শ্মশান কোথায়! তখন কলকাতায় তিন নম্বর বলে একটা বাসরুট ছিল। সরকারি। সে অনেকদিন আগের কথা। এই বাসের শেষ স্টপেজে নেমে কিছুটা হাঁটলেই আদিগঙ্গার তীরে ভয়ংকর একটা শ্মশান। অনেকটা তারাপীঠের মতো।

যখন আমরা দুজনে সেই জায়গায় পৌঁছলুম তখন প্রায় সন্ধ্যা। নির্জন জায়গা, সম্পূর্ণ অচেনা। ভগবানের এমনিই কৃপা, হঠাৎই একটি শবযাত্রীর দল হরিধ্বনি দিতে দিতে আমাদের অতিক্রম করে গেল। আর্কিমিডিস ইউরেকা বলেছিলেন, সুব্রত লাফিয়ে উঠল—মিল গিয়া।

সূচীপত্রে যান

আয় আমরা শবযাত্রী হয়ে যাই। তাহলে অবশ্যই শ্মশানে পৌঁছে যাব। দ্যাখ, মৃত মানুষও পথ দেখায়। সুব্রত এক মজার ছেলে। তার খামখেয়ালিপনার শেষ নেই। একবার সত্যনারায়ণ পার্কের কাছ থেকে একতাল সিদ্ধি আর লস্যি খেয়ে ডবলডেকারের দোতলায় উঠেছিল। ফুরফুরে বাতাসে কিছুক্ষণের মধ্যেই নেশা। বাস একটু কাত হলেই তার চিৎকার গেল গেল। শেষে পাবলিক তাকে গাঁজাপার্কের কাছে নামিয়ে দিল। সারারাত ফুটপাতে শুয়ে ওই একটা কথাই বলতে থাকল—গেল, গেল।

সুব্রত বলল—হরিবোল হরিবোল বল। হরিধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানে এসে গেলুম। এ নিমতলাও নয়, কেওড়াতলাও নয়। শ্মশানের জমি ঢালু হয়ে আদি গঙ্গায় নেমে গেছে। ওপরে যত রাজ্যের জঙ্গল, দু-একটা খড়ের চালা। সুব্রতর খুব আনন্দ। বললে, একেবারে তন্ত্রের জায়গা। সে আবার কায়দা করে শববাহকদের একজনকে জিজ্ঞেস করলে— মেসোমশাইয়ের কী হয়েছিল? ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন— মেসোমশাই নয় মাসিমা। যে ভদ্রলোক খই ছড়াচ্ছিলেন তাঁর ডোঙায় তখনও কিছু খই ছিল। আমাকে বলল, চাইব? আমি বললুম—খই কী করবি? তোর খিদে পাচ্ছে না, সুব্রত বললে।

লম্বা ধরনের একটা বাড়ি, চারপাশে চওড়া বারান্দা। কুঠিয়া বলাই ভালো। ঢোকার মুখে ডানদিকে ছিন্নমস্তার বিশাল এক মূর্তি। আকাশের আলো কমে এসেছে, আর ওই ছিন্নমমস্তার মূর্তি— বেশ ভয় ভয় লাগছে। ছিন্নমস্তাকে প্রণাম করা যায় কি যায় না জানি না। বড়ো করে একটা প্রণাম করলুম। কিছু চাইলুম না। এইবার আশ্রমের ভেতরে ঢুকছি, দেখি বারান্দার ওপাশ থেকে এপাশে একটি মেয়ে আসছে। কুচকুচে কালো রং, পরনে ডুরে শাড়ি, এলো চুল। এতবড়ো কোমর ছাপিয়ে অনেকদূর নীচে নেমে গেছে, ঘন কালো চুল। আমরা জিজ্ঞেস করলুম—এখানে কি সাধু গণপতি থাকেন? মেয়েটি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। কোনোরকম উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে যেন ভাসতে ভাসতে আর এক দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জুতো খুলে বারান্দায় উঠলুম। ঘরের দরজাটা ভেজানো। ভল ভল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। ধুনোর গন্ধ। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করতেই দেখতে পেলুম একটি তক্তপোশের ওপর বিশাল এক মানুষ বসে আছেন। চারপাশে ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। আমাদের দুজনকে দরজার সামনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গম্ভীর গলায় বললেন— ভেতরে এসো। আর ঠিক সেই সময় আদিগঙ্গার

অপর পারে এক সঙ্গে অনেক শেয়াল ডেকে উঠল। একটু দূরেই পড়পড় শব্দে চিতা জ্বলছে। পোড়া পোড়া গন্ধ। তিনি বললেন—বোসো। প্রণাম করার জন্য এগতেই এক ধমক। 'একদম এগোবে না। আমি কারও প্রণাম নিই না। আচ্ছা বলতে পার কে আমার এই সর্বনাশ করলে, কাগজে লিখে আমার শান্তি, স্বস্তি সব শেষ করে দিলে। কে চায় প্রচার।' সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারছি না—আপনিই কি গণপতি ম্যাজিশিয়ান। কী আশ্চর্য, হা হা করে হেসে বললেন, আমিই গণপতি ম্যাজিশিয়ান। তারপর আরও অদ্ভুত ব্যাপার, বললেন, সুব্রত। সুব্রত চমকে উঠেছে। নাম জানলেন কী করে।

গণপতি তখন বলতে শুরু করেছেন, 'ওই মেয়েটাকে বিয়ে করলে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।' এখানে বলে রাখি সুব্রত তাঁর কথা শোনেনি। বিয়ের পরেই তার স্ত্রী বিছানা নিলেন। সারা জীবন সুব্রত সেবাই করে গেল।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সুশীলবাবুকে আমার প্রণাম দিও। তিনিই আমাকে সংসার ছাড়া করেছেন। তিনিই আমাকে তন্ত্রের জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন। সিদ্ধ তান্ত্রিকের শেষ পূজা ছিন্নমস্তা। আগামীকাল শনিবার, অমাবস্যা আমি রক্ত দিয়ে মায়ের পুজো করব। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম— রক্ত কোথায় পাবেন? গণপতি বললেন, 'আমার শরীরেই তিন বালতি রক্ত আছে।' আমি খুব ভয় পেয়ে গেলুম। তারপর গণপতি বললেন, 'তোমার দাদুকে ধরে থাকো। তা না হলে জীবন বরবাদ হয়ে যাবে।'

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

আমার কোনো নাম নেই। আমি মায়ের সন্তান, বলেই অদৃশ্য হলেন

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

সভা সহজে শেষ হয় না। শুরু হতেও দেরি, শেষ হতেও দেরি। সময়ের মা-বাপ নেই। যার একটা গান গাইবার কথা তিনি তিনটে নামালেন। প্রথম বক্তার ভাষণ যেন লাটাইয়ের সুতো। তিনবার তাঁর কানের কাছে ফুসফুস করা হল, কিন্তু তাঁর ফুসফুসে প্রচুর বাতাস। কেবলই বলছেন, আমার বক্তৃতা দীর্ঘ করব না, পরে অনেক বক্তা আছেন। মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ এলে আমার আর সময়ের জ্ঞান থাকে না।

সভাস্থল বর্ধমান। ফাঁকা মাঠে বিরাট প্যান্ডেল। রাত এগারোটায় যাত্রা হবে। কলকাতার দল। চলবে সারা রাত। লোক হবে তখন। ধর্মসভায় কারও মতি নেই। বক্তারা ভগবানকে ইটপাটকেলের মতো কঠিন করে ফেলেন। শ্রোতারা আহত হন। আমি আর আদ্যাপীঠের মহাসাধিকা ও পণ্ডিত ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি টানা গাড়িতে। এই সাধিকা আমার মা। প্রথম পরিচয়েই বলেছিলেন শোন, তুই আমার ছেলে। তুই আমার মুখাগ্নি করবি।

রাত সাড়ে আটটায় কোনোক্রমে মুক্তি মিলল। মাকে প্রণাম করার জন্য স্ট্যাম্পেড। তারপর গাড়ি গাড়ি করতে করতে রাত নটা। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে তখনও খোলেনি। ভাঙাচোরা দিল্লি রোড। অবশেষে গাড়ি এল। চালকের বয়েস বেশি নয়। তিড়িং বিড়িং স্বভাবের। তার ভাবভঙ্গি বিশেষ সুবিধার নয়। দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা শুরু হল।

ফটফটে চাঁদের আলোর রাত। মা বললেন, একটা গান ধর না। মা গান ভালোবাসেন। তালে খুব দখল। তবলা বাজাতে পারেন। সেতার শিখেছেন। তবে সংস্কৃত ও শ্রীমদ ভাগবত তাঁর প্রথম ভালোবাসা। এম.এ. পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, সেদিন আর বাড়িতে গেলেন না,

সূচীপত্রে যান

সোজা আদ্যাপীঠে শ্রদ্ধেয় জ্ঞান ভাইয়ের কাছে। অথচ বনেদি বড়োলোকের বাড়ির মেয়ে। অসম্ভব মেধাবী, তেজস্বিনী। কারও পরোয়া করেন না। ভীষণ সাহসী। স্বদেশিদের সঙ্গে যোগ ছিল। আদ্যাপীঠের সংস্কৃত গ্রন্থাগারটি তাঁর স্বপ্ন। অতুলনীয় সম্পদ সেখানে আছে। গবেষণার পীঠস্থান।

চাঁদের আলোয় চারপাশ ঝক ঝক করছে। লম্বা রাস্তা। জনপদ আসছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। চাষের খেত। জনপ্রাণী নেই। দূরে দূরে গাছপালা ঘেরা গ্রাম। জলাশয়ে স্থির জল কাচের চাদরের মতো পড়ে আছে। গাড়ির চালক ছেলেটি একটু নড়বড়ে। বেলা মায়ের কোনো আক্ষেপ নেই। তিনি মুখে তিন তালের বোল বলে চলেছেন, আমার ভয় হচ্ছে উঁচু রাস্তা থেকে নিচের জমিতে না ফেলে দেয়। চড়া হেডলাইট জ্বেলে উলটোদিক থেকে একের পর এক ট্রাক আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, এই আলো পড়লে দেখতে পাও? সে বললে, না। আমি তখন চোখ বুজিয়ে থাকি। শুনে আমার পিলে চমকে গেল। মা বললেন, দাঁড়া, আদ্যাস্তোত্র পাঠ করি।

আমাদের উদ্বেগ নিমেষেই শান্ত হল। গাড়ি একটা ছোটো ব্রিজে উঠে থেমে গেল। জিজ্ঞেস করলুম, কী হল ভাই! চালক বললেন, তেল ফুরিয়ে গেছে। মা বললেন, তেল ঢাল। ছেলেটি বলল, এদিকে কোথাও পেট্রল পাম্প নেই। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তাহলে কী হবে? সে বললে, জানি না। এইবার মায়ের গলা চড়ল। জানি না মানে? আমরা এখন যাব কী করে? চালক বললে, সে কাল সকাল হলে বোঝা যাবে। মা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, তোকে আমার গুমগুম করে কিল মারতে ইচ্ছা করছে। চালক বললে, সে আপনি মারতেই পারেন, আপনি তো আমার মা। এমন তেঁটে ছেলে খুব কম দেখা যায়। রাত তখন অনেক। আমরা গাড়ি থেকে নেমে ব্রিজের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশে চাঁদের আলোর জোয়ার। বাঁদিকে ধানখেতের মাঝখানে ছোট্ট একটা ঘর। ওখানে বোধহয় পাম্পসেট থাকে। কোথাও কোনো গ্রাম নেই, লোকজন তো দূরের কথা। মা বললেন, হ্যাঁরে, এখানে

কি ডাকাত আছে! আমি বললুম, থাকতেও পারে। মা বললেন, কী আর নেবে।

ভীষণ উদ্বেগ, দক্ষিণেশ্বর এখনও অনেক দূরে। লরি চলাচলও কমে এসেছে। আমরা দুজনে মিলে আদ্যামাকে খুব ডাকছি। এমন সময় দূরে এক সাইকেল আরোহীকে দেখা গেল। আমাদের কাছে এসে গাড়ি থেকে নেমে নিজ্ঞেস করলেন, কী সমস্যা? মা বললেন, দেখ না বাবা, এমন বাঁদরের পাল্লায় পড়েছি, গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলছে তেল নেই। সেই মানুষটি জিজ্ঞেস করলেন— কোথায় যাবেন মা? আমরা আদ্যাপীঠে যাব। ভদ্রলোক ড্রাইভারকে বললেন, আমার সঙ্গে চল। দেখি কোথায় তেল পাওয়া যায়। ডিকি থেকে জেরিক্যানটা বের কর।

চালক ইতিমধ্যেই একটু ঘুমিয়ে নিয়েছে। সে অম্লানবদনে বললে, জেরিক্যান নেই। ভদ্রলোক ভীষণ রেগে বললেন, অয়েল মিটার না দেখে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিস। সঙ্গে একটা ক্যান নেই। তুই কী রকমের ড্রাইভার। ঠিক আছে চল। সাইকেলের সামনের রডে ওঠ। সাইকেল বাঁদিকের রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ কোথাও নেই। কোন জায়গায় আছি তাও জানি না। রাত একটা।

মা বললেন, হ্যাঁ রে, এই লোকটি হঠাৎ কোথা থেকে এল বলত। যেন আমাদের জন্যই এল। আমি বললুম, এইবার কী হবে বলুন তো। এই গাড়িটা তো আমাদের দায়িত্বেই পড়ে রইল। ভদ্রলোক ওদিকে কোথায় গেলেন তাও তো বোঝা যাচ্ছে না।

অনেকটা সময় চলে গেল। আমরা দুজনে অসহায়। অধৈর্য। বেশ খিদেও পেয়েছে। মায়ের চিন্তা আদ্যাপীঠের গেট বন্ধ। ঢুকবেন কী করে। এমন সময় দেখা গেল সেই সাইকেলটি আসছে। কী আশ্চর্য, ভদ্রলোক কোথা থেকে একটা ক্যান জোগাড় করেছেন। তেলও আছে। সাইকেল থেকে নামলেন। সাইকেলটা একপাশে কাত করে রাখলেন। মাকে প্রণাম করলেন। বের করলেন একটা বড়ো প্যাকেট। মায়ের হাতে দিয়ে বললেন, সেভাবে সেবা তো করতে পারলুম না। এই প্যাকেটে লুচি, আলুরদম আর মিষ্টি আছে। যেতে যেতে খাবেন। মা তাঁকে

টাকা দিতে গেলেন। ভদ্রলোক ততক্ষণে সাইকেলটা তুলে নিয়েছেন। তিনি বললেন, টাকা কী হবে? আশীর্বাদ করুন। আমি আপনার সন্তান। চিনতে পারছেন না মনে হচ্ছে। আমার কোনো নাম নেই। আমি মায়ের সন্তান। যেদিক থেকে এসেছিলেন সাইকেল সেদিকে চলল। এইবার যা হল সেইটাই আশ্চর্যের। মানুষটি নিমেষে অদৃশ্য। মা ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলিস। ছেলেটি বলল, সে আমি বলতে পারব না। গাড়ি স্টার্ট নিল যখন দক্ষিণেশ্বর ব্রিজে তখন ভোর হচ্ছে।

সূচীপত্রে যান

একটা ঝোড়ো হাওয়া
বয়ে গেল,
গাছের ডাল
ভাঙার শব্দ হল

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। গভীর থেকে গভীরতর কোমা। ডাক্তারবাবুদের চেষ্টার বিরাম নেই। শেষ জেনেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বাড়ির একটি ঘরকেই মোটামুটি নার্সিংরুম করা হয়েছে। একটা লোহার খাট, নার্সিংহোমে যেমন থাকে। আদ্যাপীঠের মহাসন্ন্যাসিনী বেলা মা এই খাটটি ম্যাটাডোরে চাপিয়ে নিজেই নিয়ে এসেছিলেন এই বাড়িতে। তখন রাত প্রায় দশটা। ম্যাটাডোরে খাট, খাটের ওপর ওই সাহসিনী বেলা মা। সেদিন যাঁরা জেগেছিলেন তাঁরা এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। শাস্ত্রের সত্য মিলিয়ে নিয়েছিলেন। শিষ্য যেমন গুরুকে সেবা করেন, প্রয়োজনে গুরুও সেইরকম শিষ্যের সেবা করেন। একটা লোহার খাটই শুধু এল না, ভালোবাসার সমুদ্রের একটি ঢেউ যেন আছড়ে পড়ল।

ফ্লুইড এবং ওষুধ ইন্টারভেনাস চলছে। পালা করে ডাক্তারবাবুরা আসছেন। একজন সিস্টার ছায়াও রয়েছেন। নিউরোসার্জেন বিগ্রেডিয়ার টি কে রায় বারে বারে আসছেন। মিলিটারি ডাক্তার, সহজে হাল ছাড়বেন না। সারা বাড়ির পরিস্থিতি থমথমে। মৃত্যুর ছায়ায় বসে জীবনের খেলা চলছে। ব্রেন টিউমারের রুগি। শেষ যে কথা বলেছিলেন— সে বড়ো অদ্ভুত। আমাকে বললে, আমি চললুম, তুমি যাবে না। আমি বললুম, নিয়ে গেলেই যাব। সে বললে, সুটকেস দুটো নামাও। জিজ্ঞেস করলুম, কীসের সুটকেস। বললে, কর্মফলের। শেষ কথা।

ক্রমশ, ক্রমশ দিন এগিয়ে আসছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে— 11 omen, অর্থাৎ আতঙ্কজনক অশুভ ঘটনা। প্রথমে একদিন এক বিশাল কালো চকচকে কুকুর দরজা জুড়ে শুয়ে পড়ল। একমাত্র সেন্ট বার্নার্ডেরই এইরকম বড়ো চেহারা হয়। রাস্তার কুকুর নয়, কিন্তু কোথা থেকে যে এল বোঝা গেল না। এই পল্লিতে কারও বাড়িতে কুকুর নেই। সদর দরজা আটকে শুয়ে আছে। আমরা পেছনের দরজা ব্যবহার করছি। কুকুরটার চোখ দুটো লাল ভাটার

সূচীপত্রে যান

মতো। প্রায় সন্ধে পর্যন্ত কুকুরটা একভাবে শুয়ে রইল। তারপর হঠাৎ কোথায় চলে গেল। কেউই বলতে পারলেন না এল কোথা থেকে, গেল কোথায়। পরের দিন, তখন বেলা এগারোটা। আমাদের বাড়ির মাথার ওপর সারা আকাশ শকুনিতে ছেয়ে গেল। তখন অনেক শকুনি ছিল। এখন Extinct. প্রায় ঘণ্টাখানেক চক্কর মারল। তারপরে কোথায় চলে গেল।

তখন আমাদের দিন কাটছে এইভাবে— সকালে কোনোরকমে খাওয়া, উদাস হয়ে বসে থাকা বা ঘুরে বেড়ানো। ভালো খবর তো কিছুই নেই। আর পালা করে রাত্রি জাগরণ। সেই রাত! অচেতন রুগি, ড্রিপ চলছে, আর একটিও শিরা নেই, প্রায় সবই অদৃশ্য। নিডল ঢোকাতে ডাক্তারবাবুকে ধৈর্য হারাতে হচ্ছে। রুগির অবস্থা আরও নরম হয়ে আসছে। তাঁকে একটা ডেরিফাইলিন, ডেকাড্রন দেবার ব্যবস্থা চলছে। রাত প্রায় দেড়টা। আমি এবং আমার ভাই একটু বিশ্রাম করার জন্য দোতলার দক্ষিণের ঘরে মেঝেতে আধশোয়া। খুচখাচ কথা হচ্ছে। খবর এল কবজিতে আর নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। ওপর বাহুর সন্ধিস্থলে একটু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। মানুষ কীরকম মৃত্যুটাকে মেনে নেয়। আমরা দুজনে তখন উত্তর ভারত ভ্রমণের কথা বলছি। যে ঘরে বসে আছি সেই ঘরের পুব দিকের জানলা ঘেঁষে বেশ বড়ো একটা ফলসা গাছ। এদিকে, ওদিকে তখনও বেশ ফাঁকা। হঠাৎ একটা বীভৎস শব্দ হল। তিনতলার ছাদ থেকে একটা ভারী কিছু ফলসা গাছের ডালপালা ভেদ করে সিমেন্ট বাঁধানো প্রবেশপথের উপর পড়ল। আর ঘরের দক্ষিণ দিকের বড়ো জানলার গ্রিলের নীচের পার্টিটা চোখের সামনে ধনুকের মতো বেঁকে গেল। সিমেন্টের টুকরো ছিটকে এসে পড়ল এপাশে-ওপাশে। আমরা লাফিয়ে উঠলুম। কেউ কি ছাদে গিয়েছিল, সেখান থেকে ঝাঁপ মারল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে নিচে নেমে এলুম। সেখানে একটা অন্য দৃশ্য। ডাক্তারবাবুর চোখেমুখে আতঙ্ক। কীরকম একটা ভয়ে কাঁপছেন। ছায়াদি বললেন, একটা ঝোড়ো হাওয়া ঘরের ভেতর থেকে বাইরে বয়ে গেল। আর মটমট করে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ হল। ডাক্তারবাবু আর পারলেন না। চেয়ারে বসে পড়লেন। এতটাই ভয় পেয়েছেন অজ্ঞান হয়ে গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকত না। সারা বাড়ি, বাড়ির বাইরে, আশেপাশে বাড়ির ছাদ তন্নতন্ন করে খোঁজা হল।

সূচীপত্রে যান

কোথাও একটা ইটের টুকরোও পাওয়া গেল না। যে ভারী বস্তুটি নীচে পড়েছিল তারও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। এতবড়ো একটা ঘটনা ঘটল কিন্তু কোথাও কোনো চিহ্ন রেখে গেল না। শুধু দোতলার জানলার গবরেটটা ভেঙে দিয়ে গেল। সারা বাড়িটা বাদ্যযন্ত্রের তারের মতো ঝাং শব্দে বেজে উঠেছিল। আমরা রুগির কাছে ফিরে এলুম। এটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না, পরিস্থিতি যেন বলতে চাইছে সময় হয়েছে নিকট এবার, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। নাড়ির স্পন্দন তখন গলার কাছে। এই মৃত্যু ওপর থেকে নীচে নামছে না, নীচে থেকে ওপরে উঠছে। প্রাণবায়ুর গতি হবে ঊর্ধ্বপথে। এমন মূর্খ আমি সেই মুহূর্তে এতেও আমি গৌরবান্বিত যে আমার স্ত্রীর মৃত্যু আধ্যাত্মিক ধরনের হচ্ছে। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা অভিজ্ঞ মানুষ, হতাশা মেশানো অদ্ভুত গলায় একটি কথাই বললেন—চলে গেল।

সূচীপত্রে যান

বিনা মেঘে বজ্রপাত

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যেদিন দেহ রাখবেন সেদিন সকাল এগারোটা, বারোটা নাগাদ বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছিল। সেই শব্দে মা, লাটু মহারাজ সবাই চমকে উঠেছিলেন। ঠাকুরের মেজদাদা রামেশ্বর কামারপুকুরে মারা গেলেন তখন গভীর রাত। কিছুটা দূরেই তাঁর বন্ধুর বাড়ি। তিনি বন্ধু রামেশ্বরের গলা পেলেন। বলছেন, আমি চললুম, তুই ওদের একটু খবর রাখিস আর রঘুবীরকে দেখিস। দরজা খোলার দরকার নেই কারণ আমাকে দেখতে পাবি না। কুকুরের সঙ্গে মৃত্যুর কি কোনো সম্পর্ক আছে? অবশ্যই আছে। পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথে একটি কুকুর সঙ্গী হয়েছিল। আর কুকুরদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। কুকুর অশরীরী দেখতে পায়। তখনই তারা হায়নার মতো কাঁদতে শুরু করে। বোঝা যায় অমঙ্গল আসছে। পুরাণে এইরকম অনেক বর্ণনা আছে। অমঙ্গলের আগাম ইঙ্গিত।

বছর ঘুরে গেল। মৃত্যু সয়ে এল। বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিনকয়েক আগে হুঁশিয়ারি এল। রাত দুটো, কয়েকজন দোতলায়, কয়েকজন একতলায়। গভীর ঘুম। হঠাৎ সারা বাড়ি কাঁপতে লাগল আর অদ্ভুত একটা আওয়াজ। সে আওয়াজটা এরকম হতে পারে— ভারী গলায় একদল মানুষ ওঁকার ধ্বনি করছেন। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী জেগে উঠলেন। সব আলো জ্বলল।

শুরু হল কারণ খোঁজা, যন্ত্রপাতি সব চেক করা হল। একটা খুব ভালো অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল। তাকে বাগানে ছেড়ে দেওয়া হল। সেই বীর অ্যালশেসিয়ান লেজ গুটিয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে খাটের তলায় ঢুকে পড়ল। কারা এসেছিল। কী কারণে এসেছিল। পরিবারের সদস্যরা বললেন— আমাদের মা মনে করিয়ে দিলেন আমার মৃত্যুর বয়স হয়েছে এক বছর। কাজ করতে ভুলো না।

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

কিছু লৌকিক
কিছু অলৌকিক

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

কামারপুকুরে খবর এল চন্দ্রাদেবীর কাছে, 'দক্ষিণেশ্বরে গদাধরকে দেখে এলুম। অবস্থা খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে না। মাথাটা বোধ হয় গেছে।' অবস্থাটা কীরকম! ঠাকুরের বর্ণনা— 'মন শরীরের দিকে একেবারেই নেই। মন দেহ থেকে উঠে গেছে। মাথার চুল বড়ো বড়ো। ধুলোমাটি লেগে আপনাআপনি জট পাকিয়ে গিয়েছিল। ধ্যান করতে বসলে মনের একাগ্রতায় শরীর যেন পাথর। স্থির। পাখিরা ভাবত জড়পদার্থ। মাথায় এসে বসত। ঠোঁট দিয়ে জটার ভেতর তণ্ডুলকণার খোঁজ করত। কখনো কখনো ভগবদ্বিরহে অধীর হয়ে মাটিতে এমন মুখ ঘষতুম যে কেটেকুটে গিয়ে জায়গায় জায়গায় রক্ত বেরোত। এইভাবে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনে সারাটা দিন যে কোথায় দিয়ে চলে যেত, সে হুঁশ আর থাকত না। পরে সন্ধেবেলায় চারিদিকে যখন শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠত তখন মনে হত, দিন চলে গেল, আর একটা বৃথা দিন—মার দেখা পেলুম না। তখন তীব্র আক্ষেপ। ভীষণ ব্যাকুলতা। স্থির থাকতে না-পেরে আছাড় খেয়ে মাটিতে, 'মা, এখনও দেখা দিলি না!' চিৎকার, ক্রন্দন। যন্ত্রণায় ছটফট করতুম। লোকে বলত, পেটে শূল ব্যথা ধরেছে, তাই অত কাঁদছে।'

উন্মাদ অবস্থা। গর্ভধারিণী বললেন, ওরে তোরা তাকে আমার কাছে এনে দে। আমি একবার দেখি। গ্রামের বিজ্ঞদের অভিমত—গদাধরকে ভূতে ধরেছে নির্ঘাত। একজন ওঝা এলেন। এই ওঝারা মনুষ্যলোকে থাকলেও—' প্রেতলোক এদের নিয়ন্ত্রণে— ভূত, প্রেত, ওঝা। আয় বললেই প্রেত এসে হাজির। ভূত কেন মানুষকে ধরে— সে ভূতেরাই জানে। আধুনিক বিজ্ঞানে এর কোনো উত্তর নেই।

কামারপুকুর অঞ্চলের শক্তিশালী ওঝা এলেন। অনেকের অনেক ভূত দেশীয় পদ্ধতিতে ছাড়িয়েছেন। এবার দক্ষিণেশ্বরের ভূতের সঙ্গে লড়াই। কৌতূহলী গ্রামবাসীরা জড়ো হয়েছেন। ঠাকুর নিজেই বলছেন, 'একটা মন্ত্রপুত পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিল; বললে, যদি ভূত হয়

সূচীপত্রে যান

তো পালিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না।' হলে কী হত! কে জানে? তিনি দেখতে পেতেন। তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এল। পঞ্চবটীতে সাধনকালে তিনি এমন কত কী দর্শন করেছেন। শরীর থেকে বেরুচ্ছে, শরীরে ঢুকছে। প্রথমে প্রবেশ করলেন 'সীতা'। তারপর যিশু, মহম্মদ। শরীর ছেড়ে বেরিয়ে এল পাপপুরুষ। শরীর অভ্যন্তরে সদাসর্বদা অবস্থান করছেন দণ্ডধারী এক রুদ্র সন্ন্যাসী। তিনি শাসক।

মন্ত্রপুত পলতে-পোড়া শুঁকে ঠাকুরের কিছুই হল না। তখন? মা সারদা বিস্তারিত জানাচ্ছেন। শ্বশুরবাড়িতে তিনি এসব শুনেছেন—'ঠাকুরের যখন মহাভাব হত বুকের ভেতর যেন সাতটা আগুনের তাওয়া জ্বলছে। তখন আমার ভাসুর (রামকুমার) তাঁকে দেশে নিয়ে এলেন। পাণ্ডবা থেকে একজন চণ্ড আনালেন। দেবতার ভর হতে সেই চণ্ড বললে, তাঁর ছেলেবেলার নাম করে, 'ও গদাই, তোমার এ মহাভাব ঈশ্বরের মহাকৃপায় হয়। এ রোগ নয়। তুমি অত সুপারি খেয়ো না। সুপারি বেশি খেলে পুরুষের ইন্দ্রিয় দোষ হয়।' ঠাকুর নিজে যা বলেছিলেন, 'পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিলে, কিছুই হল না। পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করে একদিন রাতে চণ্ড নামাল। চণ্ড পূজা-বলি পেয়ে প্রসন্ন হয়ে তাকিয়ে বললে, 'ওকে ভূতে পায়নি, ওর কোনো ব্যাধিও হয়নি।' তারপর সবার সমুখে আমাকে ডেকে বললেন, 'গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত সুপুরি খাও কেন? বেশি সুপুরি খেলে কাম বাড়ে।' আগে আমি সত্যিই সুপুরি খেতে বড়ো ভালোবাসতুম আর যখন-তখন খেতুম। চণ্ডের কথায় সেইদিন থেকে তা ত্যাগ করলুম।'

তাহলে প্রেতলোকের কোনো এক স্তরে চণ্ড আছেন। নিম্নস্তরের ভূত-প্রেতদের তিনি শাসন করেন। চণ্ড যোগিনী শ্মশানবাসিনী। গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন, 'ভূত দেখেছিস? ভাগ্যবান! এইবার ভগবানকে দেখবি।' ঠাকুরের পরিবার আধ্যাত্মিক পরিবার। পিতা ক্ষুদিরাম সদা অন্তর্মুখী। তাঁর বহু বিচিত্র দর্শন হত। সর্বদাই ঈশ্বরীয় ভাবে থাকতেন।

ক্ষুদিরামের কন্যা কাত্যায়নী দেবীর বিবাহ হয়েছিল আনুড়গ্রামে। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হলেন। ক্ষুদিরাম মেয়েকে দেখতে গেলেন। কাত্যায়নীর বয়স তখন প্রায় পঁচিশ। মেয়ের হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তা শুনে পিতার ধারণা হল—কাত্যায়নীকে ভূতে ধরেছে। ক্ষুদিরাম ঐশীশক্তিসম্পন্ন, আদর্শনিষ্ঠ, সৎ ব্রাহ্মণ। কন্যার সামনে স্থিরাসনে ধ্যানস্থ। মনে মনে বলছেন—

সূচীপত্রে যান

'তুমি দেবতা-উপদেবতা যেই হও, আমার মেয়েকে কেন তুমি এইভাবে কষ্ট দিচ্ছ? তুমি এখনই এই মুহূর্তে আমার মেয়েকে পরিত্যাগ করো।'

কাত্যায়নীর দেহ আশ্রয় করে যে প্রেতটি ছিল, সে ওই দেহের ভেতর থেকেই উত্তর দিল, 'কথা দাও, তুমি গয়ায় গিয়ে যথাবিহিত পিণ্ডদান করে আমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে। আমি ভীষণ কষ্টে আছি ক্ষুদিরাম। তুমি যে মুহূর্তে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার কন্যার দেহ ছেড়ে চলে যাব। প্রমাণস্বরূপ সামনের ওই নিমগাছের বড়ো ডালটি ভেঙে দিয়ে যাব।'

ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে গয়ায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কন্যার আরোগ্য নির্ভর করছে তাঁর এই যাত্রার ওপর। পদব্রজে গয়া যাবেন। পায়ে হেঁটে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গিয়েছিলেন, গয়া তাঁর কাছে পাশের গ্রাম। তিনি যাত্রা শুরু করা মাত্রই নিমগাছের নির্দিষ্ট ডালটি ভেঙে পড়ল, আর কাত্যায়নী অস্বাভাবিক থেকে স্বাভাবিক হলেন।

কে ভর করেছিলেন? এ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের একটি ধারণা ছিল। জমিদার রামানন্দ রায়ের চক্রান্তে ক্ষুদিরাম দেরেগ্রাম থেকে উৎখাত হলেন। পৈতৃক ঘরবাড়ি জমিজমা চলে গেল রামানন্দের গ্রাসে। সেই সময় তাঁর বন্ধু উদার হৃদয় সুখলাল গোস্বামী তাঁকে সসম্মানে কামারপুকুরে নিজের ভিটায় আশ্রয় দিলেন। এক বিঘার মতো ধানজমি লিখে দিলেন। ক্ষুদিরাম সপরিবার স্থিত হলেন কামারপুকুরে। তারপর তো বিরাট ইতিহাস— দিনে দিনে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুটছে।

কে ভর করেছিলেন কাত্যায়নীকে! লীলাপ্রসঙ্গকার গ্রামের কথা জেনে লিখেছেন— 'শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যুর পরে নানা দৈব উৎপাত উপস্থিত হওয়ায় পল্লীবাসীগণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, উক্ত গোস্বামী বা তদ্বংশীয় কোনো ব্যক্তি মরিয়া প্রেত হইয়া গোস্বামীদিগের বাটীর সম্মুখে যে বৃহৎ বকুল গাছ ছিল, তাহাতে অবস্থান করিতেন। ঐ বিশ্বাস প্রভাবেই লোক ঐ সময়ে কাহারও কোনোরূপ দিব্যদর্শন উপস্থিত হইলে বলিত, 'উহাকে গোসাঁইয়ে পাইয়াছে।'

স্বামী সারদানন্দজি একটি কথা ব্যবহার করেছেন— 'মরিয়া প্রেত হইয়া', অর্থাৎ মৃত্যুর পরে কেউ কেউ প্রেত হয় এবং নানা রকমের উপদ্রবের কারণ হয়। বিজ্ঞান তো এমন কথা মানবে না। স্বামী অভেদানন্দজির কাছে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন, মানবশরীরে

দুটি প্রধান উপাদান কাজ করছে—একটি হল 'মন' আর একটি হল 'প্রাণ'। দেহকোষ (cell), স্নায়ু (tissue) যে তরঙ্গে কম্পিত হচ্ছে— সেই তরঙ্গের নাম 'প্রাণ'। 'মন' এই প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মন হল Governor।

এই মন হল 'ডিরেকটর'। দেহধারীর সমস্তপ্রকার জৈব ক্রিয়া এই মনের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু এই মনের একজন ডিরেকটার বা নিয়ন্ত্রণকারী আছে। তার নাম Life force জীবনীশক্তি। এই শক্তিই হল 'আত্মা'। জীবাত্মা। দেহসম্পৃক্ত অহংবোধ— 'আমি'। দেহের সমস্ত কলকবজা এরই সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে। বেঁচে থাকার তাল লয় ছন্দ ঠিক করে দিচ্ছে। উন্নত বিজ্ঞান বলছে—একটি পরম-শক্তির মুঠোয় ধরা আছে সমস্ত প্রাণীর প্রাণ। এই শক্তিকে কী বলা হবে? আত্মারাম। মৃত্যুর সময় এই জীবাত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দেহ তখন প্রাণহীন একটা 'খাঁচা'। পাখি উড়ে গেছে। উপমাটা কাব্যিক হল। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বলতে হলে— বলতে হয় যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে।

স্বামী অভেদানন্দজি এই প্রসঙ্গে ফরাসি বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান দর্শনের উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুর সময় শরীর ছেড়ে যে বিশেষ বস্তুটি বেরিয়ে যায় সেই প্রাণবস্তুটির (life substance) নাম— 'এক্টোপ্লাজম'। একটি জ্যোতির্ময় পদার্থ। যাঁর বিশেষ দৃষ্টি আছে—তিনি দেখতে পান— দেহ পরিত্যাগ করে একটা 'আলো' বেরিয়ে গেল। এর কোনো আকার আকৃতি নেই—আলোকিত বাষ্প বলয়। এইটিই হল সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম প্রাণবস্তু। আত্মার অন্তর্বাস। একই শরীরে দুটি শরীর। একটি হল স্থূল, অন্যটি সূক্ষ্ম 'কারণ' শরীর—বায়বীয়। ফরাসি অ্যাম্বাসাডার ক্যামিলে ফ্ল্যামারিয়ান একটি বই লিখে গেছেন— 'The Unknown'। অভেদানন্দজি সেই বইটি পড়েছিলেন। ক্যামিল লিখছেন— এক্টোপ্লাজম বাষ্পের মতো বা মেঘের মতো একটি বস্তু, বিশেষ কোনো আকৃতি নেই; যেকোনো আকার, আকৃতি ধারণ করতে পারে। ছবিও তোলা যায়। মৃত্যুর পর দেহমুক্ত আত্মা প্রিয় পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে, দেখা দিতে চাইলে এই এক্টোপ্লাজমের সাহায্য নেয়। সব শরীরেই এই সূক্ষ্ম বস্তুটি বিদ্যমান। হিন্দু দর্শন অনুসারে মানুষের তিনটি শরীর— স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। আত্মা এই তিনটেরই ঊর্ধ্বে।

আত্মাই প্রধান বস্তু— জীবের আত্মা জীবাত্মা। পরম আত্মাকে বলা যেতে পারে—অক্ষয়, অদ্বয়, অনন্ত ব্রহ্ম। উপনিষদ বলছেন,

সূচীপত্রে যান

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

একই গাছে একই রকমের দুটি পখি, সর্বদা সংযুক্ত। একটি পাখি অহরহ নানারকম ভোগে ব্যস্ত। সংসারের ভোগ। অন্য পাখিটি নীরব, নিথর দর্শক মাত্র। প্রথমটি জীবাত্মা, দ্বিতীয়টি পরমাত্মা।

পরমাত্মা স্বরূপ— যিনি অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ, অজ্ঞাত প্রয়োজনে সৃষ্টির প্রাক্কালে নানা শক্তির সাহায্যে এই দৃশ্য জগৎ, বস্তু জগৎ রচনা করেছেন। লয়কালে বিশ্ব যাঁতে বিলীন হয়, স্থিতিকালে যাঁতে অবস্থান, তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা।

স্বামীজির এই সংগীতটি যেন 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ' সমগ্র :

'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ-সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর।'

'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ। এসব বেদান্তের কথা। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস হল লৌকিক বিশ্বাস। স্বামী অভেদানন্দজি বলছেন, যাঁরা সারাজীবন ভালো কাজ করেছেন—সৎ চিন্তা, সদ্ভাবনা, পবিত্র, ঈশ্বর আরাধনায় নিরত, মৃত্যুর পর তাঁদের আত্মা দেবপথে দেবলোকে যাবে— এর নাম 'দেবযান'। সাধারণ মানুষের আত্মার গমনপথ হল তার পিতার গমনপথ— 'পিতৃযান'। উপনিষদ বলছেন মৃত্যুর পর আত্মা দেহের বাইরে এসে কতকগুলি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে, যথা, ধোঁয়া, রাত্রি ও পনেরো দিনের অন্ধকার পক্ষ। প্রত্যেক আত্মার (soul) সঙ্গে থাকে একটি করে spirit। দেবদূত অথবা যমদূত। একজন সঙ্গী। গাইড। শাসক। খুব দ্রুত পৌঁছে যাওয়া গন্তব্যে। একজন মানুষ মারা যাওয়ার পর খাঁচাটা পুড়িয়ে দিলেও সারবস্তু আত্মাটা কিন্তু রয়ে গেল। আবার জন্মাতে হবে, আবার আবার মরতে হবে। জন্ম-মৃত্যুর চাকা ঘুরছে ঘুরছে। এইভাবে আসা, যাওয়া করতে করতে, পরিণত হতে হতে কোনো এক জন্ম হবে শেষ জন্ম। মুক্তি— আর জন্মাতে হবে না। স্বামী অভেদানন্দ বলছেন— মৃত্যু হল রূপান্তর, যেমন বীজ থেকে গাছ হল— বীজের মৃত্যু হল। তাই কি? না। বীজটাই

বৃক্ষে রূপান্তরিত। এই খেলার নামই সৃষ্টি। এক রূপ থেকে আর এক রূপ।

বলা হয়, বাবা! মরণকালে সাবধান। কামনা-বাসনার শেষ নেই। ভোগ বাকি থাকলে আবার আসতে হবে। প্রশ্নোপনিষদ বলছেন, 'এই জীব যেরূপ বাসনাযুক্ত ছিল, মরণকালে সেইরূপ সঙ্কল্পবিশিষ্ট হইয়া প্রাণবৃত্তিকে অবলম্বন করে। প্রাণ উদানবায়ু ও জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া ভোক্তা জীবকে যথা সঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যায়।'

ছান্দোগ্য উপনিষদে মরণকালের শেষ কথা আছে। অবাক করা কথা। 'মরণকালে প্রথমে বাক্ রুদ্ধ হয়। কথা বলার ক্ষমতা চলে যায়; কিন্তু মনের ব্যাপারটা থাকে; কারণ শ্রুতিতে আছে, মনে যা চিন্তা করা হয়, তাই লোকে বাক্যে প্রকাশ করে। পরে সুষুপ্তিকালের (নিদ্রা) মতো মন প্রাণে লীন হয়। সেই সময় মন না থাকার প্রমাণ এই যে, লোকে বলে, 'ইনি আর লোক চিনতে পারছেন না।' ওই প্রাণ আবার দৈহিক তেজে উপসংহৃত হয়, তখন উষ্ণতা অনুভব করে লোকে মনে করে— জীবন আছে। কিন্তু সব শেষে উষ্ণতাও ব্রহ্মে লীন হয়। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ। যে দাঁড়িয়ে আছে সে তার নিজের মুখের ছবি দেখছে। আয়নাটি ভেঙে গেল। প্রতিবিম্বিত মুখটি অদৃশ্য। সত্য মুখ, আসল মুখটিই রইল। ঠিক সেই রকম—মনোরূপ উপাধির (আমি অমুক, আমি তমুক) বিনাশ হলে তাতে উপস্থিত জীবও (ছায়া) সৎ-স্বরূপ হয়ে থাকে। 'আমি সৎব্রহ্ম' ব্রহ্মজ্ঞানীর এই জ্ঞান থাকায় তিনি ওই অবস্থা থেকে আর ফিরে আসেন না। কিন্তু জ্ঞানহীন মানুষ ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো আবার জেগে ওঠে। ফিরে আসে। দেহধারণ করে।' (ছান্দোগ্য : স্বামী গম্ভীরানন্দ)

উপনিষদের ঋষিরা এক বিস্ময়। তাঁরা দেহতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। শরীর—স্থূল শরীর, আর লিঙ্গ শরীর। আত্মার উপাধি এই লিঙ্গ শরীর— সেই কারণে একেও আত্মা বলা হচ্ছে। হৃদয়াকাশে এই লিঙ্গাত্মার অবস্থান। কঠোপনিষদ বলছেন, 'অঙ্গুষ্ঠীমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। যিনি ত্রিকালের নিয়ন্তা তিনি নির্ধূম জ্যোতিঃসদৃশ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ অন্তরাত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কারণে বারেবারে বলতেন—হৃদয় হল 'ডঙ্কামারা' স্থান।

প্রশ্নোপনিষদ জানাচ্ছেন— 'এই হৃদয়ে একশত এক প্রধান শিরা আছে। তাহাদের প্রত্যেকটির একশত শাখারূপ ভাগ আছে। প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বাহাত্তর হাজার প্রশাখারূপ

ভাগে বিভক্ত। এই নাড়ীসমূহের ব্যানবায়ু বিচরণ করে। সারা শরীরে নাড়ীর হিসাবটা দাঁড়াচ্ছে এই :

মূল নাড়ী ১০১; শাখা নাড়ী = ১০১ × ১০০ = ১০১০০; প্রশাখা নাড়ী = ১০১০০ × ৭২০০০ = ৭২৭২০০০০০; মোট সংখ্যা = ৭২৭২১০২০১ নাড়ী। সারাশরীর আচ্ছাদিত করে যে বায়ু বিচরণশীল— তার নাম ব্যান। 'সন্ধিদেশ (joints), স্কন্ধ (shoulder) ও মর্মস্থানসমূহে (সেইসব স্থান যেখানে আঘাত করলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু), বিশেষত প্রাণ ও অপান বৃত্তির মধ্যস্থলে এই ব্যান বৃত্তির প্রকাশ। বীর্যসাধ্য কর্মে লোকে ব্যানের সাহায্য গ্রহণ করে।' প্রাণ হল শ্বাস। অপানের গতি অধো দিকে। পাঁচটি বায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। 'প্রশ্নোপনিষদ' এইবার মৃত্যুর পরের অবস্থা বলে দিচ্ছেন :

'উদানবায়ু সুষুম্নাপথে ঊর্ধ্বগামী হয়ে পুণ্যকর্মের দ্বারা পুণ্যলোক, পাপের দ্বারা পাপলোক (নরক) আর পাপপুণ্যের সাম্যের দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়।' এই উদানবায়ু ধীরে ধীরে পদতল থেকে মাথার দিকে উঠতে থাকে।

অবশেষে উৎক্রমণ— মৃত্যু।

এই জটিলতার একটি সহজ সমাধান পাওয়া যাবে স্বামী অভেদানন্দজির সিদ্ধান্তে। ভোগের তৃষ্ণা, ভোগবাসনা থাকলে আবার দেহ ধারণ করতে হবে। মথুরবাবুর মৃত্যুর পর ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা হল, মথুরবাবুকে কি আবার জন্মাতে হবে? ঠাকুর বললেন, ভোগ বাকি আছে। এবার আরও বড়ো ঘরে আসবে। রাজা-মহারাজাও হতে পারে।

ক্ষুদিরাম গয়ায় গেলেন পিণ্ডদান করে প্রেত উদ্ধারে। তাঁর কন্যার দেহে কে ভর করেছিলেন? জীবলোকে তাঁর নাম, ধাম, গোত্র— তিনি কিছুই জানেন না। শাস্ত্র এই ব্যাপারে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। সূক্ষ্ম জগতে তিনটি লোক— আগেই এ কথা বলা হয়েছে— পিতৃলোক, দেবলোক, ঋষিলোক। যেন দুটি নদী—পিতৃলোক আর দেবাদিলোক। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম আত্মা এই অদৃশ্য দুটি লোককে যে অদৃশ্য সেতু যুক্ত করে রেখেছে তার উপর এসে দাঁড়ায়। দেহনির্গত আত্মা জাগতিক কর্মফলে পিতৃলোকে প্রবেশ করতে পারে— অনন্ত, অদৃশ্য সময়ের ধারা। এখানেও সুখ আছে দুঃখ আছে— ভোগ আছে দুর্ভোগ আছে। সবই আছে সূক্ষ্মে। সেসব ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকবে সেটকুর জন্যে নরলোকে আসতে হবে আবার।

সূচীপত্রে যান

শাস্ত্র এমন কথাও বলছেন— এই ফলভোগের জন্যে তুমি যে আবার জন্মাবে— সে মানুষ না হয়ে মনুষ্যেতর প্রাণীও হতে পার। পুরাণে এর প্রমাণ আছে অনেক। একালের বড়ো বড়ো সাধক বুঝতে পারতেন স্পষ্ট। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, যোগলব্ধ ক্ষমতায়।

দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কুকুর ছিল, নাম রেখেছিলেন 'কাপ্তেন'। সে সারাদিন চাঁদনিতে বসে থাকত গঙ্গার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে। প্রসাদ আর গঙ্গার জল ছাড়া অন্য কিছু খেত না। আর আরতির সময় মন্দিরে এসে আরতি দেখত— একভাবে বসে থেকে। তারাপীঠে বামদেবের এইরকম একটি বিরাট কুকুর ছিল। তারাপীঠে তান্ত্রিক সুশীলকুমারের 'বামদেব সঙ্ঘে' বামদেবের মন্দিরে বাবার মূর্তির একপাশে কুকুরটিরও মূর্তি আছে—একেবারে জীবন্ত।

মহাসাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজি অনেক দিন বৃন্দাবনে ছিলেন। তিনি জানতেন, সেখানে কুঞ্জে কুঞ্জে যত গাছ— সব গাছই এক একজন সাধক। বৃক্ষরূপ ধারণ করে আছেন। কারণ বৃন্দাবনের পুণ্য রজোস্পর্শ ত্যাগ করে তাঁরা দেবলোক, ঋষিলোক— কোনো লোকেই যাবেন না। চিরলীলার সঙ্গী তাঁরা। আজও বাজে সেই মোহনবাঁশি। গোপীদের কলকণ্ঠ। শ্রীমতীর পদধ্বনি। ওই যেমন বলে, 'আজও লীলা করেন গোরা রায়, কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।'

হল কী— এক শেঠ একটি কুঞ্জ কিনেছেন। সমস্ত প্রাচীন গাছ কেটে ফেলে কী-একটা করবেন। দুপুরবেলা গোস্বামীজি ঘরে তাঁর সাধন আসবে বসে আছেন। দেখছেন কী— প্রাচীন ঋষির মতো চেহারার একজন মানুষ তাঁর ঘরে ঢুকছেন। সাধক বিজয়কৃষ্ণ দেখেই বুঝেছেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে অতীত— 'আর কাকে বলব! তোমাকেই বলি, ওই শেঠকে তুমি বলে দিয়ো, আমগাছটা যেন না কাটে, ওই গাছটায় আমি আছি।'

গোস্বামীজি শেঠকে বললেন। শুনবে কেন? অনেক টাকা। টাকার গরম। গাছটা কাটা পড়ল। আর সাতদিনের মধ্যে শেঠ পরিবার কলেরায় নিশ্চিহ্ন। দেবলোক থেকে নরলোকে এসে মানবের হিতের জন্যে যাঁরা বিচরণ করছেন, তাঁরা প্রেত নন। স্বামী তুরীয়ানন্দজির জীবনের ঘটনা— তখন তিনি বৃন্দাবনে তপস্যা করছেন। সঙ্গে আছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজি। দু-জনের কঠোর তপস্যা চলেছে। তাঁরা আছেন কুসুম সরোবরের কাছে একটি আস্তানায়।

সূচীপত্রে যান

প্রতিদিন শেষরাতে জপ শুরু হত। একদিন রাখাল মহারাজের শরীর ভালো না থাকায় ভোরবেলা ঘুম ভাঙেনি। রাখাল মহারাজ বলছেন, 'এক বৈষ্ণব প্রেত এসে আমাকে তুলে দিলেন। ইঙ্গিতে বললেন, জপে বোসো।'

স্বামী তুরীয়ানন্দজি তাঁর জীবনের অদ্ভুত একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। তখন তিনি পুরীতে। ভীষণ অসুস্থ। তখন দেহে হাড় ক-খানা আর চামড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 'হাত-পা তুলতে বা পাশ ফিরতে পারতুম না। ছিল কেবল কথা বলার শক্তি। একদিন দেখলুম, দেহের ভেতরের প্রাণটা বাইরের আর একটার সঙ্গে তুমুল লড়াই করছে। দুজনে লুটোপুটি হল অনেকক্ষণ। একবার এ জিতছে, তো একবার ও। বাইরেরটা চাইছে, প্রাণটাকে দেহের ভেতর থেকে নিয়ে চলে যেতে, কিন্তু দেহস্থ প্রাণ যেতে চাইছে না। শেষে দেখলুম বাইরেরটা হেরে চলে গেল। কাজেই দেহস্থ প্রাণটা দেহের মধ্যেই রয়ে গেল। কিন্তু লড়াইয়ে না পারলে তার সঙ্গে চলে যেতে হত, আর এদিকে দেহটা পড়ে থাকত, আমার মৃত্যুও হত। আমি অবাক হয়ে যেন দূর থেকে এই লড়াই দেখলুম। বাইরের ওটা হেরে চলে গেল। আমি ওদের ডেকে বললুম, 'ওরে এবার বেঁচে গেলুম। এখন মরব না।' ইহলোক, পরলোক, দেবলোক, প্রেতলোক— একসঙ্গে অনেক শব্দ। প্রেত শব্দের অর্থ— ভূত, পিশাচ, মৃত, মৃতের আত্মা। পিশাচ শব্দের অর্থ—মাংসাশী প্রেতযোনি বা মাংসাশী ভূত। প্রেত পিণ্ড হল— সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডজল দান।

স্থূল শরীর চলে যাওয়ার পর সূক্ষ্ম শরীর থাকছে। দুটি ভবিষ্যৎ—হয় মুক্তি, কৈবল্যপ্রাপ্তি অথবা আবার ফিরে আসা। শ্রাদ্ধ শব্দটি এসেছে শ্রদ্ধা থেকে। শ্রদ্ধায় দান। যাঁকে দেওয়া হল, তিনি ভাবে, অনুভবে গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়ে সরে গেলেন। সূক্ষ্মে বিচরণের জায়গা তো কম নয়—অনন্ত।

পরিব্রাজক স্বামীজি তখন মাদ্রাজে। মাদ্রাজের সহকারী অ্যাকাউন্টেট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে অবস্থান করছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দজি স্বামীজির এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন, 'দিন কয়েক যাবৎ তিনি প্রেতাত্মাদের উৎপাত অনুভব করিতে লাগিলেন; তাহারা এমন সব খবর তাঁহাকে দিত, যাহাতে তিনি উদ্‌বিগ্ন হইতেন, অথচ পরে দেখা যাইত ঐসব ভুল। এইভাবে উৎপীড়িত হইয়া তিনি যখন ভূতদের উপর খুব চটিয়া গেলেন, তখন তাহারা

জানাইল যে, তাহারা বড়ো কষ্টে আছে, স্বামীজি যেন তাহাদের উদ্ধার সাধন করেন। পরিশেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্বামীজি তাহাদের উদ্ধারের এক উপায় স্থির করিলেন— তিনি সমুদ্রতীরে গেলেন ও তণ্ডুলাদির অভাবে মুঠো মুঠো বালুকা লইয়া পিণ্ডদানচ্ছলে উহাই দান করিলেন। তদবধি ভৌতিক উৎপাতও থামিয়া গেল। সমস্তপ্রকার কুসংস্কারমুক্ত স্বামীজি, বেদান্তী— তিনিও প্রেতযোনিতে বিশ্বাসী। বিশাল, বিপুল এই জগতে কোথায় কী হয়ে আছে— কে সঠিক বলতে পারে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে 'অন্ধ বিশ্বাস' বলে বকুনি খেয়েছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন—এটা আবার কেমন কথা হল? বিশ্বাস দু-রকমের হয় নাকি? একটার চোখ আছে, আর একটার চোখ নেই। বিশ্বাস, বিশ্বাস। বিশ্বাস একটা গোলমেলে ব্যাপার। এইরকম প্রবাদ— বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। ধর্মের জগতে বিশ্বাস প্রসঙ্গে অনেক গল্প আছে।

এই সময় মাদ্রাজে স্বামীজির জীবনে আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একদিন স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর মা দেহত্যাগ করেছেন। মন খুব খারাপ। স্বামীজি তখন মঠে, বাড়িতে চিঠি লিখতেন না। জনসমুদ্রে হারিয়ে গেছেন। স্বামীজির বিষণ্ণতা দেখে কলকাতায় তার পাঠালেন মন্মথবাবু। তারপর স্বামীজিকে নিয়ে গেলেন এক পিশাচসিদ্ধের কাছে। তিনি শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকেন। স্বামীজি দুটি কারণে যেতে রাজি হলেন— এক, মায়ের জন্যে উদ্‌বেগ, দুই, কৌতূহল— সত্যই এইরকম কোনো শক্তি আছে নাকি! প্রেত, পিশাচ, বশীভূত! তন্ত্রে এসব আছে। সাধনাপদ্ধতিও বলা আছে। লোকজীবনে অনেক গুপ্ত বিদ্যা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হয়।

স্বামীজি একা নন, একটি ছোটোখাটো দল। আছেন মন্মথবাবু, আলাসিঙ্গা, আর ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বালাজি রাও! প্রথমে রেল, তারপরে হাঁটাপথ। তাঁরা যে জায়গায় এলেন— সেটি একটি শ্মশান। শ্মশান-সংলগ্ন এক আস্তানায় সেই পিশাচসিদ্ধ বসে আছেন। শীর্ণ, কালো এক মানুষ। তাঁর অনুচরেরা স্থানীয় ভাষায় পিশাচসিদ্ধের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আলাসিঙ্গা দোভাষীর কাজ করলেন। পিশাচসিদ্ধ প্রথমে পাত্তাই দিলেন না। যখন সবাই চলে আসছেন, তখন বললেন, 'দাঁড়ান।' একটা পেনসিল নিলেন। একখণ্ড কাগজে নানারকম দাগ কেটে বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন। তারপর—প্রথমে স্বামীজির নাম বললেন, তারপর একে একে গোত্র, চৌদ্দপুরুষের নাম-ধাম। শেষে বললেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিয়ত স্বামীজির সঙ্গে

সঙ্গে ফিরছেন, ধর্মপ্রচারের জন্যে শীঘ্রই তাঁকে বহুদূরে যেতে হবে। কলকাতায় তাঁর মা সুস্থ আছেন।

মন্মথবাবুর বাড়িতে ফিরে এসে তার পেলেন—মা ভালো আছেন। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই মানুষটির নাম— গোবিন্দ চেট্টি। স্বামীজি আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর কুম্ভকোনামে এঁর সঙ্গে আবার দেখা হল। স্বামীজি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। মানুষটির সম্পূর্ণ রূপান্তর হল। সিদ্ধাই চলে গেল। ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হলেন।

ক্ষুদিরাম গয়ায় গিয়ে প্রেতকে উদ্ধার করে দেবতার পুণ্যাগমন সংবাদ নিয়ে কামারপুকুরে ফিরলেন। 'তুমি সৎ, সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ, আদর্শপরায়ণ, আমি তোমার কাছে আসছি।' গয়ার গদাধর এই স্বপ্ন দিলেন কামারপুকুরের ব্রাহ্মণকে। শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনবার্তা।

ক্ষুদিরাম মিতবাক, দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। হুজুগ অপছন্দ করেন। গয়া থেকে নিঃশব্দে ফিরে এলেন। স্বপ্ন দর্শনের কথা পরিবার-পরিজনকে বললেন না। অপেক্ষা! স্বপ্ন আগে বাস্তব হোক। চন্দ্রাদেবী সব কথাই স্বামীকে বলেন। না-বলে থাকতে পারেন না। একমাত্র আপনজন। তিনি তাঁর অলৌকিক দর্শনের কথা বলছেন, "দেখ, তুমি যখন গয়ায় গিয়েছিলে, তখন একদিন রাতে স্বপ্নে দেখছি কী, বিরাট এক জ্যোতির্ময় পুরুষ বিছানায় আমার পাশে। কী তার রূপ! কোনো মানুষের অমন রূপ হতে পারে না। ভীষণ ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে আলো জ্বালালুম। দরজা ভেতর থেকে যেমন বন্ধ, সেইরকমই বন্ধ, তাহলে ব্যাপারটা কী হল? ধনী আর প্রসন্ন বললে, 'স্বপ্ন দেখেছিস? খবরদার। পাঁচ কান করিস না।'

শুরু হল চন্দ্রাদেবীর নানারকম দিব্যদর্শন। দিব্যগন্ধে বাড়ি ভরে গেল। সবই হতে থাকল জাগরণে। এসব দর্শন একান্ত তাঁর। তিনি দেখছেন। স্বামীকে বললেন, "জানো, আজ দেখি হাঁসের ওপর চড়ে একজন এসে হাজির। দেখে ভয় হল—এ আবার কোন দেবতা। রোদের তাপে মুখখানি রাঙা হয়ে গেছে। দেখে মনটা কেমন করতে লাগল। আমি তখন ডেকে বললুম, 'ওরে বাপ হাঁসে চড়া ঠাকুর, রোদে তোর মুখটি যে শুকিয়ে গেছে, ঘরে আমানি পান্তা আছে, দুটো খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যা।' সে ওই কথা শুনে হেসে বাতাসে যেন মিলিয়ে গেল।"

ক্ষুদিরাম তখন গয়ায় তাঁর স্বপ্নদর্শনের কথা বললেন। সহজ, সরল, পবিত্র মন সূক্ষ্মে বিচরণ করে, তখন ভূত আর ভগবান সবই দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের গর্ভধারিণী সম্পর্কে বলছেন,

ভীষণ সরল। মনে কোনো প্যাঁচ নেই, পেটে কোনো কথা থাকে না। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করেন।

'দিব্যদর্শন'—সকলের হয় না। কেন হয় না? এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব। যেমন, কারো ধ্যান হয়, গভীর ধ্যান, কারো হয় না—তার ছটফটে মন। চন্দ্রাদেবী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর রাতে মা লক্ষ্মীর দর্শন পেয়েছিলেন। বড়ো ছেলে রামকুমার ভুরসুবো গ্রামে যজমান বাড়িতে পুজো করতে গেছেন। রাত বারোটা বেজে গেল ছেলে তবু আসে না। উদ্‌বিগ্ন চন্দ্রাদেবী বাড়ির বাইরে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। পূর্ণিমার রাত। নিস্তব্ধ পল্লি। রাস্তা চলে গেছে দূরে। চারপাশ ঝিমঝিম করছে। তাকিয়ে আছেন ছেলের আসার পথের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ দেখছেন ভুরসুবোর দিক থেকে কামারপুকুরের দিকে কেউ একজন আসছে। ভাবলেন, ছেলে আসছে—রামকুমার! কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। কোথায় রামকুমার! পরমাসুন্দরী এক রমণী। সর্বাঙ্গে অলংকার। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। সুন্দর শাড়ি। ফটফটে ফর্সা মুখ। বড়ো বড়ো, টানাটানা চোখ। কত চুল, সুন্দর খোঁপা। চন্দ্রাদেবী থমকে গেলেন। পল্লিতে এমন সুন্দরী তো কেউ নেই। অতি সরল চন্দ্রাদেবী বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তুমি কোথা থেকে আসছ?'

রমণী বললেন, 'ভুরসুবো থেকে।'

'আমার ছেলে রামকুমারের সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছিল মা! সে যে ভুরসুবোতেই গেছে যজমান বাড়িতে। এখনও ফিরছে না কেন?'

'সে যে বাড়িতে পুজো করতে গেছে, আমি সেই বাড়ি থেকেই আসছি। ভয় নেই, তোমার ছেলে এই ফিরল বলে।'

চন্দ্রাদেবী তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তোমার বয়স অল্প; এত গয়নাগাটি পরে এত রাতে কোথায় যাচ্ছ? তোমার কানে ওটা কি গয়না গো?'

রমণী মুচকি হেসে বললেন, 'এর নাম কুণ্ডল। আমাকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে।'

চন্দ্রাদেবী ভাবলেন মেয়েটি বোধ হয় বিপন্ন, বললেন, 'চলো না, আমাদের ঘরে আজ রাতের মতো বিশ্রাম করে কাল যেখানে যাওয়ার যাবে।'

সূচীপত্রে যান

রমণী বললেন, 'না মা, আমাকে এখনই যেতে হবে; তোমাদের বাড়িতে আমি অন্য সময় আসব।'

এই কথা বলে সেই সুন্দরী মহিলা চন্দ্রাদেবীর কাছে বিদায় গ্রহণ করে পাশেই লাহাবাবুদের অনেক ধানের মরাই ছিল সেইদিকে চলে গেলেন। রাস্তা না ধরে লাহাবাবুদের বাড়ির দিকে যেতে দেখে চন্দ্রাদেবী ভাবলেন মেয়েটি বোধহয় পথ ভুল করেছে। তিনি তাড়াতাড়ি সেইদিকে গেলেন কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। সব ফাঁকা, চারপাশ চাঁদের আলোয় ভাসছে। মরাইগুলোর ছায়া পড়েছে, সেই জায়গাটা অন্ধকার। অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, আর তখনই মনে হল এ আমি কাকে দেখলাম। স্বয়ং মা লক্ষ্মী নয়তো। দ্রুত ঘরে ফিরে এসে স্বামীকে সব বললেন। তিনি বললেন, 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীই কৃপা করে তোমাকে দর্শন দিয়েছেন।' কিছুক্ষণের মধ্যে রামকুমার ফিরে এসে সব শুনে বললেন, 'কী আশ্চর্য! মা তুমি সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীর দর্শন পেলে'। এইরকমই হয়। কাকে কখন কৃপা করেন ভগবান কেউ কি বলতে পারে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর উপমা সহযোগে ঈশ্বরের কৃপা বোঝাতে গিয়ে বলছেন, 'তিনি বালক স্বভাব। একটি বালক নতুন কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকে তার কাপড়টি চাইছে। সে দু-হাতে আঁকড়ে ধরে বলছে, কেন দেব? কিছু পরে একজন লোক যাচ্ছিল হঠাৎ কাপড়টা খুলে তাকে দিয়ে বললে, এই নাও। সেই লোকটি কাপড়টাকে পাগড়ির মতো জড়িয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। ভগবানের বালক স্বভাব। দেব দর্শন আর প্রেত দর্শনে বিশেষ তফাত নেই। দেবতারা কি আত্মা? পরমাত্মার কথা— জেনেছি। মেনেছি কি? স্বর্গ শুনেছি। এই শোনা পর্যন্তই। একালে স্বর্গ আর নরক কে বিশ্বাস করে। তবে একটাই কথা মহাপুরুষরা খামোখা কেন মিথ্যা গালগল্প ফাঁদবেন। বিজ্ঞান ছাড়াই মানুষ যুগ যুগ ধরে বেঁচে আসছে—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। আমাদের চেয়ে তাঁদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনেক বেশি ছিল।

কামারপুকুরের চট্টোপাধ্যায় পরিবারের যথেষ্ট বিশেষত্ব ছিল। সেটি হল সূক্ষ্ম অনুভূতি। একালের একটি কথায় স্পষ্ট—'ফাইন টিউনিং'। সকলেই একটু অন্যরকম। ভগবানের পরিবার। সেই কারণেই হয়তো।

ঠাকুরের জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, 'বালকের অসীম সাহস। বয়স্করা যেখানে

ভূত-প্রেতের ভয়ে জড়সড়, বালক সেখানে অকুতোভয়।' কীরকম! পিসিমা রামশীলার ওপর মাঝেমধ্যে মা শীতলার ভর হত। তখন তিনি একেবারে অন্যরকম হয়ে যেতেন। সেই সময় ভয়ে কেউ কাছে যেতে সাহস পেত না।

গদাধর কিন্তু ভয় পেতেন না, পিসিমার কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন— একজন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ হঠাৎ এমন হয়ে গেলেন কেমন করে! সব দেখেশুনে শেষে বললেন, আহা, পিসিমার ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়।'

যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে মায়ের কাছে এসেছেন। জনগণ বলছেন, দক্ষিণেশ্বরে তোমার ছেলে নিজের মতে শক্ত শক্ত সাধনভজন করতে গিয়ে মনে হয় উন্মাদই হয়ে গেছে। ক্ষুদিরামের দেহত্যাগের সময় চন্দ্রাদেবীর বয়েস ৪৪ বছর, গদাধরের বয়েস সাত বছর। জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, 'বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, শৈশবে মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং যৌবনে স্ত্রীবিয়োগ জীবনে যত অভাব আনয়ন করে এত বোধ হয় অন্য কোনো ঘটনা করে না।' ভুলে গেলে চলবে না— গদাধর গয়ায় ক্ষুদিরামকে স্বপ্নদর্শন দিয়ে বলেছিলেন—ব্রাহ্মণ! এবারের লীলায় তুমি হবে আমার পিতা। এইরকমই মনে হয়, মৃত্যুর দপ্তরটা ভগবানের হাতে নেই। ও যমরাজ যা করেন। 'কঠোপনিষদ'-ও সেইরকমই বলতে চাইছেন। নচিকেতা যমালয়ে গিয়ে যমরাজকে বলছেন, 'স্বর্গলোকে কোনো ভয় নেই, কারণ সেখানে আপনি নেই। ভয় পৃথিবীতে। পৃথিবী আপনার এলাকা। এখানে এই নিয়ম— 'সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ।।' মানুষ শস্যের মতো জীর্ণ হয়ে মরে এবং শস্যের মতো আবার জন্মায়। যমরাজ ভগবানের পিতাকেও রেহাই দেন না। এমনকী, ভগবানের পার্থিব দেহটাও কেড়ে নেন। ভগবানকে তো মারা যায় না। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডটাই উলটে যাবে।

পিতার মৃত্যুর পর থেকে গদাধর ভীষণ একা। কে বুঝবে তাঁকে। কামারপুকুরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে পিতার স্মৃতি। কামারপুকুরের পশ্চিমপ্রান্তের শ্মশানটির নাম—'ভূতির খাল', আর উত্তর-পূর্ব প্রান্তের শ্মশানটির নাম— 'বুধুই মোড়ল'। পিতৃশূন্য গৃহটিও যেন শ্মশান। গদাধর দিন ও রাত্রির বেশির ভাগ সময় হয় এই শ্মশানে, না হয় ওই শ্মশানে কাটান। বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ। চিতা জ্বলছে। মানুষের কান্না। বসে আছেন গদাধর। ইতিমধ্যেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছেন। মাঝে মাঝে 'শিবা বলি' দেন। এটি তান্ত্রিক পদ্ধতি। নতুন হাঁড়িতে মিষ্টান্নাদি

ভরে শ্মশানের নির্জন একটি স্থানে নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালের পাল এসে খেয়ে চলে যায়। 'উপদেবতাদিগকে তিনি এই সময়ে মধ্যে মধ্যে বলি প্রদান করিতেন। নিবেদিত আহার্যপূর্ণ হাঁড়ি সকল বায়ুভরে ঊর্ধ্বে উঠিয়া শূন্যে লীন হইয়া যাইত। ঐ সকল উপদেবতাকে তিনি অনেক সময় দেখিতে পাইতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে কোনো কোনো দিন গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর শ্মশানের নিকটে যাইয়া ভ্রাতার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিতেন, 'যাচ্চি গো, দাদা, তুমি এদিকে আর এস না, তা হলে এরা (উপদেবতারা) তোমার ক্ষতি করবে।'

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তখন কুঠিবাড়ির নিচের তলার একটি ঘরে থাকতেন। পশ্চিমের দরজা খুললেই গোল বারান্দা। সামনেই গঙ্গা। একদিন একা একা সেই ঘরে বসে খুব কাঁদছেন আর মাকে বলছেন, 'মা, নিরক্ষর, মুখ্যু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়।' কান্না আর থামে না। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। তারপর? তিনি নিজেই বলছেন সেদিনের অলৌকিক দর্শনের কথা— 'হঠাৎ মেঝে ফুঁড়ে কুয়াশার মতো ধোঁয়া উঠল। সামনেটা ঢেকে গেল। তারপর দেখি সেই ধোঁয়ার ভেতর ফুটে উঠল একটি মুখ। টকটকে ফর্সা। বুক পর্যন্ত দাড়ি। জীবন্ত, সৌম্য। ঐ মূর্তি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, 'ওরে! এই ভাবমুখে থাক, ভাবমুখে, ভাবমুখে থাক—তিনবার।' গম্ভীর কণ্ঠস্বর। তারপর মুখটি ধীরে ধীরে ধোঁয়ায় মিশে গেল। ধোঁয়াটাও আর রইল না।'

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে এক ব্রহ্মদৈত্য থাকতেন। ভূত যেমন প্রেতযোনি, ব্রহ্মদৈত্য সেইরকম দেবযোনি। মন্দির ও উদ্যান পাহারা দেবার জন্যে এসেছিলেন। এখন আর নেই। এঁরা আসেন সাধকদের সঙ্গে। 'সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই।' লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজি বলছেন, 'তোতাকে (ঠাকুরের বেদান্ত গুরু তোতাপুরী) ঠাকুর বলতেন ল্যাংটা। লম্বা, চওড়া, বিশাল। নাগা সন্ন্যাসী। কখনো ঘরের ভেতর থাকতেন না। অগ্নির উপাসক। সর্বদা অগ্নির সেবা করতেন। নাগা সাধুদের কাছে অগ্নি মহাপবিত্র। এঁরা যখন যেখানে সেখানেই 'ধুনি' জ্বলবে। সকাল-সন্ধ্যা ধুনিকে আরতি। ভিক্ষালব্ধ যা কিছু প্রথমে ধুনিরূপী অগ্নিকে নিবেদন, তারপর গ্রহণ। তোতাপুরী পঞ্চবটীতে গাছের তলায় থাকতেন। বৃক্ষতলে চামড়ার

আসন। পাশে জ্বলছে ধুনি। সম্বল লম্বা একটি চিমটা আর লোটা, একটি মোটা চাদর। চিমটা আর লোটা নিত্য মাজার ফলে ঝকঝকে। রৌদ্র হউক, বর্ষা হউক 'ল্যাংটা'র ধুনি সমভাবেই জ্বলিত। আহার বল, শয়ন বল 'ল্যাংটা' ওই ধুনির ধারেই করিতেন। আর যখন গভীর নিশীথে সমগ্র বাহ্যজগৎ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে সকল চিন্তা ভুলিয়া মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সুখশয়ন লাভ করিত, 'ল্যাংটা' তখন উঠিয়া ধুনি অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া অচল অটল সুমেরুবৎ আসনে বসিয়া নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির মনকে সমাধিমগ্ন করিতেন। গভীর নিশীথে তোতা একদিন ধুনি উজ্জ্বল করিয়া ধ্যানে বসিবার উপক্রম করিতেন; জগৎ নীরব, নিস্তব্ধ; ঝিল্লি ও মধ্যে মধ্যে মন্দির চূড়ায় অবস্থিত পেচকের গম্ভীর নিঃস্বন ভিন্ন আর কোনো শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বায়ুরও সঞ্চার নাই। সহসা পঞ্চবটীর বৃক্ষশাখাসকল আলোড়িত হইতে লাগিল এবং দীর্ঘাকার মানবাকৃতি এক পুরুষ বৃক্ষের উপর হইতে নামিয়া তোতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ধীর পদবিক্ষেপে পুরী গোস্বামীর ধুনির পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। 'ল্যাংটা' নিজেরই ন্যায় উলঙ্গ সেই পুরুষপ্রবরকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?' পুরুষ উত্তর করিলেন, 'আমি দেবযোনি, ভৈরব; এই দেবস্থান রক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষোপরি অবস্থান করি।' 'ল্যাংটা' কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, 'উত্তম কথা, তুমিও যা, আমিও তাই, এস বস, ধ্যান কর।' পুরুষ হাসিয়া বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেলেন।' (লীলাপ্রসঙ্গ)

পরের দিন তোতাপুরী ঠাকুরকে রাতের ঘটনার কথা বললেন। ঠাকুর বললেন, জানি। উনি অনেকদিন আছেন। আমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। কখনো কখনো ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা আমাকে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন। কোম্পানি বারুদখানার জন্যে পঞ্চবটীর সমস্ত জমিটা একবার নেবার চেষ্টা করেছিল। সেই শুনে আমার বিষম ভাবনা। কোথায় বসে মাকে ডাকব। মথুরবাবু মামলা ঠুকে দিলে। সেই সময়ে একদিন ওই ভৈরবকে দেখলুম, গাছে বসে আছেন। আমাকে সংকেতে বললেন, 'কোম্পানি জায়গা নিতে পারবে না। মামলায় হেরে যাবে।' বাস্তবিকই তাই হল।

বৃক্ষ আশ্রয় করে দেব, দেবতা, উপদেবতা, ভূত, ভৈরব থাকতে পারে। বিশ্বাস করলেও আছে, না করলেও আছে। জলে দু-মলিকিউল হাইড্রোজেন, এক মলিকিউল অক্সিজেন আছে—

সূচীপত্রে যান

কে দেখতে পায়। মানুষের মতো অক্সিজেনের দুটি হাত। দু-হাতে দুটি হাইড্রোজেন। স্নিগ্ধ পরিণতি. কল কল জলকল্লোল। জ্ঞানের জগতের শেষ কথাটা এখনও কেউ শোনাতে পারেননি। এই হল কথা।

রাজা মহারাজা তখন কাশীতে। সেবাশ্রমে আছেন। সেবাশ্রমের পেছন দিকে অনেকটা জমি সংযুক্ত হয়েছে। আশ্রম আরও বড়ো হবে। সেখানে একটি বেলগাছ আছে। গাছটি কাটা হবে। রাজা মহারাজ বললেন—খবরদার না। ওই বৃক্ষে এক উপদেবতা আছেন। 'স্পিরিট'। মহারাজজির এই কথাটি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ— 'নির্বিকল্প সমাধির পর যে ধর্মজীবনের আরম্ভ, তার ধারণা করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব।'

নিষেধ করায় বিল্ববৃক্ষ ছেদন করা হল না। শুভানন্দ বললেন, 'যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ তিনি সর্বভূতের আশ্রয়দাতা। দেহহীন প্রেতাত্মাও তাঁর দয়া লাভ করে।' প্রশ্ন হল, সাধন জগতের মানুষ কত কি দেখেন, শোনেন। সাধারণ মানুষ কেন সেই দর্শন ও শ্রবণে বঞ্চিত! স্বামী বিরজানন্দজি এই বিষয়ে লিখছেন, 'বিজ্ঞান সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং মননশক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে, তথ্য, পরিসংখ্যান এবং প্রমাণ সহকারে এই রহস্যভেদে প্রয়াসী হয়, অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এক জায়গায় এসে থেমে যায়।' তিনি লিখছেন, 'ইন্দ্রিয় এবং মনের দ্বারা গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান বহির্জগৎ— এই স্থূল পৃথিবী এবং মন, বুদ্ধি, অহমিকা এবং হৃদয়াবেগসমূহ দ্বারা প্রণিধানযোগ্য অন্তর্জগৎ— দুইই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত।'

এই যে বললেন— 'দুটিই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত'— এইটিই প্রকৃত বিজ্ঞানীর কথা।

রাখাল মহারাজ সেই স্তরে চলে গিয়েছিলেন— কী ভাবে? সাধনার ফলে। ঠাকুর বলছেন— তুমিও চলো, পথ খোলা আছে। স্বামীজির জীবনে যা ঘটছে স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবনেও তাই ঘটছে। এই ঘটনাটি ঘটল অযোধ্যায়। সেদিন একাদশী। মাধুকরী করে তুরীয়ানন্দজি কতকগুলো গেঁটে কচু সেদ্ধ পেলেন। তাই খেতে বসলেন মহানন্দে। কিছুটা খেয়েই রাজা মহারাজ চঞ্চল হয়ে উঠলেন গলার কুটকুটুনিতে। তুরীয়ানন্দজির গলাও ধরে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা চেপে গেলেন। বললেন, 'কই, আমার তো তেমন ধরেনি।' রাজা মহারাজের অবস্থা দেখে তিনি ছুটলেন টকের সন্ধানে। সেই সময় অযোধ্যায় খুব অন্নকষ্ট চলছিল। কোথায় পাবেন একটু তেঁতুল বা একটা লেবু! ঘুরতে ঘুরতে একটা লেবুবাগানে গিয়ে দেখেন, কয়েকজন খটিক

সূচীপত্রে যান

খাটিয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে। তিনি একটি লেবু চাইলেন। তারা বললেন, 'কোথায় পাব মহারাজ! সবে ফুল এসেছে।'

তুরীয়ানন্দজি হতাশ হয়ে বাগানের লেবুগাছগুলির দিকে তাকাতে তাকাতে কিছুদূর যেতেই দেখেন, একটা গাছে একটা মাত্র পাকা লেবু ঝুলছে।

তখন তিনি খটিকদের কাছে এসে বললেন, 'ভাই, আমাদের মহান্ত মহারাজের কচুসেদ্ধ খেয়ে গলা ফুলে গেছে, খুব কষ্ট পাচ্ছেন; গাছে ওই একটি পাকা লেবু রয়েছে তোমরা যদি লেবুটি আমায় ভিক্ষা দাও তো বড়োই উপকার হয়।'

খটিকরা বললেন, 'গাছে কিন্তু লেবু ছিল না, এটা আপনার ভাগ্যে মিলেছে।'

লেবু নিয়ে ফিরে এলেন। লেবু খেয়ে মহারাজ কিছুটা সুস্থ হলেন। সম্পূর্ণ নয়। সন্ধ্যা নামল। শুরু হল ধ্যানধারণা। একসময় শুয়ে পড়লেন দু-জনে। ঘুম আর আসে না। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। পেট জ্বলছে। গলা ফুলে আছে। মনে মনে ঠাকুরের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'এক মুঠো অন্নই যদি জুটিয়ে দিতে না পারলে, তবে ঘরের বার করেছিলে কেন? কাল সকালে যদি গরম গরম খিচুড়ি আর চাটনি খাওয়াতে পার, তবেই বুঝব তুমি সঙ্গে সঙ্গে আছ।'

ভোরবেলা সরযূর লক্ষ্মণবর্জন ঘাটে দু-জনে স্নানে গেলেন। স্নান শেষ করে তীরে উঠতেই দেখেন, একজন রামাইত সাধু হন্তদন্ত হয়ে যেন কাকে খুঁজছেন। তাঁদের দেখেই 'জয় রামজি' বলে অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্বামীজি, আপনারা তো কাল থেকে একাদশীর উপোস করে আছেন? চলুন, রামজির কুটিরে পারণ করবেন।'

রাজা মহারাজ আর তুরীয়ানন্দজি পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রশ্ন করলেন, 'বাবাজি! এত সকালে আপনি কি পারণ করবেন?'

'রামজিকে খিচুড়ি ভোগ লাগিয়ে এসেছি, তাঁর প্রসাদই আপনারা পাবেন।' শহর থেকে লক্ষ্মণবর্জন ঘাটে যাবার পথে এক নিমগাছ তলায় একটি খড়ের ঝুপড়িতে বাবাজির আস্তানা। তিনি সেইখানে তাঁদের বসিয়ে দিলেন পাতা করে। গরম খিচুড়ির সঙ্গে আমের, লেবুর, তেঁতুলের আচার এল। রামজির প্রসাদ। সাধু বলতে লাগলেন, 'ওহো! আমার কি সৌভাগ্য। আজ চব্বিশ বছর ধরে আমি এইখানে বাস করছি রামজির একটি বাণী শোনবার জন্যে।

সূচীপত্রে যান

তাঁকে এক নজর দেখবার জন্যে। আজ রামজি আমায় কৃপা করেছেন।'

এই বলে বাবাজি কেঁদেই আকুল।

রাজা মহারাজ প্রশ্ন করলেন, 'বাবাজি, ব্যাপারটা কী, একটু খুলেই বলুন।' সাধু বলতে লাগলেন, 'ওহো আমার কী সৌভাগ্য! আমার কী সৌভাগ্য!' কান্নার তোড়ে কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চেষ্টা করছেন। সে এক করুণ অবস্থা। প্রবল আবেগে মথিত। অবশেষে, 'শেষরাতে কে যেন আমায় খুব নরম হাতে ঠেলে তুলে দিয়ে বললেন, ওরে ওঠ, আমার বড়ো খিদে পেয়েছে। শিগগির খিচুড়ি রেঁধে আমায় ভোগ দে। আর ভোরবেলা লক্ষ্মণবর্জন ঘাটে গিয়ে দেখবি আমার দু-জন ভক্ত সাধু স্নান করছে; তাদের এনে প্রসাদ খেতে দিবি।' কুটিরে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল। সাধু শ্রীরামচন্দ্রের ছবির দিকে দেখিয়ে বললেন, 'আমি স্পষ্ট দেখলাম, এই রামজি হাত দিয়ে আমায় ঠেলে ওঠালেন আর এই কথাগুলি বললেন। তাই আমি স্নান করে খিচুড়ি রেঁধে রামজির ভোগ চড়িয়ে আপনাদের ডেকে এনেছি। এতদিনে রামজি আমায় কৃপা করেছেন আপনাদের দয়ায়।'

এইবার তিনজনের চোখেই জল—কৃপালু রাম, কৃপালু রামকৃষ্ণ। প্রায় এই সময়েই গাজীপুরের অপর পারে তাড়িঘাট স্টেশনে রামজি এই রকমেরই এক লীলা দেখালেন। এবার স্বামীজির জীবনের ঘটনা। ট্রেন থেকে নামলেন। প্রখর রোদ। আগুনের মতো গরম। কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী। চৌকিদার ছায়ায় বসতে দিলে না। বিশ্রামাগারের বাইরে মাটিতে কম্বলখানি পেতে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। ক্ষুধার্ত। ট্রেনের কামরায় এক শেঠ তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন। টাকার অহংকার। সারাটা পথ স্বামীজিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। পয়সা না থাকায় পানি পাঁড়ে পানীয় জল দিতে অস্বীকার করেছে। শেঠের টাকা আছে— লোটা ভরে ঠান্ডা জল কিনেছেন। তৃষ্ণার্ত স্বামীজিকে দেখিয়ে দেখিয়ে গলায় ঢালছেন, আর বলছেন, 'ওহে! দেখছ কেমন ঠান্ডা জল। তুমি তো সন্ন্যাসী হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করেছ। তা দেখ এখন। আমার জল খাওয়া দেখ। আমার মতো রোজগারের চেষ্টা করলে তোমার এই দুর্দশা হত না। এই গরমে তুমিও ঠান্ডা জল কিনে আরামসে খেতে পারতে।' শেঠ হ্যা হ্যা করে হাসছেন।

সেই শেঠও স্বামীজির পিছু ছাড়েননি। তাড়িঘাট স্টেশনেই নেমেছেন। টাকা থাকলে ভোগ্যবস্তুর অভাব হয় না। ছায়া পেয়েছেন। চৌকিদারের খাতির। মোসায়েব জুটেছে। একই

ধরনের অসভ্যতা চলেছে। প্ল্যাটফর্মের ছায়ায় আরামে বসে উপদেশ ঝাড়ছেন, 'দেখ হে পয়সার কী ক্ষমতা। তুমি তো পয়সা কড়ির ধার ধার না; তার ফলও দেখ; আর আমি। রোজগার করি, তার ফলও দেখি!' এই বলে তিনি খাবারের পুঁটলি খুলে স্বামীজিকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে লাগলেন, 'এই দেখ পুরি।' বাতাসে দোলাতে দোলাতে মুখে। 'এই দেখ কচুরি।' স্বামীজির চোখের সামনে একটা পেঁড়া নাচাতে লাগলেন, 'এসব কি আর বিনা পয়সায় হয়?'

স্বামীজি দূর থেকে শুনছেন, দেখছেন, সহ্য করছেন। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটি লোক এই 'প্ল্যাটফর্ম নাটক'-এ প্রবেশ করল। ডান হাতে ঝুলছে একটা পুঁটলি আর লোটা, বাঁ হাতে এক কুজো জল ও ভাঁজ করা একখানি শতরঞ্জি। সে স্টেশনের এদিক-সেদিকে খানিক ঘোরাঘুরি করে স্বামীজির সামনে এসে বললে, 'বাবাজি, আপনি রোদে বসে আছেন কেন? ছায়ায় চলুন। আমি আপনার জন্যে খাবার এনেছি। দয়া করে গ্রহণ করুন।'

লোকটির অবাক করা কথা স্বামীজি বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে, বলা নেই, কওয়া নেই, কে তাঁকে চেনে। খাবার গ্রহণের জন্যে লোকটি স্বামীজিকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল।

স্বামীজি তখন বললেন, 'বাবা, আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ। এ খাবার অন্য কারুর। তুমি আমার কাছে চলে এসেছ।'

স্বামীজি যেমন বসেছিলেন সেই রকম বসেই রইলেন।

লোকটি তখন বেশ জোর গলায় বললে, 'না না, আপনিই তো সেই বাবাজি, যাঁকে আমি দেখেছি।'

'তার মানে? তুমি আমাকে দেখলে কখন?'

লোকটি ইতিমধ্যে জিনিসপত্র ছায়াঘেরা পরিষ্কার একটা জায়গায় নামিয়ে পরিপাটি করে শতরঞ্জিখানি পেতেছে। স্বামীজিকে বললেন, 'আগে রোদ থেকে সরে এই ছায়ায় আসুন, তারপর শুনবেন।'

তা তাই হোক।

'শুনুন বাবাজি, ভালো করে বুঝিয়ে বলি, তাহলে আর আপনার কোনো সন্দেহ থাকবে না। আমি একজন হালুইকর। আমার একটা মিঠাইয়ের দোকান আছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার

পর ঘুমুচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখছি কী—রামজি এসে ঠেলছেন আর বলছেন, 'আমার সাধু স্টেশনে পড়ে অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে; কাল থেকে তার খাওয়াদাওয়া হয়নি, তুই শিগগির গিয়ে তার সেবা কর।' ঘুম ভেঙে গেলেও পাশ ফিরে শুয়ে ভাবছি, স্বপ্ন তো মনের খেয়াল। তখন রামজি কৃপা করে আবার এলেন। এবার আরও জোর ঠেলা, তুলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'কী হল? শিগগির যা, আমার সাধুর সেবা কর। যেভাবে বলছি, ঠিক সেইভাবে।'

'কী তাজ্জব ব্যাপার বাবাজি। এই দুপুরবেলা রামজির দর্শন। তাড়াতাড়ি উঠে গরম গরম পুরি আর তরকারি তৈরি করলুম। সকালের মিঠাই তো ছিলই। কুঁজোয় ভরলুম ঠান্ডা জল। তামাকও সাজলুম, রামজি যেমন বলেছিলেন। সঙ্গে নিলুম শতরঞ্জি, আপনি বসবেন। তারপর সব গোছগাছ করে স্টেশনে।'

স্বামীজির সন্দেহ তবু ঘুচল না, প্রশ্ন করলেন, 'আমিই যে সেই সাধু, তা তুমি বুঝলে কী করে?'

'আমারও প্রথমে এই সন্দেহ হয়েছিল। তাই এখানে এসে চারদিকটা একবার ঘুরে দেখে নিলুম। আপনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো সাধু নেই। রামজি যে সাধুর কথা বলেছেন, আপনিই সেই সাধু। এখন চলুন।'

হাত-মুখ ধুয়ে স্বামীজি ছায়ায় বসলেন আহারে। গরম গরম পুরি-তরকারি। বড়ো বড়ো মিঠাই। কুঁজোয় ঠান্ডা জল। হুঁকোয় তামাকের সুবাস। সেই শেঠের খাওয়া, লম্বা-চওড়া কথা—সব বন্ধ হয়ে গেছে। হাঁ করে দেখছেন। সব শুনেছেন। এইবার তিনি গুটি গুটি এগিয়ে আসছেন। একেবারে স্বামীজির পদপ্রান্তে। রামজি যাঁর সহায় তাঁকে অপমান! কী জানি কী হয়।

ঠাকুর সর্বত্র সর্বখানে। অবিশ্বাসীর অজস্র কূটকচালে প্রশ্ন। তাইতেই যাঁরা সন্তুষ্ট, সুখী, ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়। কী বলছেন ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

"ভগবান কল্পতরু— তাঁর কাছে যে যা চায় সে তাই পায়। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম মানুষ যখন তার সদ্ব্যবহার না করে, ভগবানের পাদপদ্মে মন না দিয়ে অসার মায়ামোহের সমুদ্রে ডুবে থেকে মনে করে 'বেশ আছি', তখন তিনিও বলেন, 'বেশ থাক।' আবার যখন দুঃখ-কষ্টে পেয়ে হায় হায় করে ভাবে 'এ জীবনে করলুম কী?' তখন তিনি বলেন, 'করলি কী?' মানুষ

কল্পতরুর নীচে বসে আছে, তার কাছে যা চাইবে তাই পাবে, দেবত্ব চাও দেবত্ব পাবে, পশুত্ব চাও, পশুত্ব পাবে।"

ঠাকুর সেই কারণে আগেভাগেই জিজ্ঞেস করে নিতেন— 'কী চাও? প্রশ্নটা নিজেকে করো। উত্তর তোমার ভেতরেই আছে।' ওই পঞ্চবটী এক ভীষণ জায়গা ছিল সেই সময়। গোরস্থান, প্রেত-পিশাচ, নীলকুঠি, 'সাহেবান বাগিচা'। একটি নয়, দুটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন। ঠাকুর শুধু তন্ত্র নয়, সব পথের সাধন করেছেন এই ভূমিতে। এই মৃত্তিকে করে দিয়ে গেছেন Radio active.

'যোগমায়া'— তন্ত্রসাধকরা এই শক্তির ক্ষমতার কথা জানেন। সব লন্ডভন্ড করে দিতে পারেন। সাধক লাটু মহারাজের জীবনকথায় চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনাটি বলেছেন,

"রাখাল মহারাজ একদিন নানা প্রসঙ্গ করতে করতে বললেন, একদিন গভীর রাতে ঠাকুর আমাদের ঠেলে তুলে দিলেন। বললেন, 'তোরা ঘুমোবি কী রে? ঘুমোবার জন্যে এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) এসেছিস? সকলকে উঠিয়ে নানা উপদেশ দিয়ে ধ্যান করবার জন্য আমাদের সব নানা স্থানে পাঠালেন। লাটুকে সেদিন বেলতলায় পাঠিয়েছিলেন। নির্ভীক সাধক না হলে সিদ্ধ আসনে বসে জপ-ধ্যান করতে পারে না। নানা অশরীরী মূর্তি ধ্যানকালে ভয় দেখাতে থাকে। বসতে দেয় না, আসন থেকে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সেই কারণে ঠাকুর বেলতলায় (বেলতলা এখনো আছে দক্ষিণেশ্বরে) যাকে-তাকে ধ্যান করতে পাঠাতেন না। নিজের বাছা বাছা অন্তরঙ্গদের পাঠাতেন।

"লাটুর মতো জোয়ান সাধকেরও বুক কেঁপে উঠেছিল সেই আসনে বসে। ধ্যানের শেষে লাটু আসন ছেড়ে উঠতে পারেনি—চারিদিকে নানা বীভৎস মূর্তির নানা বিভীষিকা দেখে ভয়ে তার 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থা হয়েছিল। ঠিক সেই সময় ঠাকুর তাকে রক্ষা করেছিলেন—দূর থেকে হেঁকে বলেছিলেন—'কী রে! বড্ড ভয় পেয়েছিস নাকি? এত ভয় কীসের? আয়। আমার সঙ্গে চলে আয়।' ঠাকুরের গলার আওয়াজ শুনে লাটুর প্রাণে সাহস জেগেছিল। ওই আসনে বসা কি চাড্ডিখানি কথা। ওখানে বসে ঠাকুর সিদ্ধ হয়েছিলেন। সিদ্ধপীঠের শক্তি যাবে কোথায়?'

একই অভিজ্ঞতা তারাপীঠের বামদেবের। গুরু ব্রজবাসী মহানিশায় মহাশ্মশানে বশিষ্ঠদেবের

সূচীপত্রে যান

সিদ্ধাসনে বামদেবকে বসিয়ে দিয়ে আদেশ করলেন—একাগ্র হয়ে বীজমন্ত্র জপ করো। সাবধান! মন যেন বিচলিত না হয়। আমি আর মোক্ষদানন্দ মন্দিরেই আছি তোমার পাহারায়।

বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধাসনে বামদেব। যোগমায়ার সেই এক খেলা। প্রথমে নানারকম ভীতিপ্রদ শব্দ। খল খল অট্টহাসি। বীভৎস নারীর ছায়ামূর্তি। গুলি গুলি চোখ। ধক ধক আগুন। লকলকে জিভ। বড়ো বড়ে দাঁত। কড় কড় করে হাড় চিবনোর শব্দ। আলুথালু চুল। বামদেব ভয়ে আসন ছেড়ে উঠে মন্দিরের দিকে ছুটলেন।

গুরু ব্রজবাসী বললেন, 'ভয়! কীদের ভয়? চল আমার সঙ্গে। কোথায় তোর রাক্ষসী? দেখাবি চল।' ব্রজবাসী বামদেবকে নিয়ে শ্মশানের ভেতরে ঘোরাঘুরি করে বামদেবকে আবার বসিয়ে দিলেন আসনে। ফিরে এলেন মন্দিরে। সেই রাত রামদেবের সিদ্ধির রাত।

ভোর রাতে ঠাকুর লাটু মহারাজকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে বললেন, 'ওরে! আজকে লেটোর পুনর্জন্ম হয়েছে।' ঠাকুর এই সময় 'যোগমায়া'র কথা খুব বলতেন—'ওরে! যোগমায়া তোদের পরীক্ষা করছেন। এসময় খুব সাবধানে থাকবি।'

আসনের টান। লাটু মহারাজ আবার একদিন গভীর রাতে বেলতলার আসনে বসলেন। গভীর ধ্যান থেকে চলে গেলেন 'যোগনিদ্রায়'। নানা দেবদেবীর দর্শন হতে লাগল। এদিকে কখন পঞ্চবটীতে আলো ফুটে গেছে খেয়াল নেই। ঠাকুর লাটুকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। কোথায় সে। বেলতলার দিকে চলেছেন। কাছাকাছি এসে দেখছেন, ধ্যানস্থ লাটু, আর তার অদূরে দাঁড়িয়ে আছে দুটো বড়ো আকারের কুকুর। ঠাকুর আর এগোলেন না। দাঁড়িয়ে পড়লেন।

এদিকে ভোর হয়েছে। রাতের ছিটেফোঁটাও নেই। গাছের ডালে ডালে অজস্র পাখির ডাকের জড়াজড়ি। লাটু তাকালেন। দেখলেন ঠাকুরকে। অভাবনীয়। লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পায়ে। পথে আসতে আসতে ঠাকুর বললেন, 'ওরে! কুকুরের বেশ ধরে দু-দুটো ভৈরব তোর আশেপাশে পাহারা দিচ্ছে দেখলুম। তোর মহা সৌভাগ্য। তোকে রক্ষা করবার জন্য মা তাঁর ভৈরবদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।' (চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়)

স্বামী ব্রহ্মানন্দজি অনুভূতির অতি সূক্ষ্মস্তরে বিচরণ করতেন। সেই কারণেই তাঁর নানারকম দর্শন হত। ব্রহ্মানন্দজি তখন বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি 'উদ্বোধন'-এ রয়েছেন। ওই বাড়িতেই স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ভীষণ অসুস্থ, শেষশয্যায়। ব্রহ্মানন্দজি দেখলেন। মা সারদা জানতেন,

সূচীপত্রে যান

কী দেখছেন। আলোচনা করতেন না, পাছে তাঁর ছেলেরা ভয় পায়। মহারাজ পরে ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে বলেই দিলেন, 'একদিন ওপর থেকে দেখলাম, যেন খুব লম্বা-চওড়া দু-জন লোক নীচে পশ্চিমদিকের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তারা মানুষেরই মতো, কিন্তু কী একরকম ভীষণ চেহারা। একটু পরেই দেখি তারা আর নেই। এইরকম দেখে মনটা কেমন হয়ে গেল। ওদের জিজ্ঞেস করলুম, ওই বাড়িতে আগে কেউ ভূত-টূত দেখেছে কি-না। ওরা বললে, না দেখেনি। কোনো একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেননা এর আগে দেখেছি, ওইরকম বদ চেহারা দেখলে কোনো-না-কোনো অমঙ্গল হয়। তারপরেই প্রজ্ঞানন্দ দেহ রাখল।'

মহারাজ দ্বিতীয় ঘটনাটা বলছেন 'বলরাম মন্দির'-এ বসে। 'এই বলরাম ভবনেও একবার ভূত দেখেছিলুম ওই সিঁড়ির কাছে। তখন ভয় হল, এ বাড়ির কোনো অমঙ্গল হবে না তো। তাই একেবারে মাঠে পালালুম। আর কিছুদিন পরেই শান্তিরামবাবুর স্ত্রী প্লেগে মারা গেল।'

১৯০৮ সাল। কলকাতায় আবার প্লেগ। মহামারীর আকারে। বলরাম ভবনেও ঢুকল। আক্রান্ত হলেন তিনজন। মারা গেলেন শান্তিরামবাবুর স্ত্রী, পরিচারিকা সুরী আর পাচক জয়রাম।

রাখাল মহারাজ ঢাকাতে ভূত দেখেছিলেন। সেই কথা বলছেন : যে বাড়িতে উঠেছিলুম, সেই বাড়িতেই পরের দিন ভূত দেখলুম। দরজার সামনে এক মুসল ভূত। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল— এই রে কিছু বা হয়। ভাবলুম আবার দেখলে এ-বাড়ি থেকে পালাব। তবে দ্বিতীয়বার আর দেখিনি। বাড়ির মালিক ছিলেন সারদাবাবু। সারদাবাবুর ছেলে হঠাৎ আত্মহত্যা করলে। ছেলেটি বড়ো ভালোমানুষ ছিল। আত্মহত্যার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। ভূতটা বোধ হয় আত্মহত্যার জন্যে বার বার প্ররোচনা দিয়েছিল। এইরকম হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজি বললেন, 'ভালো ভূতও আছে। উপকারী ভূত। ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে থাকবার সময় একজনের খুব অসুখ হয়েছিল। সেবা করার লোক না থাকায় আমি কয়েকদিন তার সেবা করেছিলুম। একদিন রাতে তার কাছে বসে আছি। তার বড়ো যন্ত্রণা হচ্ছিল। ভাবলুম, কী আর করব, দেখি একটু জপ করে, যদি যন্ত্রণাটা কমে। কিছুক্ষণ জপ করতেই যেন একটু তন্দ্রার মতো এল। দেখলুম একটি ১১/১২ বছরের মেয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, উনি ভালো হবেন কি? সে তখন ঘাড় হেঁট করে বললে—হ্যাঁ। তারপরেই

সে কোথায় চলে গেল। কী আশ্চর্য! তার পরদিনই ভদ্রলোকের জ্বরবিকার কমে যেতে লাগল।

"বৃন্দাবনে সবই ভালো ভূত। প্রচুর ভূত। ওখানে একটা গলি আছে। গলিটার নামই ভূতুড়ে গলি। সেই গলির একটি বাড়িতে আসন পেতেছি। রোজ রাত বারোটায় জপে বসি। প্রায়ই দেখতুম একজন বৈরাগী, কৌপীন বহির্বাস পরা, আমার পাশে দাঁড়িয়ে মালা জপ করছেন। রোজ তাঁকে দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, ভয় করত না। একদিন পরিশ্রান্ত হয়ে একটু বেশি রাতে শুয়েছিলুম। খুব ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ কে যেন আমায় জোরে ধাক্কা মারলে। এত জোরে যে আমি দু-হাত দূরে ছিটকে গেলুম। ঘুম ভেঙে গেল। সেই বৈরাগী! বলছেন, 'ওঠো, বারোটা বেজে গেছে। জপ করবে না?' সেদিন ওইভাবে ঘুম ভাঙিয়ে না দিলে আমার জপ হত না।"

বৃন্দাবনের ঘটনাটি আগে বলা হয়েছে। এখানে অনেক বিস্তারিত, একটু অন্যরকমও। বৃন্দাবনে স্বামীজির অভিজ্ঞতা। সেও তো অলৌকিক। বৃন্দাবনে তাঁর বেশ— কৌপীনধারী সন্ন্যাসী। কৌপীন ছাড়া অঙ্গে কিছু নেই। একদিন গিরিগোবর্ধন দর্শনের পর রাধাকুণ্ডে স্নানে নেমেছেন। কৌপীন ধুয়ে এক জায়গায় শুকোতে দিয়েছেন। স্নান সেরে তীরে উঠে দেখছেন কৌপীন অদৃশ্য। একটা বাঁদর সেটি নিয়ে গাছের উঁচু ডালে বসে আছে। উদ্ধার করা সম্ভব হল না। ভীষণ অভিমান হল রাধারানির ওপর। ঠিক করলেন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে অনাহারে জীবন বিসর্জন দেবেন।

স্বামীজি অরণ্যের পথে বেশ কিছু দূর গেছেন, এমন সময় শুনছেন পেছন থেকে কে যেন ডাকছে। এই অরণ্যে কে আবার! স্বামীজি গতি বাড়ালেন। কেউ যেন ছুটে আসছে। লোকটি স্বামীজিকে ধরে ফেলেছে— 'আমি যে আপনার জন্যে বস্ত্র ও খাদ্য এনেছি— অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন।' জিনিসগুলি হাতে দিয়ে লোকটি গভীর অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন উবে গেল। স্বামীজি হতচকিত। এরপরেও আরও বিস্ময়— রাধাকুণ্ডের তীরে এসে দেখছেন— কৌপীনটি যে জায়গায় শুকোতে দিয়েছিলেন, সেই জায়গায় ঠিক সেইভাবেই রয়েছে। শ্রীমতীর খেলা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজির ভূত ফুরোয়নি। এইবার কাশীর ভূত। 'সেবাশ্রমের হল ঘরে রামনাম হচ্ছিল। প্রথম স্তবটি সবে শুরু হয়েছে দেখলুম, এক বৃদ্ধ আস্তে আস্তে এসে হল ঘরে যেখানে

সূচীপত্রে যান

শ্রীরামচন্দ্রের ছবি সাজানো আছে তার পাশে বসলেন। তাঁকে আর কখনো দেখিনি বলে, দু-তিনবার তাকালুম। একটু পরেই দেখি তিনি আর নেই। তখন মনে হল, যেখানে রামনাম হয় সেখানেই মহাবীর ছদ্মবেশে আসেন। তুলসীদাসও ওইরকম দেখেছিলেন। শৌচের পর তুলসীদাস রোজ একটি গাছের গোড়ায় জল ঢেলে হাতেমাটি করতেন, তারপর বাকি জলটা গাছের গোড়ায় ঢেলে দিতেন। ওই গাছে একটি প্রেত থাকত। দিনের পর দিন এই জল পেয়ে তার খুব তৃপ্তি। তুলসীদাসকে একদিন দর্শন দিয়ে বললে, 'আমি খুব খুশি হয়েছি। কী চাও বলো?'

তুলসীদাস বললেন, 'শুধু বলে দাও শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন কীভাবে পাব?'

প্রেত বললে, 'ও কাজ আমার সাধ্যাতীত। তবে উপায় বলে দিচ্ছি— অমুক জায়গায় রামায়ণ পাঠ হয়, মহাবীর শুনতে আসেন। তুমি তাঁর শরণ নাও।' তুলসীদাস বললেন, 'কী করে চিনব?' প্রেম বললে, 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে সকলের আগে আসেন, উত্তর কোণে বাসেন। সবার শেষে উঠে যান।' তুলসীদাস যথাস্থানে গিয়ে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দর্শন পেলেন। পাঠ শেষে তিনি আসর ত্যাগ করছেন, তুলসীদাস ব্রাহ্মণের পা দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, 'প্রভু! আপনাকে চিনতে পেরেছি। এখন কৃপা করে বলে দিন, কীভাবে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাব।' অনেক অনুনয়ের পর মহাবীর বললেন, 'চিত্রকূট পর্বতে যাও, রামলীলা দেখতে পাবে।'

তুলসী চিত্রকূটে এলেন। রাত নামল। শুনছেন দূরে কোথাও গান-বাজনা হচ্ছে। স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হচ্ছে ওখানে?' সে বললে, 'রামলীলা।' শব্দ অনুসরণ করে তুলসী সেই জায়গায় পৌঁছোলেন। দেখলেন, রামলীলা গানের আসর বসেছে। সপার্ষদ রাম-সীতা বসে আছেন।

তুলসীদাস ফিরে এসে পাহাড়ের নীচের লোকদের রামলীলার কথা বললেন।

তারা বললে, 'তুমি কি খেপেছ? ওখানে বিজন অরণ্য, জনমানব নেই, রামলীলা কী করে হবে?' তুলসীদাস বুঝলেন, কী তিনি দেখেছেন।

বুকফাটা কান্না। 'প্রভু। দেখা দিলে ধরা দিলে না। হায় ভাগ্য!'

ঠাকুরের জীবনে অদ্ভুত এই ঘটনাটি ঘটেছিল, সঙ্গে ছিলেন তাঁর মানসপুত্র রাখাল রাজা।

কামারহাটির গঙ্গার ধারে দত্তদের ঠাকুরবাড়ি। ভক্ত গোবিন্দ দত্ত! রাধাকৃষ্ণ মন্দির। সংলগ্ন

ঘাটটির নাম 'পিতুলিঘাট'। পটলডাঙার বিখ্যাত দত্ত পরিবার। নির্জন গঙ্গার ধারে দেবালয় স্থাপন করলেন। পিতুলিঘাট থেকে নৌকোয় দক্ষিণেশ্বর কয়েক মিনিটের ব্যাপার। বালবিধবা অঘোরমণির দাদা এই মন্দিরের পূজারি ছিলেন। অঘোরমণি এখানেই আশ্রয় পেলেন। শুরু হল তাঁর সাধনজীবন। গোপালের দর্শন পেলেন। গোপালই তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। একসময় শ্রীগোপাল আর শ্রীরামকৃষ্ণ এক হয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে অঘোরমণির নাম হল গোপালের মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) নিয়ে এই দেবালয়ে এলেন। গোপালের মা-র ইচ্ছা জীবন্ত গোপাল— শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করবেন। কী-ই বা আছে তাঁর— দরিদ্র বিধবা ব্রাহ্মণী। ভিক্ষার অন্নে দিন চলে। ভক্তিই তাঁর একমাত্র সম্বল। গোপাল আর গঙ্গা— এই দুই সঙ্গী। মধ্যাহ্নের আহার শেষ হল। মেয়েমহলের দোতলায় দক্ষিণের ঘরে পরিচ্ছন্ন একটি বিছানা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালকে নিয়ে শুয়েছেন। হঠাৎ ঘরটি পচা-দুর্গন্ধে ভরে গেল। সুন্দর দেবালয়, পরিষ্কার ঘর, বিছানা, বাগান, গঙ্গা। কোথা থেকে আসছে এমন উৎকট গন্ধ। ঘরের কোণের দিকে চোখ চলে গেল। দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া কঙ্কাল। তারা প্রেত। কোনো কবর থেকে উঠে এসেছে। শরীরের স্থানে স্থানে ছেঁড়া ছেঁড়া পচা মাংস ঝুলছে। কে কবে খুন করে একটেরে এই নির্জন জায়গায় পুঁতে দিয়েছিল। তারা প্রেত হয়ে অবস্থান করছে। দেবালয়ের দেবতা উদ্ধার করতে পারেননি। কঙ্কালসার প্রেত দুটি ঠাকুরকে অনুনয় করে বলছে, 'আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে চলে যান, আমাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

ঠাকুর রাখালকে ডাকছেন, ওরে, ওঠ ওঠ, আমাদের এখুনি যেতে হবে। নীচে নেমে এলেন। গোপালের মাকে প্রেতদর্শনের কথা কিছুই বললেন না। একা থাকে। রাতে ভয় পাবে। রাখালকেও বললেন না। তারও ভূতের ভয়। পরে বলেছিলেন।

সন্তলীলার শেষ কোথায়। উদ্বোধনে মা সারদা ভক্তদের মাঝে বসে আছেন। দক্ষিণেশ্বরের স্মৃতির পাতা খুলেছেন, 'একবার বেণীপালের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে গেছেন। তিনি বাগানের দিকে বেড়াচ্ছেন। ভূত এসে বলে কি— 'তুমি কেন এখানে এসেছ, জ্বলে গেলুম আমরা। তোমার হাওয়া সহ্য হচ্ছে না, তুমি চলে যাও, চলে যাও।' তাঁর পবিত্র হাওয়া, তাঁর তেজ ওদের সহ্য হবে কেন? তিনি তো হেসে চলে এসে কারুকে কিছু না বলে খাওয়াদাওয়ার

পরেই একখানি গাড়ি ডেকে দিতে বললেন। কথা ছিল রাতটা ওখানে থাকবেন। তারা বললে, 'এত রাতে গাড়ি কোথায় পাব?' ঠাকুর বললেন, 'তা পাবে, যাও।' তারা তো গিয়ে গাড়ি আনলে। তিনি সেই রাতেই গাড়ি করে চলে এলেন। অত রাতে ফটকে গাড়ির শব্দ পেয়ে কান পেতে শুনি—ঠাকুর রাখালের সঙ্গে কথা বলছেন। শুনেই ভাবলুম, ওমা! কী হবে! যদি না খেয়ে এসে থাকেন। কী খেতে দেব এই রাতে! মন্দিরের ফটক সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাত তখন একটা। তিনি হাততালি দিয়ে ঠাকুরদের সব নাম করতে লাগলেন, কী করে যেন দরজা খুলিয়ে নিলেন। আমি বলছি, 'ও যদুর মা, কী হবে?' তিনি শুনে তাঁর ঘর থেকেই ডেকে বলছেন, 'তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি।'

ভক্তের প্রশ্ন, 'মা, ভূতগুলো তো বড়ো বেকুব। ঠাকুরের কাছে মুক্তি না চেয়ে চলে যেতে বললে!'

মা বলছেন, 'ওদের কি আর মুক্তির বাকি রইল? ঠাকুরের যখন দর্শন পেলে!'

সূচীপত্রে যান

চারটে দেশলাই কাঠি

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

কনকনে হাড়কাঁপানো শীত। ট্রেনটা একটু দেরি করেছিল। অনুসন্ধান করে ডাকবাংলোয় যখন এসে পৌঁছলুম, আমি আর আমার সহকর্মী সুকুমার, তখন কাঁসাই নদীর পরপারে সূর্য অস্তে যাচ্ছেন। ঠিক যেন বড়সড় একটি ডিমের কুসুম। লোহার গেট ঠেলে ভেতরে প্রবেশ। দু'পাশে দুটো বিশাল গাছ। কোম্পানির আমলের ইংরেজরা পুঁতেছিলেন দুশো বছর ধরে তরতরিয়ে বেড়ে এখন সদ্য স্বাধীন ভারতের আকাশে ডালপালা মেলে স্থির। ঢোকা মাত্রই বোঝা গেল অতীত এখানে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সাহেবি কায়দায় তৈরি উঁচু দাওয়া, পরপর দুটি ঘর। ইংরেজি কায়দার ঢালু ছাদ, ধোঁয়া রেববার চিমনি। সামনে বিরাট কম্পাউন্ড। পিছন দিকে অনেকটা জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে। পরে আছে ঝরা পাতা। একপাশে উপুড় হয়ে আছে কোনও এক পাখির বাসা। বেশ কিছুটা দূরে সিগারেটের একটা খালি প্যাকেট। গাছের একটা ভাঙা ডালে কী একটা ঝুলছে! আলো কমে আসছে তাই বুঝতে পারছিল না। কাছে গিয়ে দেখলুম একটা মাঙ্কিক্যাপ। শেষ বেলার নদীটা দেখার ইচ্ছে হওয়ায় বাংলোর পিছন দিকে গিয়ে দু'জনে দাঁড়ালুম। কোমর পর্যন্ত উঁচু পাঁচিল। জমি স্তরে স্তরে অনেকটা নীচে নেমে গেছে। জলের কাছে পৌঁছতে হলে অনেক কসরত করতে হবে। সুকুমার হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, ওই দেখো? ওর কথা মতো তাকিয়ে থেকে বুঝলুম, ওটা একটা মুখোশ। কোনও শিশু হয়তো এসেছিল। এটি তারই কাজ পাঁচিলের ওপাশে অনেক হাড়গোড় পড়ে আছে। আশার আগে শুনেছিলুম, এদিকে বাঘ না থাকলেও বাঘরোল আছে, সেইরকম কোনও প্রাণীরই ভুক্তাবশেষ।

কোনো অন্তরাল থেকে মধ্যবয়সি একজন মানুষ বেরিয়ে এলেন। খাকি জামা দেখে বোঝা গেল সম্ভবত চৌকিদার। তিনি এসেই বললেন, এখানে থাকতে পারবেন?

—কেন?

সূচীপত্রে যান

—প্রথমত, আলো নেই, একটা লণ্ঠন আছে। তাতে তেল খুব কম।

—কম কেন?

সরকারি তেল। লিখেছি, কবে আসবে জানি না। যেটুকু আছে ঘণ্টাখানেক জ্বলবে। সঙ্গে টর্চ আছে?

—তা আছে।

—তাহলে হিসেব করে চালাবেন। আর একটা কথা, দুটো ঘর। একটা তালা-বন্ধই থাকে। কোনও বড়কর্তা হঠাৎ এলে খোলা হয়। আর একটা পাতি অফিসারদের জন্য। এই ঘরটার দরজার ভেতরের ছিটকিনি অনেকদিন আগেই ভেঙে দিয়ে গেছে।

—কে ভেঙেছে?

—ওই কাঁসাই নদী দিয়ে মাঝেমধ্যে ছুটকো ডাকাতরা আসে। তাদেরই কাজ।

—ছিটকিনি লাগানো হয়নি কেন?

—তদন্ত চলছে যে! তদন্ত শেষ হলে তারপর দেখা যাবে। আপনারা একটা কাজ করবেন, দু'জন আছেন তো, পালা করে ঘুমোবেন। একজন দরজায় পিঠ দিয়ে বসে থাকবেন। আর একজন ঘুমোবেন।

—ডাকাত কি রোজই আসবে?

—অনেকসময় তারা ওই পেছন দিক দিয়ে এসে এখানে একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম, খাওয়াদাওয়া করে।

লণ্ঠনটা একপাশে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলেন, দেশলাই আছে?

—সুকুমার বললে, দেশলাই কী করে থাকবে? আমরা ধূমপান করি না।

—আমার দেশলাইটা রেখে যাচ্ছি, চারটে কাঠি আছে।

—রেখে যাচ্ছি মানে, আপনি যাবেন কোথায়?

—আমার নাম আবদুল। আমার ডিউটি শেষ। একমাইল দূরে আমার বাড়ি। সেইখানেই চলে যাব। সেখানে আবার বিবি আছে। আজ আবার আমার দাদা মইনুদ্দিন আসবে। বিরিয়ানি হবে। কাল রোদ উঠলে, বেঁচে থাকলে দেখা হবে।

—বেঁচে থাকলে মানে?

—এই বাংলোটা জিনে ভর্তি। রাত দশটার পর থেকে তেনাদের খেলা শুরু হবে। দেখে তো মনে হচ্ছে দু'জনেই ভীতু। বসেও তো কম। সেইসব সহ্য করার ক্ষমতা আছে কি? এখানে দিনের বেলা মাঝেমাঝে বিডিও সাহেব এসে একটু সভাটভা করে জিপ গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যান। রাতের বেলায় কার দায় পড়েছে যে এখানে থাকবে।

—সুকুমার আমাকে বললে, জেনেশুনে আমাদের এখানে কেন থাকতে বললে রে?

উত্তরটা দিলেন চৌকিদার পাতি অফিসারদেরই ওইরকমই বরাত।

—আপনি আমাদের এই নিয়ে দুবার পাতি বললেন, আপনি কি জানেন? আমরা কেন এসেছি? আমরা এসেছি এখানে দিনকতক থেকে সার্ভে করার জন্য।

—কী সার্ভে করবেন? গরু, ভেড়া, ছাগল?

—আজ্ঞে না, শিল্প।

—চৌকিদার হা হা করে হেসে লণ্ঠন আর দেশলাইটা রেখে হন হন করে চলে গেলেন।

—সুকুমার বললে, কি মাল রে?

কিছুক্ষণ পরে আমাদের মনে হল, চৌকিদারের তো এতটুক ভদ্রতা হল না যে আমাদের ব্যাগ দুটো ঘরে রাখবে, ঘরটা দেখাবে, পাতি অফিসার বলে কোনও খাতিরই নেই। একবারা জিজ্ঞেসও করল না—এই মুহূর্তে আমরা চা খাব কি না, রাতে কী খাব। হন হন করে চলে গেল। উঁচু রকে উঠে ঘরটার কাছে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ—এতবড় একটা বোম্বাই তালা ঝুলছে।

—সুকুমার বললে—চাবি কোথায় রে?

তাই তো, চাবি কোথায়?

অদ্ভুত লোক তো?

ঠিক সেই সময় গেট পেরিয়ে বেশ সুন্দর চেহারার এক যুবক ঢুকল। পুরো খাকি পোশাক। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে বললে, কিছু মনে করবেন না, একটু দেরি হয়ে গেল। বিডিও সাহেব ডেকেছিলেন। বললেন, আপনারা আসছেন, কোনওরকম অসুবিধে যেন না হয়। চাবি সাহেবের কাছেই থাকে তো?

আমরা হাঁ করে সেই মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সুকুমার বললে, 'কি আশ্চর্য, একটু আগে যে লোকটি চৌকিদার বলে পরিচয় দিয়ে আমাদের সঙ্গে বকবক করে গেল সে কে?'

সূচীপত্রে যান

লোকটি বললে—আমিই তো চৌকিদার। আমার নাম তো জামালুদ্দিন। সে লোকটি কেমন দেখতে?

সুকুমার চোহারার বর্ণনা দিতেই লোকটি বললে, কি আশ্চর্য, ও তো আগের চৌকিদার। গত বছর এক রাতে এই খানেই খুন হয়েছিল।

শুনেই সুকুমার ধপাস করে বসে পড়ল। জামালুদ্দিন বললে, ও তো মাঝরাতে আসে, বিকেলে এল কেন? চলুন চলুন ঘরে চলুন।

ঘরের দরজা খুলে দিল। দু'পাশে দুটো নেয়ারের খাট, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। বিশেষ কিছুই নেই। ওপাশে একটা দরজা। সেটা খুললে বাথরুম।

আমি বললুম, জামাল ভাই, শীতটা বেশ ভালোই পড়েছে। এখন একটু গরম চা আর কিছু খাবার পেলে ভালো হয়।

জামাল ভাই বললে, এই বাংলোটা তো তেমন সুবিধের নয়। অনেক আগে এটা এক পর্তুগিজ সাহেবের ছিল। এখানে কোনও রান্নাঘর নেই। একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে যাবেন, ভালো একটা জায়গা আছে। গরম শিঙাড়া, কচুরি, জিপিপি, চা সবই পাওয়া যায়।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর বাজার মতো একটা এলাকায় আসা গেল। লোকজন আছে, দোকানপাট। মনে একটু সাহস পেলাম। খানিকক্ষণ আগে মনে হচ্ছিল শ্মশানে আছি। মনে ঘুরপাক খাচ্ছে একটা প্রশ্ন—একটু আগে যা ঘটল তা কি ভৌতিক! জামালভাই কিছুতেই আমাদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসবে না। সুকুমার জোর করে তাকে বসিয়ে দিল, চা, কচুরি, সবই এল, আমি বললুম, 'জামাল ভাই, একটু আগে যা হল সেটা কী?' মানুষটির চেহারা ভারী সুন্দর। মুচকি হেসে বললে, 'সে এক ঘটনা। আপনারা যাকে দেখেছেন তার নাম আবদুল।' সুকুমার বললে, 'নাম বলেছে আবদুল।'

এই আবদুল একটি সাংঘাতিক লোক ছিল। দুমুখো সাপ। ওর ডাকাতের দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তাদের দিত। ডাকাতির ভাগও পেত মনে হয়। ওর বিবি খুব সুন্দরী। এই জায়গাটা অনেক আগে পর্তুগিজদের ব্যাবসার জায়গা ছিল। এখানে তাঁতের জিনিস খুব ভালো। পর্তুগিজরা কাপড়ের ব্যাবসা করত। এই অঞ্চলে ওদের একটা বড় কলোনি তৈরি হয়েছিল। এদেশের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা। ছেলে, মেয়ে তো হবেই। সকলেই ফর্সা। মেয়েরা খুব

সুন্দরী। বাদামি চোখ, নীল চোখ, সোনালি চুল। শাড়ি পরে, আবার বিদেশি পোশাকও পরে। বিদেশি গান গায়। সুন্দর একটা গির্জা আছে। গ্রামটার একটু বদনাম তো আছে। আবদুলের বিবি ওই গ্রামেরই মেয়ে। তার সঙ্গে আমার ভালবাসা হল। চুপি চুপি। কেন হবে না। আবদুল পাঁড় মাতাল। অসভ্য নোংরা। আবদুল করত কি, ডাকবাংলোয় বড়সড় কেউ এলে ওর ওই বিবিকে এগিয়ে দিত। এখানে ঘরে ঘরে মদ তৈরি হয়। ওসব ওই পর্তুগিজদের ব্যাপার। সেরকম লোকও তো আছে। বড় চাকরি করলে কি হয়, মদ আর মেয়েমানুষ একটা ফাঁদ। আমি কলেজ পর্যন্ত পড়েছি। আবদুলের বিবি কেন আমাকে ভালোবাসবে না। আমি গান গাই, কবিতা বলি। আবদুল আমাদের দু'জনকেই খতম করতে চেয়েছিল। শেষে নিজেই খতম হয়ে গেল। আবগারির দারোগাসাহেব বাংলোয় এসেছেন কালেকশানে। আবদুলের খেলা শুরু হলে। ডাকাতদের খবর দিয়েছে পেটি ভর্তি মাল আছে। মাঝরাতে তিনটে জিপ এল। জনা দশেক ডাকাত। আবদুলের কোনো শত্রু পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিল। দারোগাবাবুও খুব লড়াকু ছিলেন। শুরু হল ফায়ারিং। ডাকাতরা পালাল। সকালবেলা দেখা গেল বাংলোর পেছন দিকের একটা ঝোপে আবদুলের ডেড বডি পড়ে আছে।'

'কে মারল?'

'মনে হয় ডাকাতরাই।'

'ও একটা লণ্ঠন, আর একটা দেশলাই রেখে গিয়েছিল। দেশলাইয়ে ছিল চারটে কাঠি। আর বললে, লণ্ঠনে আছে এক ঘণ্টা চলার মতো তেল।'

'আরে, ওটা তো সেই ঘটনার রাতের লণ্ঠন। ওটা আর ব্যবহার করা হয় না।'

'তা জামাল ভাই, আপনাদের প্রেমের কী হল?'

'আমরা নিকা করে বেশ ভালোই আছি। আমার বাড়িতে যাবেন। আমার বিবি খুব ভালো রাঁধে।'

সুকুমার একটু পেটুক। প্রস্তাবটা সে লুফে নিল, 'নিশ্চই যাব, কিন্তু, আমরা বাজার করব। অনেক কিছু কিনব। বিবিজানের জন্য খুব ভালো একটা উপহার।'

আমার মনে একটা ভয় হল। জামালভাইকে সে কথাটা বললুম, 'জামালভাই ওই আবদুল বোধহয় প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঘরছে। ও আপনাকে ছাড়বে না।'

'জানি। ও আগুন দিয়ে আমাদের দু'জনকে পুড়িয়ে মারবে।'

সুকুমার বললে, 'ওই ঝোপটায় কে একটা মুখোশ লাগিয়ে রেখেছে।'

জামাল বললেন, 'আমি লাগিয়েছি। এক গুণিন আমাকে দিয়েছে।'

'কোনো কাজ তো হয়নি! ও তো বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'আর কিছুদিন দেখব, তারপর আমিই একটা কিছু করব। ও সায়েরাকে রোজ রাতে ভয় দেখাচ্ছে।'

'সায়েরা কে?'

'সায়েরা আমার বিবি। ও এবার পাগল হয়ে যাবে।'

'আপনি কী করবেন, মানে কী ব্যবস্থা নেবেন?'

'আত্মহত্যা করব। করে ভূত হব, তারপর শয়তানটাকে কাঁসাইয়ের জলে ডুবিয়ে মারব।'

'না, না, জামালভাই, ওই কাজটা করবেন না। সায়েরা একা হয়ে যাবে। তার কথা একবার ভাবুন। আপনার এত সুন্দর চেহারা, ইচ্ছে করলে হিরো হতে পারবেন।

আমার মামা একজন ডিরেক্টর। তিনটে ছবি করেছেন, তিনটেই হিট। আপনার একটা ছবি দেবেন মামাকে দেখাব। ছবিতে একবার ঢুকে গেলে ও আর সাহস পাবে না।'

জামাল ভাই খুব উৎসাহ পেয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি অভিনয় করেছি। কিশোর অপেরা আমাকে অফার দিয়েছিল। লোকটার মতলব খারাপ ছিল। আমার বিবির দিকে নজর।'

'রুপোলি পর্দায় আপনাকে রুপো করে দেব। ও শালা কিছু করতে পারবে না।'

সুকুমার বললে, 'আমার ....যাত্রার দল আছে। চিৎপুর....। লেটেস্ট পালা 'হায়নার হাসি'। সুপারহিট। সেখানেও আমি আপনাদের দু'জনকে ফিট করে দিতে পারি।'

আমার মাঝে মাঝে কী একটা হয়, কে যেন ভেতর থেকে কিছু বলে দেয়, 'জামাল ভাই! পাপিয়া। ওই চারটে দেশলাই কাঠি। আজ রাতে লণ্ঠনের তেলটা ঝোপের ওপর ঢেলে একটা একটা করে দেশলাই কাঠি জ্বেলে ঝোপটার আগুন ধরিয়ে দেব। আমরা চারজন, আপনি সায়েন্স বিবি, আমি সুকুমার। চলুন চলুন, বাজারটা শিগগির সেরে ফেলি।'

গভীর রাতে

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

নগেন্দ্রবাবু ভূত নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছিলেন। অনেক কিছু জানতেন। যার মধ্যে একটা বিদ্যা ছিল 'হিপনোটিজম'। সম্মোহন করার ক্ষমতা। কারও চোখের সামনে সাদা একটা রুমাল বারকয়েক নাচিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সম্মোহিত। তাঁর হাতের মুঠোয়। যা বলবেন তাই করবে। এমনও দেখেছি তার পিতৃদত্ত নামটা পাল্টে দিলেন। তোমার নাম হরেন নয়, খগেন। যতদিন সে এই সম্মোহনে থাকবে, ততদিন নতুন নামে না ডাকলে সাড়া দেবে না। তার নিজের ইচ্ছাশক্তি কাজ করবে না। নগেন্দ্রবাবুর আজ্ঞাবহ দাস। সে এক বিশ্রী ভয়াবহ ব্যাপার। নগেন্দ্রবাবু যদি বলেন, 'অমুককে খুন করতে এসো।' সে তাই করবে। যদি একখণ্ড কাগজ দিয়ে বলেন, 'সন্দেশ। খেয়ে ফেলো' সে খেয়ে ফেলবে। অবশ্য তিনি এসব বলতেন না। তাঁর এই শক্তি ভালো কাজে লাগাতেন। মদ্যপকে মদ ছাড়াতেন। ভীষণ রাগী, মারধর করে, তাকে শান্ত করে সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনত। আমাকে পছন্দ করতেন একটি কারণে—আমি একটা ভূতের বাড়িতে থাকি। প্রায়ই ডেকে ভূতের খোঁজখবর নিতেন। আমি কী দেখলুম না দেখলুম। বলতেন, গল্প বলবি না। সত্য কথা বলবি। একটা ডায়েরি নিয়ে বসতেন। অনেক সময় জেরা করতেন। উকিলের জেরা।

আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম দেখতুম। একশ্রেণির মানুষের সবেতেই অবিশ্বাস। তারা বলত, 'ও সব বাজে, তোর চোখের ভুল।' আমি তাদের কোনো কিছু বলতুম না। আমাদের বাড়ি থেকে শঙ্করদের বাড়ি খুব ভালো দেখা যায়। গভীর রাতে শঙ্করদের বাড়ির ছাদে কে একজন দাঁড়িয়ে থাকে। সাদা চাদর মোড়া। উত্তরদিকে মুখ করে। নড়েও না চড়েও না। তখন পাশের ঝাঁকড়া বটগাছে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে প্যাঁচা ডেকে ওঠে। তারপরে হঠাৎ এক সময় নেই। খাঁ-খাঁ শূন্য। তখন মনে হত জায়গাটা যেন শ্মশান।

নগেন জেঠুর জেরা শুরু হল। "তুই বললি উত্তরদিকে মুখ। মুখটা কেমন? নাক আছে?"

সূচীপত্রে যান

"মনে হয় আছে।"

"ভূতের মুখ থাকে না। একটা গর্ত। দুটো চোখ দুটো গর্ত।"

আমি মুখের উপর স্পষ্ট বলেছিলুম, "জেঠু আপনি ভূত দেখেননি, ভূতের গল্পের মলাটের ছবি দেখেছেন। একটা কঙ্কাল। 'ক্ষুধিত পাষাণ' সিনেমাটা দেখে আসুন। সুন্দরী ভূত। মাঝরাতে নাচছে। ভূত নানারকম রূপ ধারণ করতে পারে। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি শঙ্করদের চিলের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকেন শঙ্করের মা। আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছেন। আপনি 'প্ল্যানচেটে' ডেকে জিজ্ঞেস করুন, কেন তিনি বাড়িটা ছেড়ে যেতে পারছেন না।"

জেঠু বললেন, "আমি দেখব, আমাকে দেখবার ব্যবস্থা করবি। আমার দুটো পোষা ভূত আছে। তাদের আকৃতি নেই।"

"তাহলে বুঝবেন কী করে?"

"শক্তি। যদি বলি এই জলের গেলাসটা এই টেবল থেকে সরিয়ে ওই টেবলে রাখো সঙ্গে সঙ্গে...।" কথা শেষ হল না, গেলাসটা শূন্যপথে ওই টেবলে চলে গেল, আর আমি দুদ্দাড় করে বাইরের ঘর থেকে রাস্তায়। জেঠুর গলা শুনতে পেলুম। হা হা করে হাসতে হাসতে বলছেন, "আমি পালাতে না দিলে পালাতে পারবে? নিজের ইচ্ছেয় আসবি, না টেনে আনব?"

ভয়ে ভয়ে ফিরে এলুম। জেঠু বললেন, "এই তোর সাহস? এই সাহস নিয়ে ভূত দেখবি?"

"জেঠু! সত্যি আমার ভয় করছে। এই ঘরে আপনি একা নন, দু' দুটো ভূত রয়েছে।"

"তোর মুন্ডু, গেলাসটা তোর সামনে টেবিলেই রয়েছে। আমি তোকে হিপনোটাইজ করেছিলুম। আমি এই মুহূর্তে তোকে একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় বসিয়ে দিতে পারি। সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে পারি। তুই কিন্তু খুব ভালো মিডিয়াম। সহজেই সম্মোহিত হোস। তার মানে তোর মধ্যে রেজিস্টান্স খুব কম। তোকে আমার কাজে লাগবে রে।"

"আমি আপনার বশ হব কেন? সেটা তো খুব অপমানজনক।"

"অপমান মনে করলে অপমান, অ্যাডভেঞ্চার মনে করলে অ্যাডভেঞ্চার। আবার শিক্ষা মনে করলে শিক্ষা।"

"এ কি শেখা যায়?"

"সাধনা। সাধনা করতে হবে। প্রথমে আটক, তারপর নিজের মনটাকে খালি করার কৌশল, তারপর অন্যের চোখের মধ্য দিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ। মানুষের ভিতরে ঢুকতে পারলে সে তো পুরোপুরি আমার নিয়ন্ত্রণে চলে এল। উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। সিদ্ধ সাধকরা তো তাই করেন। এ কথা অবিশ্বাস করব কী করে, প্রেতলোক যে আছে। এই এলাকায় তিন-চারটে বাড়ি আছে, যা হানাবাড়ি। তোদের বাড়িটা তার মধ্যে একটি। গঙ্গার ধারে বোসদের বাগানবাড়ি আর একটি। আমি জানতে চাই, তোদের বাড়িতে তুই কী দেখিস।' এই তো কয়েকদিন আগে আমাদের বাড়ির ভিতরের উঠোনে বিশাল বড়, ধবধবে সাদা একটা গরু দেখেছি। আমাদের সদর দরজা দিয়ে অত বড় একটা গরু ঢুকতেই পারবে না। তা ছাড়া আমাদের পাড়ায় কারও গরু নেই।

"তারপর কী হল?"

"আমরা সবাই হতভম্ব। আমার মেজপিসিমা অনেক কিছু জানেন। সেই সময় এসেছিলেন। তিনি মন্ত্র পড়তে লাগলেন। আমাকে চুপি চুপি বললেন, যমরাজের গরু। জানি না বাবা, কেউ মারাটারা যাবে না তো! হঠাৎ দেখি গরুটা নেই। ভ্যানিশ।"

সূচীপত্রে যান

ভূতের বর রাজা

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ছিলেন এক অসাধারণ সাধক। সদা মাতোয়ারা। দেওঘরের তপোবন আশ্রমে ভক্তদের সঙ্গে মহানন্দে কত প্রসঙ্গ করে গেছেন। মজার মজার সব গল্প বলতেন। কঠিন বিষয় কত সহজে ভক্তদের মনে গেঁথে দিতেন! যেমন করতেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন বলছেন, এক ভূতের বর সাজার গল্প!

একদল বরযাত্রী বর আর বউ নিয়ে ঘরে ফিরছে। ফিরছে একটা ময়দানের ওপর দিয়ে। এখন ওই ময়দানে একটা ভূত ছিল। সেই ভূতটার কী ইচ্ছে হল সে ওই দলে ঢুকে পড়ল। শুধু ঢুকল না, ওই বরের রূপ ধারণ করে বলতে লাগল, এ আমার বউ। বরযাত্রীরা অবাক, এ কী রে বাবা, একেবারে একই রকম দেখতে দুজন! এ বলে, আমার বউ ও বলে আমার বউ। আরে, তাহলে আসল বর কে? দু'জনে তো একই রকম দেখতে, একই সাজ। এ তো দেখি মহা গোল। চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আসল বর কে? দু'জনেরই দাবি বউ আবার। মারামারির জোগাড়। হাত ধরে টানাটানি, খামচাখামচি।

বরকর্তা বললে, এমন সমস্যায় জীবনে পড়িনি, আমিই চিনতে পারছি না। আর একজন বলল, 'এভাবে হবে না, চলো রাজার কাছে। তিনিই ঠিকঠাক বিচার করে দেবেন।' রাজামশাই ধৈর্য ধরে সমস্যাটা শুনলেন। দুই দাবিদারকে পাশাপাশি দাঁড় করালেন। অসম্ভব! দু'জনেই এক রকম। সব এক। গলার স্বরও এক। রাজা তখন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দু'জনের মধ্যে কে তোমার প্রকৃত স্বামী, সে তো তুমিই বলবে। বলো কে তোমরা স্বামী?'

মেয়েটিরও গুলিয়ে গেছে। একবার বলছে এ। একবার বলছে ও।

রাজামশাই তখন হার স্বীকার করে বললেন, 'এ বিচার আমার দ্বারা সম্ভব হল না।'

বরযাত্রীরা আশাহত। রাজদরবার থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগল। পথে আবার এক

সূচীপত্রে যান

ময়দান। সেখানে রাখালবালকেরা গোচারণে এসেছে। গরুদের ছেড়ে দিয়ে তারা তখন নিজেদের খেলায় মত্ত। খুব শোরগোল। একজন হয়েছে রাজা। মাঠে একটা ঢিবি ছিল, সেইটাই রাজার সিংহাসন। রাজসভায় সবাই আছে, মন্ত্রী, সান্ত্রী, পাত্র, মিত্র, অমাত্য। খেলা খুব জমেছে। এমন সময় রাজার কানে এল হইচই শব্দ। একদল লোক নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে চলেছে। বরযাত্রীর দল। বালক রাজা ভীষণ বিরক্ত হয়ে নিজের সিপাহিদের হুকুম করলে, 'ওরা অসভ্যের মতো চেল্লাচ্ছে কেন? আমার কাছে ধরে আনো। শুনি কী হয়েছে।' রাজার আদেশ! সিপাই ছুটল। দলের কাছে গিয়ে বলল, 'চুপ, চুপ। তোমাদের কীসের ঝগড়া? আমাদের রাজা তোমাদের ডাকছে। সব বিবাদ মিটমাট হয়ে যাবে।'

বালকের কথা শুনে সবাই অবাক। আসল রাজাই হার মেনেছেন, এখন খেলার রাজা বলে কিনা বিবাদ মিটিয়ে দেবে! আচ্ছা! দেখাই যাক, কী হয়! মাটির ঢিবির ওপর বালক রাজা। মাথায় গামছার পাগড়ি। হাতে রাখালের দণ্ড, যেন রাজদণ্ড। বসার কী কায়দা! রাজার প্রশ্ন, 'তোমাদের সমস্যাটা কী?'

সব শুনে বালক রাজা বললে, 'এই ব্যাপার! আমি এক্ষুণি মীমাংসা করে দিচ্ছি। কোনও চিন্তা নেই। তবে আমার একটা জিনিস চাই।'

'কী জিনিস?'

'শত ছিদ্রঅলা একটি কলসি। এই পাশেই আছে কুমোরপাড়া।'

এসে গেল একটি শতছিদ্র কলস। সকলেই উদ্‌গ্রীব! এরপর কী হয়।

রাজা বললেন, 'কলসিটা মাঠের মাঝখানে ওই ফাঁকা জায়গাটায় বসাও! এইবার আমার পরীক্ষা শুরু হবে। সেই বর দু'জন আমার সামনে এগিয়ে এসো। মনে হয়, তোমরা দু'জনেই গুলিয়ে ফেলেছ কে আসল, কে নকল! ঠিক আছে আমিই বের করে দিচ্ছি। তোমরা দু'জনে কলসিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াও।'

দু'জনে রাজার আদেশ পালন করল। সব গোলমাল থেমে গেছে। চারপাশ নিস্তব্ধ।

রাজা বললেন, 'দু'জনে প্রস্তুত! এইবার দু'জনকেই আমি একটু কষ্ট দেব। সামান্য ব্যাপার। ওই কলসিটায় ঢুকে যে ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে সে-ই আসল বর।'

সূচীপত্রে যান

এই আদেশ শুনে ভূতের খুব আনন্দ। এ পরীক্ষা তার কাছে কিছুই নয়। সে বললে, 'এই ব্যাপার! রাজামশাই, তুমি দেখো আমি কলসির মধ্যে ঢুকে ফুটো দিয়ে কেমন বেরিয়ে আসি।'

ভূতের যেমন বুদ্ধি। কলসির মধ্যে ঢুকে ফুটো দিয়ে বেরিয়ে এসেই বললে,'পরীক্ষায় পাশ। দাও, আমার বউ দাও।'

রাজা বললে, 'তুমি তো মানুষ নও। তুমি ভূত। কোনও মানুষ কি কলসিতে ঢুকে ফুটো দিয়ে বেরোতে পারে?'

সঙ্গে সঙ্গে ভূত অদৃশ্য। আসল বরের মুখে হাসি ফুটল। ফিরে পেল নিজের বউকে। বাদ্য বাজনা শুরু হল। জয় রাখাল রাজার জয়।

রাজার কানে কথাটা গেল। যা আপনি পারলেন না, পারল এক রাখাল বালক। কোথা থেকে তার মাথায় এল এই বিচারবুদ্ধি? স্বয়ং রাজা এসে হাজির সেই ময়দানে। বালকদের 'রাজা-রাজা' খেলা তখনও চলেছে। রাখালবালক রাজা সেজে বসে আছে সেই টিলার ওপর। রাজা তাঁর লোকজনদের আদেশ করলেন, 'টিলা তোড়ো।' যা ভেবেছিলেন তাই। টিলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রাজা বিক্রমাদিত্যের সেই 'বত্রিশ সিংহাসন'।

এই গল্পের সারমর্মটা কী? বালানন্দজি বলছেন, সংসারে হামেশাই এই ধরনের নানা সমস্যা আসতে পারে। কেতাবি জ্ঞানে সমাধান সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। চাই বুদ্ধি, খোলসা বুদ্ধি। ওই টিলায় উপবিষ্ট বালকের মাথা খুলে গিয়েছিল, বুদ্ধি প্রশস্ত হয়েছিল। বালানন্দজি বলছেন, 'ভাই, বুদ্ধি তোমার রাজার মতো হোক; কিন্তু শরীরটা যেন হয় চাষার মতো। শরীরটা সংসারীর, বুদ্ধিটা ব্রহ্মাবেত্তার।'

কেমন করে হবে? জগৎ জুড়ে চলেছে মহাতাণ্ডব। আজ নয়, সেই কতকাল আগে তিনি সেই দোঁহাটি আমাদের দিয়ে গেছেন :

প্রশ্ন : শঠ শূদ্রে সৎসঙ্গত পাওরে/ পরশ পরশ কো ধাৎ চুয়ারে।

অর্থাৎ, শঠ, শূদ্র ব্যক্তিও সৎসঙ্গে থাকলে মধুর মতো হয়ে যায়, যেমন পরশমণির সহযোগ লোহা সোনা হয়ে যায়। কিন্তু এর পরে যে একটি ভয়ংকর প্রশ্ন আছে—

শান্ত আর পারশকো বড়ো অন্তর জান—

সূচীপত্রে যান

ও লোহাকো কাঞ্চন করে
ও করে আপ সমান॥

পরশমণি লোহাকে সোনা করে। পরশমণি করে দিতে পারে না। কিন্তু সাধুসঙ্গে একজন সাধু হয়ে যেতে পারে। সাধুর সেই ক্ষমতা আছে। চারধাম খুলে গেছে। মানুষ ছুটছে। আমাদের অতীতই আমাদের বর্তমান।

সূচীপত্রে যান

আষাঢ়ে নয়

সূচীপত্রে যান

সূচীপত্রে যান

যখন কলেজে পড়ি, সে অনেক কাল আগের কথা, তখন আমাদের চার-পাঁচ জনের একটা দল ছিল। সবাই আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র। যুক্তিবাদী। সাহিত্য চর্চা করি। একটু আধটু লেখার চেষ্টা করি। প্রতি শনিবার কোথাও বসে সেইসব লেখাপড়া হয়, আলোচনা হয়, তর্ক-বিতর্ক হয়। সেই কোথাওটা হল আমাদের বাড়ির নিচের তলার রাস্তার দিকের একটা ঘর। পিচের রাস্তার পশ্চিম দিকটা চলে গেছে গঙ্গার ঘাটে। আর পূর্ব দিকটা গেছে বাজারে, আরও বড় বাস রাস্তায়। গঙ্গা খুব কাছে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। যে কোনও গঙ্গার ধারই তীর্থের মতো।

আমাদের সেই বাড়িটা ছিল বনেদি পুরনো। বরানগর প্রায় শতখানেক বছর ওলন্দাজদের (ডাচ) অধিকারে ছিল। ওই গঙ্গা পথে চলত তাদের ব্যবসা বাণিজ্য। প্রথমে কিছুদিন পর্তুগিজ, তারপর ডাচ, তারপর ইংরেজ। আমাদের বাড়িটা ছিল ডাচদের। সেই ভাবেই তৈরি। আমাদের পিতামহ, নামী শিক্ষক, তিনি বাড়িটা কিনেছিলেন। তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলেছিলেন বাড়িটা দোষ যুক্ত। ওখানে অনেক অনাচার হয়েছে। ভূতের বাড়ি। সহ্য হবে না। আমার যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান পড়া, সুপণ্ডিত পিতামহ বলেছিলেন, 'আমি কুসংস্কার মুক্ত। ভূত থাকলে থাকুক। ভূত তো ভয় দেখাতে আসে না, আমরাই ভয়ে মরি। ওরা তখন মজা পায়। এই যেমন আমি ক্লাসে ঢুকলেই ছেলেরা চুপ মেরে যায়। টুঁ শব্দটি করে না। ভূত যদি দেখা দেয়, আমার অনেক প্রশ্ন আছে, পরীক্ষা আছে, আলো ফেলে দেখব, জল ঢেলে দেখব, গুলে যায় কি-না, আগুন দিয়ে দেখব পোড়ে কি-না। আমার বিষয় পদার্থ বিদ্যা। ভূত কেমন পদার্থ আমার জানা দরকার।'

পিতামহের এতবিধ কথায় অনেকেই বিরক্ত হয়েছিলেন। ভূত না মানাটা বিশ্রীরকমের

সূচীপত্রে যান

একটা অহংকার। খুবই ক্ষতিকারক। কোনো ভূতই ভাল নয়। ভাল নয় বলেই তো ভূত হয়। মুক্তি পায় না। প্রতিশোধপরায়ণ। খুবই ক্ষতিকারক। তবে ব্রহ্মদৈত্যদের জাতটা আলাদা। ওই যে 'ব্রহ্ম' শব্দটি রয়েছে। সাধারণ ভূতের মতো নয়। পবিত্র। বেল গাছে, মন্দির সংলগ্ন বেল গাছে থাকেন। একেবারে নিজের মতো, নিজের কাজে। ছাত্রজীবনে, মানে, আমার পিতামহ যখন স্কটিশ কলেজের ছাত্র, সেই সময় এক সন্ধ্যায় এক ব্রহ্মদৈত্যের সঙ্গে তাঁর 'এনকাউন্টার' হয়েছিল। বলা চলে বেশ আড্ডা হয়েছিল। সময়টা আমি হিসেব করে বের করেছি। স্কটিশে তিনি নরেন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিলেন। না থেকে উপায় নেই। সময়ের হিসেব। এইকালের শিক্ষিত কুসংস্কার যুক্ত মানুষরা স্পিরিট'কে অস্বীকার করতেন না। কেন করতেন না? আমরা এই জগৎকাণ্ডের কতটুকু জানি? কাল কী হবে আজ বলতে পারব না। মৃত্যুর পর কী হবে, কোথায় যাব, কেমন করে বলব? দেহ ছাড়া কোথাও যাওয়া যায় না। দেহ কি ইচ্ছা ছাড়া কিছু করতে পারে? কার ইচ্ছা? মনের। মনের তো আকার, আকৃতি, দেহ নেই। তাহলে? অত্যন্ত জটিল। জটপাকানো একটা ব্যাপার। দেহ যদি কালক্রমে জীর্ণ না হত, কোনওরকম অসুখের আক্রমণ যদি না হত, তাহলে মানুষ তো অমর হত। প্রাণ মনে হয় দেহের বাইরের কোনও অদৃশ্য শক্তি। সেই শক্তির বলয়ে আমাদের নড়া চড়া। একটা দেহ চলে যাওয়া মানে একটা বাল্ব ফিউজ হল। বিদ্যুতের শক্তি কিন্তু রইল। ইচ্ছা তার সমস্ত রইল। দেহটা নেই। দেহ একটা সংস্কার। এই সংস্কারটাও রইল। মৃত্যুর পর অশরীরী ইচ্ছা বেশ কিছুদিন থেকে যেতে পারে। মন ছেড়ে না দিলে মুক্তি হবে না। কেউ মরে গেলে আমরা বুঝতে পারি, যে মরে গেল সে কিন্তু বুঝতে পারে না। আর তখনই শুরু হয় তার দেহহীন বেঁচে থাকা।

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির নির্মাণের জন্য যে জমি কিনেছিলেন, তার অধিকারী ছিলেন এক ইংরেজ। ১৮৪৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এই জমিটি কেনা হয়। সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা। শুধু জমি নয়, সুন্দর একটি কুঠি বাড়িও রয়েছে, আজও আছে। ইংরেজ মালিকের নাম জন হেস্টি। উদ্যানটিকে বলা হত 'সাহেবান বাগিচা'। ওই কুঠি বাড়িতে তিনি থাকতেন। একেবারে সাহেবি কায়দায় তৈরি। হেস্টির আগে এটি ছিল কোনও এক নীলকর সাহেবের।

হেস্টির ইচ্ছে ছিল একটি চটকল করবেন। সেই সময়কার দক্ষিণেশ্বর জনমানবশূন্য জংলি একটি জায়গা। পূর্বনাম 'শোণিতপুর' বা 'সম্বলপুর'। প্রথমে বড়িশার বিখ্যাত জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের দুর্গাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও ভবানীপ্রসাদ তাঁদের লোকজন এনে জঙ্গল টঙ্গল সাফ করে বসতি স্থাপন করলেন। করলেও স্থানটি ভারতীয় দৃষ্টিতে রহস্যময়, ছমছমে। অদৃশ্য রহস্যময় অনেক কিছু আছে। ভূমি, বাতাসে। ভূমির আকার কূর্মাকৃতি। তন্ত্রমতে শক্তিপীঠ। এই বাগানটির দক্ষিণে পথের ধারে একটি পুকুর। পুকুরের ঈশানকোণে বিশাল একটি বট ও অশ্বত্থ গাছের জড়াজড়ি। আর এরই তলায় একদা সাধন ভজন করতেন এক পির। তার নাম ছিল গাজি সাহেব। লোকমুখে গাজি পির। সেই নাম আজও প্রচলিত।

এই রহস্যময় গাজি পির। হেস্টি সাহেব ওই বট ও অশ্বত্থ গাছের ডালপালা কাটবেন। কে গাজি পির! সাহেব ওসব বোঝেন না। লোকজন তৈরি। রাতে সাহেবের স্বপ্নে গাজি পির দর্শন দিলেন। সাহেবকে বললেন, 'দেখ, তুমি আমার গাছের ডাল কেটো না, আমি তোমার ভাল করব'।

হেস্টি সাহেব এ-সব মানেন না। স্বপ্ন স্বপ্নই। এমন কত স্বপ্ন মানুষ রোজই দেখে। সাহেবের আদেশে তাঁর লোকজন দমাদ্দম গাছের ডাল কেটে-ছেঁটে দিল। সাহেব এইবার চললেন ইংল্যান্ডে কল কিনতে। জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হল। জমি, কুঠি বাড়ি, জুটমিল তৈরির স্বপ্ন পড়ে রইল দক্ষিণেশ্বরে। বাড়িটি ছিল এক নীলকর সাহেবের। নীলকুঠি থেকে কুঠিবাড়ি। এই কুঠির একতলার পশ্চিমের একটি ঘরে তাঁর দক্ষিণেশ্বর জীবনের প্রথম ষোলো বছর কাটিয়েছিলেন। তিনি রোজ রাতে একটি শব্দ শুনতে পেতেন, বুট পায়ে কে একজন একতলা থেকে দোতলায় উঠে যাচ্ছে। হেস্টি সাহেব। তিনি ওই কুঠি ছেড়ে চলে যেতে পারেননি। রোজ রাতে সেই বিদেহী আসেন। ঠাকুরের কথা মিথ্যা গল্প কথা নয়। এই পির ঠাকুরকে দেখা দিয়েছিলেন। ঠাকুর তখন তীব্র সাধনে। পির বলেছিলেন, আমি এই গাজি তলায় থাকি। এখনও আছি। এই গঙ্গায় আমার একটা কুমির আছে। আমার একটা বাঘও আছে। মা সারদা যখন নহবতে থাকতেন, তখন শেষ রাতে বকুলতলার ঘাটে স্নান সেরে নিতেন। আধো অন্ধকারে একদিন এই কুমিরের পিঠে পা দিয়ে ফেলেছিলেন।

সূচীপত্রে যান

পঞ্চবটী তখন ছোটখাটো একটি জঙ্গল। সেখানের একটি বেলগাছে এক ব্রহ্মদৈত্য থাকতেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কথা হত। তিনি বলেছিলেন, এই উদ্যান মন্দির আমি রক্ষা করি। অদৃশ্য চৌকিদার। পঞ্চবটীর উত্তর সীমানায় ছিল ইংরেজ সরকারের বারুদখানা, 'ম্যাগাজিন'। সরকার পঞ্চবটী দখল করতে চাইলে মথুরবাবু হাইকোর্টে মামলা করলেন। ব্যারিস্টার দিলেন মাইকেল মধুসূদনকে। ঠাকুরের ভীষণ দুশ্চিন্তা, পঞ্চবটী চলে গেলে সাধন ভজন কোথায় করবেন। এক সন্ধ্যায় ব্রহ্মদৈত্য ঠাকুরকে দেখা দিয়ে বললেন, 'পঞ্চবটী ওরা নিতে পারবে না, তুমি চিন্তা করো না।'

ঠাকুরকে বেদান্ত সাধন করাতে দক্ষিণেশ্বর এলেন মহাত্মা তোতাপুরী। একদিন রাতে পঞ্চবটীতে ধুনি জ্বেলে বসেছেন। এমন সময় ধুনির সামনে এসে বসলেন সেই ব্রহ্মদৈত্য। তোতাপুরী বললেন, 'এলেই যখন, তখন সাধনে বসে পড়ো।' কামারহাটির গঙ্গার ধারে কলকাতার গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুর বাড়ি। সেই ঠাকুর বাড়িতে এক সাধিকা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল অঘোরমণি। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসতেন। ঠাকুরই ছিলেন সেই সাধিকার জীবন্ত গোপাল। এমন দর্শনই তাঁর হয়েছিল। ঠাকুরের পর্ষদরা এই সাধিকাকে বলতেন 'গোপালের মা।'

ঠাকুর এক সকালে, পরবর্তীকালে যিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ হবেন সেই রাখালকে নিয়ে কামারহাটিতে গোপালের মায়ের উদ্যান মন্দির গেছেন। সাধিকার অনেকদিনের ইচ্ছা ঠাকুরের সেবা করবেন। মন্দির সংলগ্ন দত্ত বাবুদের বৈঠকখানার দোতলার একটি ঘর। পশ্চিমে গঙ্গা। ভারি মনোরম দৃশ্য। ধবধবে সাদা চাদরপাতা সুন্দর একটি শয্যা। জানলার বাইরে ঝকঝকে গঙ্গা। সুনীল আকাশ। স্নিগ্ধ বাতাস। আহারাদির পর ঠাকুর তাঁর মানসপুত্র রাখালকে নিয়ে বিশ্রাম করছেন। রাখাল ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঠাকুর শুয়ে আছেন। হঠাৎ ঠাকুরের নাকে এল বিশ্রী এক দুর্গন্ধ। ভাবলেন, একেবারে পাশেই গঙ্গা। হয়তো কোনো মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে।

তারপর দেখছেন ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালময় দুটি প্রেতমূর্তি। তারা অনুনয় বিনয় করে বলছে, 'আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে চলে যান। আপনি থাকায় আমাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

সূচীপত্রে যান

প্রেত কথা বলছে। প্রেত কথা বলতে পারে। আসল শরীর কোথায় পড়ে আছে কে জানে! প্রেত শরীর চলে ফিরে বেড়াচ্ছে।

ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন, 'রাখাল! ওঠ ওঠ! আমাদের এখুনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরতে হবে।'

কারোকে কিছু বললেন না। রাখাল মহারাজের ভীষণ ভূতের ভয়। সাধ্বী গোপালের মাকেও বলা যায় না। তাঁকে তো এখানে থাকতে হবে। ঠাকুর বহুবার প্রেত দর্শন করেছেন কথা বলেছেন। এর কী ব্যাখ্যা! সব সত্য ঘটনা, আষাঢ়ে নয়।

সূচীপত্রে যান

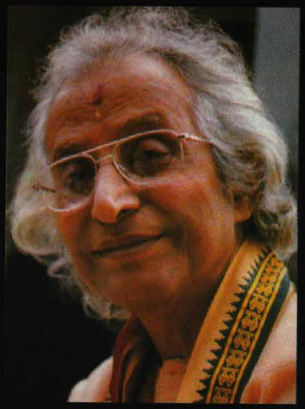

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৩৪-এর ২৪ অক্টোবর। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। বিষয় ছিল রসায়ন। কর্মজীবন শুরু রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা দিয়ে। সরকারি চাকরিও করেন কিছুকাল। তারপর দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। এক রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার সময় প্রকাশিত হয় প্রথম হাসির গল্প, একটি সিনেমা পত্রিকায়। সরস গল্প লিখে স্বনামধন্য হলেও অন্যরকম সংবেদনশীল লেখাও লিখেছেন প্রচুর। ছোট-বড় সকলের জন্য লিখেছেন। লিখছেন। বর্তমানে ধর্ম সংক্রান্ত লেখালিখিতে মনোনিবেশ করেছেন।

সূচীপত্রে যান

ওরা তো গ্যাস বেলুনের মতো হালকা। অতি কষ্টে একটা জায়গায় কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়াতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা ফুঁ দিয়ে দেখেছি, দূরে চলে গেল। বাতাস যেদিকে বয় ভূত সেইদিকেই কাগজের প্যাকেটের মতো উড়ে যায়। এইটা খেয়াল রাখলে ভূত কখনও ঘাড়ে এসে পড়বে না। ভূত কিন্তু মানুষের ভালবাসা চায়, আমরা কিছু না জেনেই ভয়ে মরি।

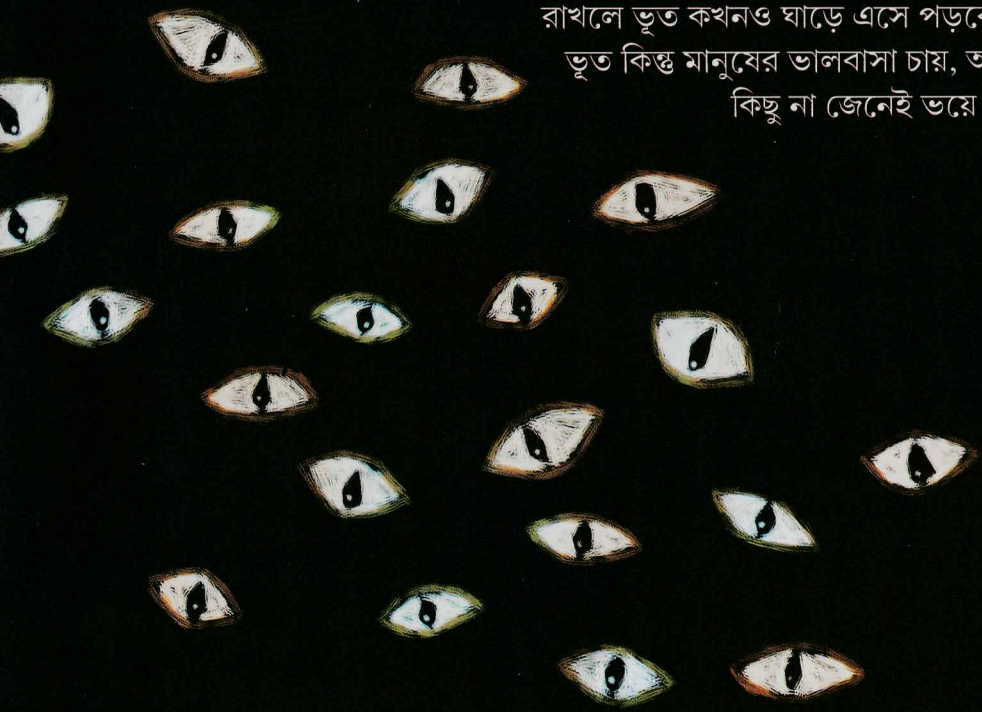

9 788129 529039

সূচীপত্রে যান